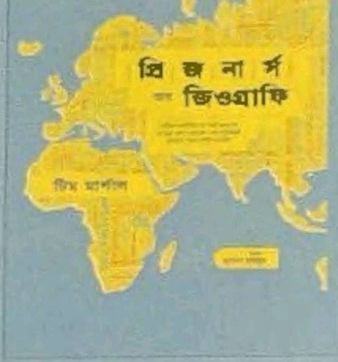
দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার!





চীন সারা পৃথিবীর জন্য পণ্য উৎপাদন করে। এজন্য চীনকে প্রচুর জ্বালানি আমদানি করতে হয়। আর এই তেল-গ্যাসের ৮০ শতাংশ আসে মালাক্কা প্রণালি হয়ে। তাই এই অঞ্চলের সবগুলো দেশই চীনের কাছে কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। এই তিনটি দেশই মালাক্কা প্রণালির পাশে অবস্থিত। মালাক্কা খুবই সরু একটি প্রণালি। সবথেকে সরু অংশে এর প্রস্থ মাত্র ১.৭ মাইল। এই দেশগুলোর সাথে বড় কোনো সমস্যা হলে চীনের জ্বালানি আমদানি বিশাল হুমকির মুখে পড়বে। এতে চীনের অর্থনীতি পড়ে যাবে বিশাল চাপের মুখে।

এই দেশ তিনটি এখন পুরোপুরি অ্যামেরিকাপন্থী। কিন্তু তারপরও চীন কখনোই এই দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ করতে চায় না। চীন এই অঞ্চলের পরাশক্তি, ফলে চীন চাইলে শক্তি প্রদর্শন করে মালাক্কা প্রণালির আশেপাশের দেশগুলোকে চাপে রাখতে পারে। কিন্তু চীনের জ্বালানি বহন করা জাহাজগুলো একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাক এটা চীন চায় না। এখন পর্যন্ত পুরো চীনের অর্থনীতি টিকে আছে বলতে গেলে এই মালাক্কা প্রণালির উপর নির্ভর করে। তাই এই অঞ্চলের যে কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য চীনের প্রথম টার্গেট থাকে আলোচনা করা; শক্তি প্রদর্শন নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা ভূ-রাজনীতি বুঝতে হলে জানতে হবে দেশটির ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা ভূ-রাজনীতিকে গভীরভাবে বুঝার জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত বই সম্ভবত 'প্রিজনার্স অব জিওগ্রাফি'। রাশিয়া, চীন, অ্যামেরিকার মত পরাশক্তিগুলো কীভাবে তাদের ভূ-রাজনৈতিক নীতিগুলো ঠিক করে, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগুলো নির্ধারণ করে, সেটা যারা সহজ সরল ভাষায় বুঝতে চান তাদের জন্য এই বইটি একটা অসাধারণ রিসোর্স।

বইটি গুডরিডসে প্রায় এক লক্ষ রেটিং পাওয়ার পরেও ৪.২ ধরে রেখেছে! লেখক প্রতিটি অঞ্চলের আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন একদম সহজ সরল ভাষায়।

প্রিজনার্স অব জিওগ্রাফি

টিম মার্শাল

ভাষান্তর

হাসান মাহবুব

সম্পাদনা

ইমরান ওয়াহিদ

হিমাংশু কর



প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকাশক
হিমাংশু কর



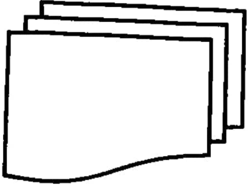
পুঁথি, ৩৩/২ বাংলাবাজার, ঢাকা
বিপণন দপ্তর
বাণিজ্য বিতান সুপার মার্কেট, দ্বিতীয় তলা
প্রচ্ছদ: রুদ্র প্রকাশ

পরিবেশক: কুষ্টিয়া প্রকাশন

ইমেইল: contact@puthii.com
ফোন: +880 1950-886700
ওয়েবসাইট: https://puthii.com

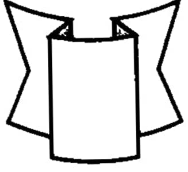
মুল্য: ৬৫৫ টাকা মাত্র

Prisoners of Geography by Tim Marshall
Translated by Hasan Mahbub
Edited by Himangshu kar and Imran Wahid
First Published: December 2024 by Himangshu kar
Puthii Publication, 33/2, Banglabazar, Dhaka- 1100
Price: 15 USD
ISBN- 978-984-89-9316-1



উ ৎ স র্গ

মিতিন এবং রুহিন
তোমরা জানবে যুদ্ধ কেন হয়, আর কাজ করবে শান্তির জন্য।



সূচিপত্র

কিছু কথা ০৯
ভূমিকা ১১

শুরুর কথা ১৩
প্রথম অধ্যায়: রাশিয়া ২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: চীন ৫৯
তৃতীয় অধ্যায়: যুক্তরাষ্ট্র ৯১
চতুর্থ অধ্যায়: পশ্চিম ইউরোপ ১১৯
পঞ্চম অধ্যায়: আফ্রিকা ১৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায়: মধ্যপ্রাচ্য ১৭৫
সপ্তম অধ্যায়: ভারত এবং পাকিস্তান ২১৭
অষ্টম অধ্যায়: কোরিয়া এবং জাপান ২৪৭
নবম অধ্যায়: ল্যাটিন অ্যামেরিকা ২৭৩
দশম অধ্যায়: আর্কটিক ৩০৩

উপসংহার ৩২৩

কিছু কথা

অনুবাদ নিয়ে আমাদের দেশে অনেক রকম মতবাদ আছে। কেউ বলেন অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ হতে হবে, কেউ বলেন অনুবাদ যথাসম্ভব সরল হতে হবে। আবার কেউ বলেন অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বার্তা, রসবোধ ইত্যাদি ঠিক রাখাটাই বেশি জরুরি।

আমরা বিশ্বাস করি একটি নন ফিকশন বইয়ের অনুবাদ পড়ে পাঠক মূলত তাদের আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে জানতে চান। তাদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে চান। তাই আমাদের সকল বইতে জটিল বাক্য যথাসম্ভব বাদ দিয়ে সরল এবং ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূল বইতে লেখক যে তথ্য বা বার্তাটি জানাতে চেয়েছেন সেটাই আমাদের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি বাক্যের গঠন আর বাংলা বাক্যের গঠন এক নয়। তাই হুবহু কমা টু কমা অনুবাদ করলে পাঠক তখন বাংলা ভাষা বুঝতেই হিমশিম খায়। অনেকেই বিরক্ত হয়ে বাংলা অনুবাদ পড়া বাদই দিয়ে দেন। লেখক যে কথাটি বলতে চেয়েছেন সেই কথাটিকে আমরা বাংলা ভাষায় যেভাবে প্রকাশ করি- অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূলত সেটার উপরই জোর দিয়েছি। অর্থাৎ, অনুবাদের মূলভাব ঠিক রাখাটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

পুঁথি যেসব নন-ফিকশন বই প্রকাশ করবে তার বেশিরভাগই কোনো বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। এই বইগুলো সাধারণ পাঠকদের জন্য। কোনো পাঠক হয়তো বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন কিন্তু তিনি এখন পপুলার নন-ফিকশন ধারার বই পড়ে ভূ-রাজনীতি, ইতিহাস, জেনেটিক্স বা পদার্থবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু এইসব বিষয়ের অনেক টার্মিনোলজি তার মতো সাধারণ পাঠকের জন্য বুঝে ওঠাই একটা বড় সমস্যা। সেক্ষেত্রে আমরা ঐ টার্মটি দ্বারা আসলে কী বুঝানো হয় সেটাও বইতে যোগ করে দিয়েছি। কিন্তু এইসব ব্যাখ্যা টীকা আকারে দিলে পাঠকের পড়ায় ছন্দপতন হয়। তাই আমরা টীকা ব্যবহার করার পরিবর্তে একটি দুইটি লাইন যোগ করে সেটাকে মূল লেখার মধ্যেই ব্যাখ্যা করে দিই। এসব কারণে আমরা আমাদের বইগুলোকে মূল বইয়ের হুবহু অনুবাদ বলতেও চাই না। আমাদের বইগুলো মূলত মূল বই থেকে ভাষান্তর করা হবে।

টিম মার্শালের এই বইটি বৈশ্বিক রাজনীতি বা ভূ-রাজনীতি বুঝার জন্য খুবই সহায়ক। বইটি গুডরিডসে প্রায় এক লক্ষ রেটিং পাওয়ার পরও ৪.২ ধরে রেখেছে।

লেখক প্রতিটি অঞ্চলের আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন একদম সহজ সরল ভাষায়।

পুঁথি থেকে যত বই প্রকাশ করা হবে সবগুলো বইয়ের ক্ষেত্রেই অনুবাদের এই সহজ সরল অ্যাপ্রোচটা মেনে চলা হবে। অনুবাদকদেরও আমরা সবসময় আমাদের নিজস্ব এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই অনুবাদ করতে অনুরোধ করি। কিন্তু সবার ভাষা একরকম নয়। তাই প্রতিটি বই আমরা যথাযথ সম্পাদনার মাধ্যমে একই রকম সরল ভাষায় প্রকাশ করব।

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠককে এমন একটি বই উপহার দেওয়া যে বইটি তারা অনায়াসে পড়তে পারবে। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বা অর্থনীতির জটিল জটিল ধারণাগুলো যেন তারা সহজেই অনুধাবন করতে পারে সেজন্য আমরা এইসব বিষয়ে সহজ ভাষায় অনুবাদগুলো প্রকাশ করব। পুঁথি মূলত নন ফিকশন বই প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করে প্রায় ৪ বছর আগে। কিন্তু নন ফিকশনের সেরা বইগুলো নিয়ে বিস্তারিত স্টাডি করে সবকিছু গুছিয়ে আনতে আমাদের এতদিন সময় লেগে যায়। এখন থেকে পুঁথি বিভিন্ন জনরার নন ফিকশন বই নিয়মিত প্রকাশ করবে। এর মধ্যে থাকবে বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, মিথলজি, জিওপলিটিক্স, ভাষাতত্ত্ব, তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়। আমাদের প্রচেষ্টা যদি পাঠকদের জ্ঞানের চাহিদার সামান্য অংশও পূরণ করতে পারে তাহলে আমাদের চেষ্টা সার্থক মনে করব।

হিমাংশু কর
সম্পাদক ও প্রকাশক, পুঁথি।

ভূ মি কা

আমরা যে অত্যন্ত অস্থির একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এই ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষই একমত হবেন। পৃথিবীটা এখন এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছেছে, কখন যে কী হবে তার কিছুই আগেভাগে আন্দাজ করা যায় না। আজকের দিনের মতো এতটা অনিশ্চিত সময় আগে কখনোই আসেনি। তবে এই ধরনের বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্ক তৈরি করতে পারে। অনেকেই হয়তো এই ধরনের কোনো মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হতে বলবেন। আবার অনেকে কিছুটা সন্দেহবাদী প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারেন। এই ধরনের মন্তব্যের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকাটাই উচিত। আসলে পৃথিবী সবসময়ই এমন অস্থিতিশীল অবস্থায় ছিল, সেই অস্থিরতা এখনো বজায় আছে। আর ভবিষ্যৎ তো সদা-অনিশ্চিত একটা বিষয়। তাই ভবিষ্যতের জন্য আমাদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বৈকি! ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা আরো বেশি হতে পারত। ১৯১৪ সালের পর একশ বছর তো পার হয়েই গেলো! একবার ভেবে দেখুন বিশ্বযুদ্ধের সেই দিনগুলোর কথা!

মৌলিক কিছু পরিবর্তন অবশ্য ঘটছে। আমাদের সন্তানেরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুক, এই পরিবর্তনগুলোই বলে দেবে ভবিষ্যতে তারা কী অবস্থায় থাকবে। প্রযুক্তি এখন পরিবর্তিত হয় খুবই দ্রুত। আর এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তন। এই সকল পরিবর্তনই আগের যুগের মানুষের সাথে আমাদের পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে। সম্ভবত এই কারণেই আমরা সবাই আজকাল অনিশ্চয়তা নিয়ে এত বেশি কথা বলি। একারণেই ভূ-রাজনীতি নিয়ে আলাপ আজ একটি বিকাশমান শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে আমরা সবাই আরো বেশি জানতে চাই।

টিম মার্শাল পেশাগত এবং ব্যক্তিগতভাবেও ভূ-রাজনীতি বিষয়ে অসাধারণ দক্ষ একজন ব্যক্তি। গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন নাটকীয় পট পরিবর্তন সরাসরি মাঠে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। বলকান অঞ্চল, আফগানিস্তান এবং সিরিয়ায় যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখেছেন সামনাসামনি। মানুষের আশা, হতাশা, ভীতির ব্যাপারগুলো না বুঝলে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক সংঘাত বা গৃহযুদ্ধকে বুঝা সম্ভব না, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। মানুষের এসব অনুভূতির সাথে

ইতিহাস যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত তাদের পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ। যে ভৌগোলিক প্রতিবেশে এই সকল ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রগুলো প্রতিপালিত হয়েছে তা না বুঝলে দেশের বা মানচিত্রের বদলগুলো পুরোপুরি বুঝা সম্ভব নয়।

এই ব্যাপারগুলো তিনি বুঝেন। এই বইতে তার সেই অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ইউক্রেনের প্রতি রাশিয়ার এমন আগ্রাসী আচরণের কারণ কী? আমরা (পশ্চিমা বিশ্ব) কি এর কারণ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি? যদি ব্যর্থ হয়ে থাকি, তবে কেন এই ব্যর্থতা? মস্কো আর কতদূর এগুবে? চীন কি এখন তাদের সীমানা নিয়ে আশ্বস্ত? তারা কি নিরাপদ বোধ করছে? বর্তমান পরিস্থিতিতে বেইজিং কি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের সমুদ্রনীতি পরিবর্তন করবে? আর যদি করে থাকে, তাহলে ভারত এবং জাপান এতে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে?

গত দুইশত বছর ধরে ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুফল ভোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন তাদের কাছে আছে সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে তেল এবং গ্যাস উত্তোলন করার প্রযুক্তি। তারপরেও কেন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য পতন নিয়ে এত কথা হচ্ছে? বিশ্ব-রাজনীতিতে এর প্রভাব কী হতে পারে? উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য আর দক্ষিণ এশিয়ার গভীরে প্রোথিত হওয়া বিভাজন আর আবেগ কী রয়েই যাবে? না কি সামনে দিনবদলের আশা রয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ মিত্র, পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি যুক্তরাজ্যের কী পরিস্থিতি? ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেই বিষয়ক সম্ভাব্য অস্থিতিশীল এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতি নিয়ে বাকি ইউরোপ কী ভাবছে? টিম মার্শালের ভাষ্যমতে, গত সত্তর বছর ধরে (বিশেষ করে ১৯৯১ সাল থেকে) ইউরোপ শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চিরকাল এমনই থাকবে ধরে নেওয়ার কারণেই কি আমরা এখন ঝুঁকির মুখে? আশেপাশে কী ঘটছে তা নিয়ে কি আমরা আসলেই ঠিকঠাক জানি?

আপনি যদি এইসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে চান, তাহলে বইটি পড়ে ফেলুন।

স্যার জন স্কারলেট, KCMG OBE,

সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এম আই সিক্স)-এর সাবেক প্রধান, ২০০৪-২০০৯



শুরুর কথা

ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের একজন জোরালো সমর্থক। তিনি নিজেকে ধার্মিক ব্যক্তি বলেই দাবি করেন। পুতিন যেহেতু ধার্মিক মানুষ, তাহলে তিনি নিশ্চয় প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ঈশ্বরের কাছে অনুযোগ জানান, "হে ঈশ্বর, ইউক্রেনে তুমি কয়েকটা পর্বত দিলে না কেন!"।

ঈশ্বর ইউক্রেনে তেমন কোনো পর্বত দেননি। এর বদলে ইউক্রেনে রয়েছে বিস্তীর্ণ "উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি"। ইউক্রেনের এই সমতলভূমি রাশিয়ার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ। ইউক্রেন অঞ্চলে পর্বত বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বাধা না থাকায় পশ্চিম ইউরোপ থেকে শত্রুদেশ বারবার এই সমভূমি দিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেছে। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এই ইউক্রেনীয় সমতলভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুতিনকে তাই করতেই হবে। ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে এই দুশ্চিন্তা শুধু পুতিন বা রাশিয়ারই নয়। প্রাচীনকাল থেকেই দেশের সীমান্ত নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতারা এই ধরনের দুশ্চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন, তা সে বড় দেশই হোক বা ছোট দেশ। নিজের দেশের জনগণকে বৈদেশিক শক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে চাইবেন সব ধরনের শাসকই।

ভূ-প্রকৃতির খামখেয়ালিতে রাষ্ট্রের নেতারা থাকেন অনেকটা বন্দি অবস্থায়। তারা তাদের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। পুতিনের মতো এমন চিন্তায় পড়তে হয়েছে সাবেক অ্যাথেনিয়া, পারস্য এবং ব্যাবিলনের শাসকদেরকেও। এটা ঠিক যে, ইতিহাসে বাঁকবদলের ক্ষেত্রে শাসকদের নেওয়া সিদ্ধান্তেরও ভূমিকা আছে। তবে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের কথা আগে চিন্তা করেন। যুগে যুগে যে এত যুদ্ধ হয়েছে, তার পেছনেও ভৌগোলিক অবস্থানের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। একটি দেশের

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাজনীতির ধরন, সামাজিক উন্নয়ন এসবের পেছনেও রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণ।

প্রযুক্তি এখন অনেক উন্নত হয়েছে। আগের দিনের মতো এখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে কয়েক মাস লেগে যায় না। তবে প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক, আমাদের পৃথিবীর এই সাত বিলিয়ন মানুষের জীবন এবং জীবিকা সবসময় সাগর, নদী, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, হ্রদ, উপত্যকা, সমতলের ওপর নির্ভরশীল হয়েই থাকবে। এসব পাহাড়-পর্বত তো আর সরিয়ে অন্য কোথাও নেওয়া যাবে না!

ভৌগোলিক এই বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? পাহাড় না সমুদ্র? মরুভূমি না নদী? এর আসলে উত্তর হয় না। পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। কোনো জায়গায় নদীর কারণে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, আবার কোনো জায়গায় পর্বত থাকার কারণে ঐ অঞ্চলটি সুরক্ষা পেয়েছে। তাই অঞ্চলভেদে নদী যতটা গুরুত্বপূর্ণ, পাহাড়ও ততটাই। মরুভূমি এবং সাগরকেও এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই।

মোটাদাগে বলতে গেলে ভূ-রাজনীতি মূলত ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিচারে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা বর্ণনা করে। একটা দেশের ভূ-রাজনৈতিক কৌশল কেমন হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পর্বতমালা বা নদীগুলোর মধ্যকার সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এর পাশাপাশি আরো কিছু বিষয় আছে। একেকটি অঞ্চলের আবহাওয়া, সংস্কৃতি, জনমিতি বা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সবকিছুই ইতিহাসের পালাবদলে ভূমিকা রাখে। এই সবকিছুই ভৌগোলিক পরিস্থিতির অংশ। এই সবকিছুর সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতা। একটা দেশের রাজনৈতিক বা সামরিক নীতি কেমন হবে তা নির্ভর করে এসব বিষয়ের ওপর। মানুষের ভাষা, ধর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও ভূগোল এবং প্রকৃতির প্রভাববলয় থেকে বের হতে পারে না। অথচ ভৌগোলিক পরিস্থিতির এই বিষয়গুলো ইতিহাস রচয়িতারা বরাবরই অগ্রাহ্য করে এসেছেন। বর্তমান সময়ে এসেও সাংবাদিকরা এসব বিষয় আমলে নেন না। তাদের ভূ-রাজনীতি নিয়ে প্রতিবেদনে ভূগোলটাই অনুপস্থিত থাকে। ভূগোল কী, এটা জানা জরুরি বটে, কিন্তু এই "কী" এর পাশাপাশি 'কেন'র উত্তরও

জানা দরকার। ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকবদল কেন হয়েছে তার উত্তর খুঁজতে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব বুঝাটা জরুরি।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চীন এবং ভারত- এই দুই পরাশক্তি একে অপরের প্রতিবেশী। বিপুল তাদের জনসংখ্যা এবং তেমনই বিপুল তাদের সামরিক সক্ষমতা। দুই দেশের মধ্যে সীমানাও বিশাল এলাকাজুড়ে। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তারপরও এই দেশ দুইটির মধ্যে আজ পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ হয়নি। ১৯৬২ সালে যুদ্ধ একবার বেধে ছিল বটে। তবে তাকে খণ্ডযুদ্ধ বলাই ভালো, আর সে যুদ্ধ চলেছিল মাত্র এক মাস। এই দুই পরাশক্তির মধ্যে ধ্বংসাত্মক বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো যুদ্ধ হয়নি। কেন বলুন তো?

কারণ, তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বতমালা। সুদীর্ঘ আর সুউচ্চ এই পর্বতমালা অতিক্রম করে পাশের দেশকে আক্রমণ করতে যাওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ না। হ্যাঁ, এখন প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে। ফলে হিমালয়ের এই বিশাল বাধা অতিক্রম করাও হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তার পরেও এই কাজে প্রচুর খরচ হবে। এমনকি এত খরচের পরেও দুর্লঙ্ঘ এই বাধা অতিক্রম করা খুব একটা সহজ হবে না। তাই বড় এই দেশ দুইটি একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। এর বদলে তারা পরস্পরের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। সেই সাথে অন্যান্য দেশের সাথে নিজেদের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

একটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন হবে তা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন, সেই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, চিন্তাধারা, প্রযুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু এই ব্যাপারগুলো স্থায়ী নয়। নেতা আসবে যাবে- তবে পাহাড়, পর্বত তো ঠায় দাঁড়িয়েই থাকবে। সরকার বদলের সাথে সাথে হিন্দুকুশ পর্বতের কোনো পরিবর্তন হবে না! হিন্দুকুশ এবং হিমালয়ের কারণে তৈরি হওয়া সমস্যা যুগের পর যুগ ধরে প্রতিটি প্রজন্মকেই মোকাবেলা করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে এই পার্বত্য এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যা খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই পার্বত্যভূমিতে খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন, এমনকি খনিজ পদার্থও কম।

ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব এবং এইসব বিষয় নিয়ে আমি প্রথম আগ্রহী হয়ে উঠি ১৯৯০-এর দশকে বলকান যুদ্ধের সময়। তখন আমি সেখানে যুদ্ধের খবর সংগ্রহের কাজ করছিলাম। যুদ্ধের সে-সময়টা আমি একদম কাছ থেকে দেখেছি। সে-সময় বলকান অঞ্চলের, অর্থাৎ সার্বিয়ান, ক্রোয়াট, বসনিয়ার নেতারা তাদের ভেতরকার প্রাচীন বিভাজনের কথা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। বলছিলেন প্রাচীনকাল থেকেই তাদের নিজেদের "গোত্র" কীভাবে অন্যদের "গোত্র" থেকে আলাদা। বুঝাচ্ছিলেন কেন অন্যদের সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ফলে বলকান অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিভেদ তৈরি হতে সময় লাগেনি।

কসোভোর আইবার নদীর উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝা যাবে। ১৩৮৯ সালে "কসোভো পোলিয়ের" যুদ্ধে অটোমানরা সার্বদের পরাজিত করে। যুদ্ধটা হয়েছিল মিত্রোভিচা শহরকে ঘিরে। এই শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে আইবার নদী। পরবর্তী শতকগুলোতে সার্বরা আইবার নদী থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। কারণ আলবেনিয়ান মুসলিমরা কসোভোর পার্বত্য অঞ্চল মালেসিয়া থেকে সরে এসে আইবারের তীরবর্তী কসোভো অঞ্চলে বসতি গড়তে শুরু করেছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এসে মুসলিমরাই এই অঞ্চলে সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়।

এই বিংশ শতকে এসেও আইবার নদীর দুইপাশে তাকালে এই নৃ-তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় বিভাজনটা মোটামুটি স্পষ্টই বুঝা যেত। এরপর ১৯৯৯ সাল থেকে ন্যাটো এই অঞ্চলে নাক গলাতে শুরু করে। আকাশে ন্যাটো আর স্থলে কসোভো লিবারেশন আর্মির সম্মিলিত আক্রমণ সামলাতে না পেরে তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার (এখনকার সার্বিয়ান) সামরিক বাহিনী আইবার নদী থেকে সরে যায়। যুগোস্লাভিয়ার সেনাবাহিনীর এই পশ্চাদপসরণের সাথে সাথে বাকি সার্বরাও দ্রুতই সেখান থেকে সরে যেতে থাকে। আইবার নদী তখন থেকে একটি অঘোষিত সীমানা হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে। সেই জায়গাটাকেই এখন কিছু দেশ স্বাধীন কসোভো প্রজাতন্ত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সেই সময়ে ন্যাটোর স্থলবাহিনী মিত্রোভিচা শহরে এসে ঘাঁটি গড়ে। তিন মাস ধরে যুদ্ধ চলে সেখানে। সেই সময়ে ধারণা করা হয়েছিল ন্যাটো পুরো

সার্বিয়াকেই দখল করে নেবে। কিন্তু সার্বিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক কৌশলের কারণে ন্যাটোর নেতারা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আসলে তাদের সেই সুযোগই ছিল না। হাঙ্গেরি হুমকি দিয়ে রেখেছিল যে তাদের নিজেদের দেশের ভেতর দিয়ে ঢুকে এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা তারা বাস্তবায়ন হতে দেবে না। কারণ, সার্বিয়ার উত্তর অংশে হাঙ্গেরিয়ান জনগোষ্ঠীর প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ ছিল। এই মানুষগুলো কোনোভাবে আক্রমণের শিকার হোক সেটা হাঙ্গেরির সরকার চায় না। বিকল্প উপায় ছিল দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়া। ওইদিক দিয়ে খুব দ্রুত আইবার নদীর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যেত। কিন্তু সেটাও খুব একটা সুবিধাজনক হতো না। কারণ, এর পরেই রয়েছে বিশাল পর্বত।

তখন বেলগ্রেডে আমি সার্বদের একটা সাংবাদিক দলের সাথে কাজ করছিলাম। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি ন্যাটোর এই মতলব সম্পর্কে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ন্যাটো যদি হামলা করে তখন তোমরা কী করবে? এই সার্বিয়ান সাংবাদিকদের সোজাসাপ্টা উত্তর ছিল- 'আমরা ক্যামেরা নামিয়ে রেখে হাতে বন্দুক তুলে নেব।' আমার এই বন্ধুরা ছিল উদারপন্থী, ছিল সার্বিয়ার তৎকালীন সরকারের বিরোধী। কিন্তু তারপরেও তারা এই ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত ছিল। ওরা আমাকে ম্যাপ ধরে বুঝাতে লাগল কোন এলাকায় সার্বরা প্রতিরোধ গড়বে। ন্যাটো সামনে এগোতে থাকলে কোন অবস্থানে গিয়ে তাদেরকে আটকে দেওয়া হবে। তারা আমাকে সার্বিয়ার পর্বতমালা দেখাল। বুঝাল, কেন এই জায়গা পেরিয়ে যাওয়া এত সহজ না। সার্ব বন্ধুদের কাছ থেকে ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে দারুণ একটা বিষয় শেখা হয়ে গেল! ঘরে বসে কাগজ পড়ে, টিভি দেখে আর ব্রাসেলসের পিআর মিডিয়ার সাজানো বুলি শুনে এই শিক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

ভৌগোলিক কারণে যুদ্ধ এবং ভূ-রাজনীতি কীভাবে প্রভাবিত হয় সেটা আমি তখন জেনেছিলাম। এই শিক্ষা আমি পরবর্তীতে সাংবাদিকতায় কাজে লাগিয়েছি। ২০০১ সালে, ৯/১১ এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই বিষয়টি নিয়ে একটা চমৎকার তথ্যচিত্র দেখি। বর্তমানের আধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক স্থাপনা, জলবায়ু ইত্যাদির কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক

বাহিনীও কীভাবে পরাভূত হতে পারে, তা নিয়ে নির্মিত হয়েছিল তথ্যচিত্রটি। এর বাস্তব প্রমাণও পরে পেয়েছি। আমি তখন উত্তর আফগানিস্তানে। তাজিকিস্তানের সীমান্ত থেকে ভেলায় চড়ে রওনা দিলাম আমরা। উদ্দেশ্য ছিল নর্দান এলায়েন্সের সেনাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া। নর্দান এলায়েন্স এর অফিসিয়াল নাম ছিল "United Islamic National Front for the Salvation of Afghanistan"। এই দলটি মূলত সম্মিলিতভাবে আফগানিস্থানের তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। নর্দান এলায়েন্স'কে তখন ভারত, ইরান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র এবং উজবেকিস্তান সরাসরি সহায়তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমান সেসময় ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করে চলেছে। অ্যামেরিকান সৈন্যদের পরিকল্পনা ছিল, আল কায়েদাকে মাজার-ই-শরীফের পূর্বদিকের পাহাড়ের ঠাণ্ডা এবং ধূলি-ধূসরিত অবস্থানে আটকে রেখে, কাবুলের দিকে এগিয়ে যাবে তারা। কয়েক সপ্তাহ পর নর্দান এলায়েন্সের সৈন্যরা যখন দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, তখন প্রকৃতি শুরু করল তার খেল দেখানো।

শুরু হলো মরুঝড়। এমন ভয়ানক ধূলিঝড় আর কখনো দেখিনি। সবকিছুকে সরিষা ফুলের মত হলুদ বানিয়ে দিল সেই ঝড়! বাতাস ছিল প্রচণ্ড ভারী, মিশে ছিল প্রচুর পরিমাণে ধূলো। ৩৬ ঘণ্টা ধরে ধূলো ছাড়া আর কিছুই দেখিনি আমরা। কয়েক গজ দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। বুঝা গেল আবহাওয়া ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আর সামনে এগুনো সম্ভব হবে না। অ্যামেরিকার অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তি কোনো কাজেই আসেনি তখন। প্রকৃতির কাছে রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়ল পরাশক্তি অ্যামেরিকা এবং তাদের অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি! প্রেসিডেন্ট বুশ, সেনাপ্রধান এবং অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের আসলে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। ৩৬ ঘণ্টা ধরে ধূলো দেখতে দেখতে ঝড় থামার অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। এছাড়া আর কী'ই বা করার ছিল! অবশেষে আবহাওয়ার বদলাতে শুরু করল। ভাবছেন এর পরে স্বস্তি ফিরল! একদমই না! ঝড়ের শেষে শুরু হলো বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি! জমে থাকা ধূলো পরিণত হলো থকথকে কাদায়। আমরা কাদা আর খড় দিয়ে বানানো যে কুড়েঘরটিতে ছিলাম, মনে হচ্ছিল বৃষ্টির পানিতে তা যেন গলে

গলে যাচ্ছে! বুঝা গেল, দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রকৃতির অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়।

ভূ-প্রকৃতির এই নিয়মের কাছে সব যুগেই নেতাদের মাথা নত করতে হয়েছে, সে তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন। প্রকৃতির কাছে বশ্যতা মানতে বাধ্য হয়েছেন হ্যানিবল, সান জু, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন সবাই। আজকের নেতারাই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেন! সাম্প্রতিক সময়ে, এই ২০১২ সালেও এমন একটা উদাহরণ দেখেছি। তখন সিরিয়ায় পুরোদমে গৃহযুদ্ধ চলছে। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম একটা পাহাড়ের চূড়ায়। উপত্যকা ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গেল দক্ষিণের হামা শহরে। দেখলাম, বেশ দূরে ছোট একটি গ্রাম জ্বলছে। ঐ গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে আরো বড় একটা গ্রামের দিকে ইশারা করে দেখাল আমার সিরিয়ান বন্ধুরা। ঐ বড় গ্রামটি থেকেই না কি আক্রমণটা হয়েছে। তারা আমাকে ব্যাখ্যা করে বলল- যদি উপত্যকার কোনো একটি গ্রাম অন্য গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে উপত্যকা থেকে বের করে দিতে পারে তাহলে দুইটি এলাকা যোগ করে টিকে থাকার মত ছোটখাটো একটা রাজ্য তৈরি করে ফেলতে পারবে তারা। কারণ, উপত্যকার অপর পাশে রয়েছে দেশের একমাত্র মহাসড়ক। সিরিয়া যদি আর কখনো একত্র না হয়, তখন এই অঞ্চলটা একটা আলাদা রাজ্য হতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। কিন্তু এই রাস্তাটি এর জন্য খুবই জরুরি। আর এজন্যই এই আক্রমণ। পুড়তে থাকা গ্রামটির দিকে তাকিয়ে আমি আবারও রাজনীতিতে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের কথা বুঝতে পারলাম।

ভূ-রাজনীতির প্রভাব প্রতিটা দেশের ওপরই পড়ে। দেশে যুদ্ধ বা শান্তি-সমৃদ্ধি যাই থাকুক, এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। ওপরে যেসব উদাহরণ দিয়েছি, তা খুবই সামান্য। সারা পৃথিবীতে এমন অসংখ্য পরিস্থিতি এসেছে যুগে যুগে। একটা বইয়ে এত কিছু বলা সম্ভব নয়। যেমন, আমি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া আর ইন্দোনেশিয়ার কথা তো তেমন কিছু লিখিইনি এই বইয়ে। অথচ এক অস্ট্রেলিয়ার ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কীভাবে পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে তা নিয়েই আস্ত একটা বই লেখা যায়। এখানে আমি মূলত শক্তিশালী দেশ এবং অঞ্চলগুলোর ওপরই বেশি আলোকপাত করেছি। অতীতে

কীভাবে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাবে বিভিন্ন দেশ গঠিত হয়েছে সেসব তো আছেই। এছাড়াও আলোচনা করেছি বর্তমান সময়ের প্রধান কিছু বিষয় নিয়ে, যেমন- ইউক্রেনের ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা, চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বা আর্কটিক অঞ্চলের পেট্রোলিয়াম দখল নিয়ে সৃষ্ট প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও বলেছি ভবিষ্যতের পট পরিবর্তন নিয়ে, যেমন- আর্কটিক অঞ্চল নিয়ে ক্রমেই বাড়তে থাকা প্রতিযোগিতা।

রাশিয়ার দিকে তাকালে আমরা আর্কটিকের পরাক্রম বুঝতে পারব। এই বিশাল দেশটি সত্যিকারের পরাশক্তি হয়ে উঠতে পারছে না শুধু আর্কটিক অঞ্চলের হিমশীতল বৈরী আবহাওয়ার কারণে। আবার, চীনের দিকে তাকালে বুঝা যাবে শক্তিশালী একটা নৌবাহিনী থাকা আসলে কতটা জরুরি। বর্তমান সময়ে এসে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমুদ্রপথগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে চীন। এদিকে এতদিন তারা নজর দেয়নি বলেই পরাশক্তি হওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যায়টিতে দেখা যাবে, ধীরে ধীরে আশেপাশের এলাকা দখল করে সীমানা বাড়ানোর চতুর পরিকল্পনা কীভাবে দুই মহাসাগর জুড়ে পরাশক্তি হতে সাহায্য করেছে তাদেরকে। সমতলভূমি আর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত নদীর প্রভাব কীভাবে পৃথিবীতে আধুনিক যুগ শুরু করার মতো এক বিশাল সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটাতে পারে, তার উদাহরণ হলো ইউরোপ। আর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রভাব বুঝা যাবে আফ্রিকার দিকে তাকালে।

একই ধরনের ভূপ্রকৃতি এবং একই ধরনের সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে কৃত্রিম সীমানা টেনে আলাদা করার ফলাফল দেখা যাবে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক অধ্যায়টিতে। এই আরোপিত সীমানার ফল ভালো হয়নি। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ অব্যাহত আছে এই অঞ্চলে। আফ্রিকা আর ভারত-পাকিস্তানের বিষয়টাও অনেকটা কাছাকাছি। এই বিভেদের রেখা টেনে টেনে ম্যাপ ধরে দেশ আলাদা করার কাজটি করেছে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো। তারা এই অঞ্চলগুলোর প্রাকৃতিক অবস্থার বিষয়টা আমলেই নেয়নি। বিভেদ সৃষ্টিকারী এই লাইনগুলোকে সংযুক্ত করার বিপ্লব এখনো চলছে। এর ফলে বারবার তৈরি হচ্ছে সহিংসতা এবং যুদ্ধ। এই প্রচেষ্টা আরো

অনেক বছর ধরে চলমান থাকবে। সহিংসতাও তাই থামবে না। এই এলাকার ম্যাপ এখন যেমন আছে, একসময় তেমনটা আর থাকবে না।

জাপান আর কোরিয়ার বিষয়টা আবার কসোভো বা সিরিয়া থেকে আলাদা। জাপান ও কোরিয়ার মানুষের জাতিসত্ত্বা প্রায় অভিন্ন। কিন্তু, তাদের সমস্যার ধরনগুলো ভিন্ন। দ্বীপদেশ জাপানে প্রাকৃতিক সম্পদ নেই বললেই চলে। আবার এদিকে, দুই কোরিয়ার বিভাজনের সময় ভৌগোলিক বিষয়ের কথা মাথায় রাখাই হয়নি। এসব নিয়েই ঐ অঞ্চলের যাবতীয় বিরোধ।

ল্যাটিন অ্যামেরিকার দক্ষিণ অংশ বাকি পৃথিবী থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। সেখানে বসে বাকি পৃথিবীর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করা খুবই কঠিন। আবার এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো কোনো স্থানীয় সংগঠনও গড়ে তোলা সম্ভব না।

এই বইয়ের সবশেষে আলোচনা করেছি আর্কটিক অঞ্চলকে নিয়ে। পৃথিবী সবচেয়ে বসবাস-অযোগ্য অঞ্চল বলা যায় আর্কটিককে। এক সময় এই অঞ্চল নিয়ে কারো তেমন কোনো আগ্রহই ছিল না বলতে গেলে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই এলাকা সম্পর্কে বিশ্বনেতাদের আগ্রহ বাড়ছে। কারণ, এখানে পাওয়া গেছে প্রাকৃতিক সম্পদ। কে এই সম্পদের মালিকানা পাবে, কারা পাবে বিক্রয়ের অধিকার- তা নির্ধারিত হবে সামনের দিনগুলোতে।

ইতিহাসের বাঁকবদলের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের ভূমিকা নিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবীই আলোচনা করতে চান না। এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে গেলে পৃথিবী তাদের চোখে খুবই বিবর্ণ হয়ে ধরা দেয়। কারণ, তখন তারা বুঝতে পারেন যে প্রকৃতি মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। প্রকৃতির অনুমোদন ছাড়া অনেক কিছুই মানুষ করতে পারে না। এই কারণে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব এড়িয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়েই তারা বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। অবশ্য এটা ঠিক যে- আজকাল ভৌগোলিক অবস্থানের অনেক বাধা'ই আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে জয় করা সম্ভব। যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এরকম অনেক উদাহরণ দেখতে পাবেন। এখন অ্যামেরিকা চাইলেই মিসৌরি থেকে জঙ্গিবিমান নিয়ে মসুল পর্যন্ত গিয়ে বোমা ফেলতে পারে। এমনকি এই বিশাল পথে তেল নেওয়ার জন্য থামারও প্রয়োজন পড়বে না। তারা এমন যুদ্ধবিমানও তৈরি

করছে যা একটানা হাজার হাজার মাইল চলতে পারে। মাঝখানে থেমে বন্ধুদেশের সাহায্য নেওয়ারও প্রয়োজন হবে না এখন আর। তারা এখন দিয়াগো গার্সিয়া বা বাহরাইনে স্থায়ী বিমান ঘাঁটি গড়তে পারে চাইলেই। তবে তার খুব একটা দরকার এখন আর নেই হয়তো। কিন্তু তারা চাইলেই এটা করতে পারবে।

ফলে, এটা বলাই যায় যে আধুনিক বিমান নামক শক্তিশালী প্রযুক্তিটি প্রকৃতির ওপর থেকে নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। ইন্টারনেটও এইসব বদলের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে তার নিজস্ব উপায়ে। কিন্তু তারপরও, একটা অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সে অঞ্চলে রাষ্ট্র গঠনে কী কী ভূমিকা রেখেছে, তা এখনো আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। একটি দেশের নীতি-নির্ধারকরা কোনোভাবেই এসব বিষয় এড়িয়ে যেতে পারবেন না। ইরাক এবং সিরিয়ার ওপর এখন অ্যামেরিকা আগ্রাসন চালাচ্ছে। কিন্তু কেন? তার মূলে কী আছে? ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এই অঞ্চলের ম্যাপ তৈরি করেছিল নিজেদের ইচ্ছামতো, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিন্দুমাত্র আমলে না নিয়ে । আর তার ফলে এই অঞ্চলে এখনো যুদ্ধ লেগেই আছে। কিন্তু, তিব্বতে চীনের অনুপ্রবেশ আবার ভূ-প্রকৃতির নিয়ম মেনেই হয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পরাশক্তি এবং উন্নত প্রযুক্তির দেশ অ্যামেরিকাও পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কথা ভাবে। ভাবতেই হবে, এছাড়া আসলে উপায় নেই।

তাহলে ভূ-প্রকৃতির এই নিয়মগুলো আসলে কী? পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করার সময় নেতারা কী কী বিষয় নিয়ে ভাবেন? এই বিষয়গুলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য আমি রাশিয়াকে দিয়ে শুরু করব। সুবিশাল দেশ রাশিয়াকে রক্ষা করা কঠিন! কারণ, এর সীমান্ত খোলা। প্রকৃতি এখানে এমন বড় কোনো বাধা রেখে দেয়নি যা দেখে অন্য দেশগুলো পিছু হটবে। রাশিয়ার পশ্চিম অংশে পর্বত না থাকার কারণেই মূলত নিরাপত্তার এই সমস্যা। এই কমতিটা দূর করার জন্য যুগে যুগে দেশটির নেতারা পশ্চিমদিকের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করেছেন। এটাই তাদের সুরক্ষার একমাত্র উপায়। কতটুকু সফল হয়েছে তাদের এই প্রচেষ্টা? এই সমস্যার উপায় বের করতে গিয়ে আসলে কী কী নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে? এর সবটুকুই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

অধ্যায় এক

রা শি য়া



বিশাল (বিশেষণ- বিশালতর, বিশালতম) - অনেক বড় এলাকা, বিস্তৃত





রা শি য়া

রাশিয়া একটি বিশাল দেশ। বিশাল মানে সুবিশাল! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশ। ছয় মিলিয়ন বর্গমাইল এলাকার এই দেশটিতে আছে এগারোটি ভিন্ন ভিন্ন টাইমজোন!

রাশিয়ার মধ্যে আছে বিশাল বিশাল বন, নদী, হ্রদ, স্তেপ নামে পরিচিত বিশাল তৃণভূমি, তুন্দ্রা অঞ্চল, শত শত মাইল জুড়ে বিস্তৃত তৈগা বনাঞ্চল এবং পর্বতমালা। রাশিয়ার এই বিশালত্বের কথা পৃথিবীবাসীর কাছে যেন অতি পরিচিত। রাশিয়ার আকার এতই বড় যে, আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন রাশিয়া দেশটির সাথে আমরা কোনো না কোনোভাবে জড়িত! রাশিয়ার ভালুক যেন পৃথিবীর সবখানেই! আর সেজন্যই হয়তো রাশিয়ার ম্যাপের আকারও ভালুকের মতো। বিশাল আকৃতির জন্য যথার্থ রূপকই বলা চলে। বিশাল এই দেশটির প্রতীক যে ভালুক হবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

রাশিয়ান ভালুক কখনো চলে যাচ্ছে শীতনিদ্রায়, কখনো ছাড়ছে হুংকার, কখনোবা সে রয়েছে রাজকীয় কায়দায়; তবে এটা মনে রাখতে হবে যে রাশিয়ান ভালুক সবসময়ই হিংস্র। ভালুকের ইংরেজি, অর্থাৎ বিয়ার (Bear) মূলত একটি রাশিয়ান শব্দ। তবে ভালুকের হিংস্র আর ভয়ানক রূপের কথা চিন্তা করে রাশিয়ানরা এই প্রাণীটিকে আসল নামে ডাকতে চায় না। ওরা ভালুককে বলে মেদভেদ (Medved)। মেদভেদ অর্থ "যা মধু পছন্দ করে"।

ইউরোপ এবং এশিয়া এই দুই মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত এই বিশাল দেশে অন্তত ১,২০,০০০ মেদভেদ বসবাস করছে। উরাল পর্বতমালার পশ্চিমে আছে রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশ। আর এশিয়ার অংশ শুরু হয়েছে উরালের পূর্ব দিক থেকে। দেশটির একদম পূর্বদিকে রয়েছে সাইবেরিয়া অঞ্চল। এই

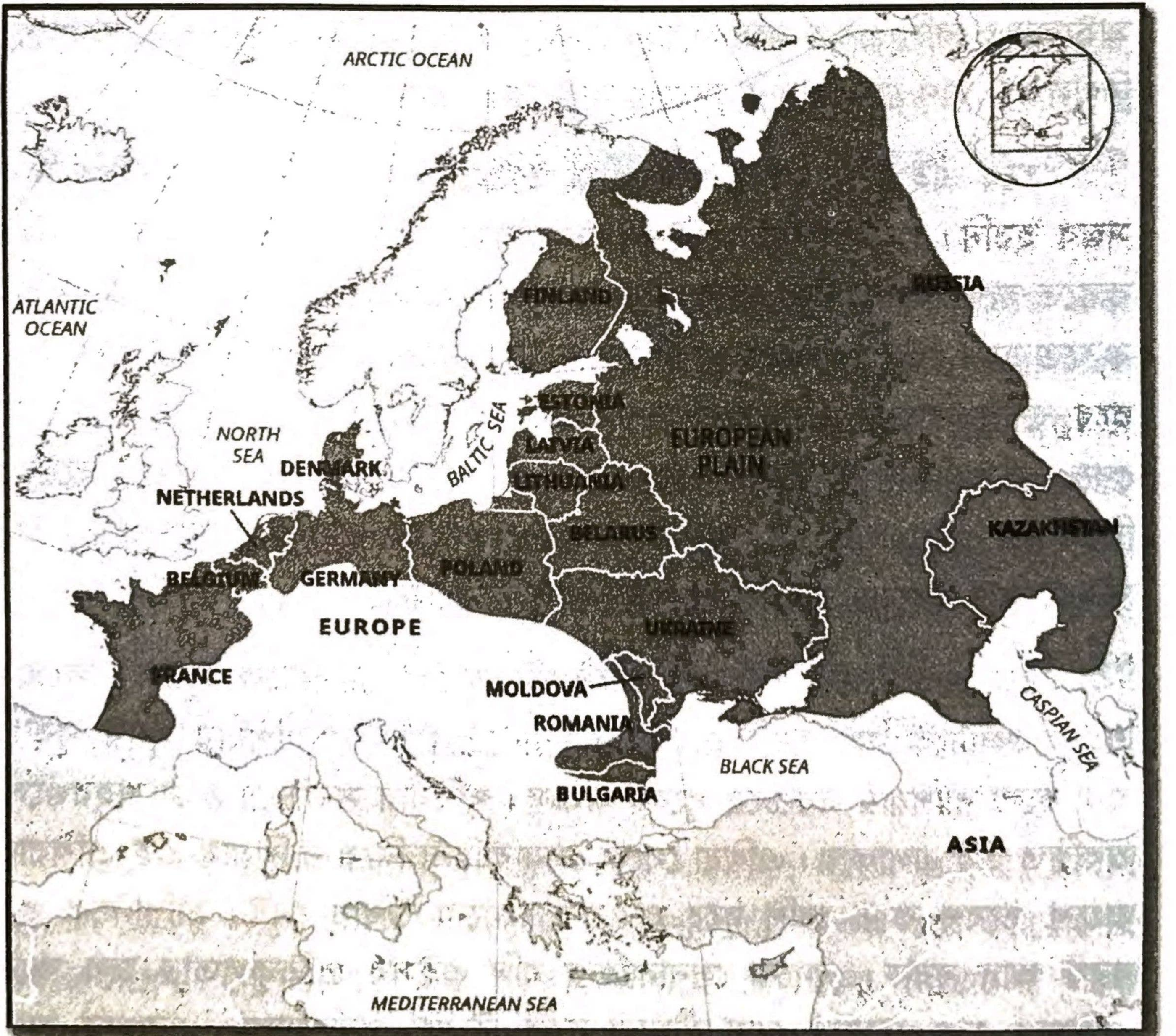
সাইবেরিয়াও কম বড় নয়। বেরিং সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের গা ঘেঁষে বিশাল এলাকা জুড়ে তার অবস্থান। এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও ট্রেনে উঠে শুধুমাত্র সাইবেরিয়া অঞ্চলের পুরোটা অতিক্রম করতে লেগে যাবে পুরো ছয়টি দিন! এই দূরত্ব, এই বিশালতা পর্যবেক্ষণ করে রাশিয়ান নেতারা সেভাবেই তাদের দেশ এবং পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতি সাজিয়েছেন। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করার পর শেষ পর্যন্ত পশ্চিম দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়াটাই তাদের কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে।

রাশিয়া নিয়ে কিছু বলতে গেলে লেখকেরা উইনস্টন চার্চিলের একটা বিখ্যাত উক্তির শরণাপন্ন হন। ১৯৩৯ সালে রাশিয়া সম্পর্কে চার্চিল বলেছিলেন, "রাশিয়া হচ্ছে মায়াবী এক প্রহেলিকার ভেতরে রহস্যের চাদরে মোড়ানো একটা ধাঁধা"। কিন্তু এই ধাঁধার সমাধান কী? সাত বছর পরে চার্চিল নিজেই সেই ধাঁধার উত্তর দিয়ে দেন। "আমি নিশ্চিত যে রাশিয়ানরা শক্তি বা ক্ষমতার চেয়ে বেশি আর কোনো কিছুকেই মূল্যায়ন করে না। দুর্বলতাকে তারা যতটা ঘৃণা করে, আর কোনো কিছুকেই এতটা ঘৃণা করে না। বিশেষ করে দুর্বল সেনাবাহিনীকে"।

চার্চিল হয়তো রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের কথাই বলেছিলেন! রাশিয়ার বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে বলা চলে গণতন্ত্রের আলখাল্লায় মোড়ানো এক ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। মাদার রাশিয়া অতীতেও আগ্রাসী নীতিতে এগিয়েছে। বর্তমানের আধুনিক রাশিয়াও সেই প্রাচীন নীতিতেই অটল। ভ্লাদিমির পুতিন যখন "ঈশ্বর" এবং "ইউক্রেনে আরো পর্বত কেন নেই" এই জাতীয় চিন্তা থেকে একটু অবসর নেন, তখন তিনি হয়তো এক স্লাইস পিৎজা নিয়ে ভাবতে বসেন।

পিৎজার এই স্লাইসটি হলো "উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি", আর এই সমভূমির একদম সরু ধারটি হচ্ছে পোল্যান্ড। "উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি" অঞ্চলটি বিশাল; ফ্রান্স থেকে শুরু করে রাশিয়ার উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত। কিন্তু সব জায়গায় এর প্রস্থ সমান না। এই সমভূমির সবচেয়ে চিকন অংশটি অবস্থিত পোল্যান্ডে। এখানে এর প্রস্থ মাত্র ৩০০ মাইল। রাশিয়ার ভূ-রাজনীতি গভীরভাবে বুঝতে হলে এই "উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি" এবং উরাল পর্বতমালা

সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা রাখা প্রয়োজন। উরাল পর্বতমালা শুরু হয়েছে কাজাখস্তান থেকে, আর শেষ হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তর প্রান্তে; আর্কটিক মহাসাগরে। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই পর্বতমালার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০০ মাইল। উরাল পর্বতকে এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে প্রাকৃতিক সীমানা বললেও ভুল হবে না। অন্যদিকে, উত্তর ইউরোপীয় সমভূমিতে রয়েছে ফ্রান্সের গোটা উত্তর ও পশ্চিম অংশসহ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, উত্তর জার্মানি এবং পোল্যান্ডের অধিকাংশ এলাকা। এই সমভূমি বিস্তৃত হয়ে পরিণত হয়েছে বৃহত্তর ইউরোপীয় সমভূমিতে। নিচের মানচিত্রে গাঢ় রঙের অংশ পুরোটাই ইউরোপীয় সমভূমি।



চিত্র: ইউরোপের উত্তর প্রান্তে উত্তর সাগর আর বাল্টিক সাগরের উপকূল হয়ে বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে "ইউরোপীয় সমভূমি" (গাঢ় অংশ)।

বিশাল এই সমভূমিটি পোল্যান্ডের কিছু অংশে উত্তর-দক্ষিণে মাত্র ৩০০ মাইল চওড়া। এই জায়গাটাতে উত্তরে আছে বাল্টিক সাগর আর দক্ষিণে কার্পেথিয়ান পর্বতমালা। রাশিয়ার কাছে ম্যাপের এই অংশটা দুইধারী তলোয়ারের মতো। কারণ, পোল্যান্ডের এই সরু করিডোরটি রাশিয়ার জন্য একদিকে খুবই সুবিধাজনক। এদিক দিয়ে যদি শত্রুপক্ষ ঢুকতে চায়, তাহলে রাশিয়া সৈন্য পাঠিয়ে সহজেই প্রতিহত করতে পারবে। ফলে, পোল্যান্ড হয়ে মস্কোর দিকে এগিয়ে যাওয়া খুব একটা সহজ হবে না। কিন্তু, পোল্যান্ড থেকে পূর্বদিকে রাশিয়ার যত কাছাকাছি যাওয়া হবে পিৎজার স্লাইসটি ততই চওড়া হতে থাকবে। রাশিয়ার সীমান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এই সমভূমিটি ২০০০ মাইলেরও বেশি প্রশস্ত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বাধাবিহীন এই বিশাল অঞ্চলকে বিপুল পরিমাণ সেনাবাহিনী দিয়েও রক্ষা করা একটা কঠিন ব্যাপার।

তবে এই দিক থেকে রাশিয়াকে আক্রমণ করে কখনো পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। সেটা কিছুটা কৌশলগত কারণে। আসলে, এই পথে আক্রমণ করতে হলে বিশাল লম্বা রাস্তা ধরে সৈন্যদের খাদ্য ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ করতে হয়। এই পথে মস্কো পৌঁছাতে চাইলে সাপ্লাই লাইনকে যতটা লম্বা হতে হবে, তাতে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে নেপোলিয়ন একবার ১৮১২ সালে এই পথে রাশিয়া আক্রমণ করেছেন। হিটলারও এই একই ভুল করে বসেন ১৯৪১ সালে। আর ইতিহাসে এই দুইটি ঘটনাই বড় ধরনের ভুল হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

ঠিক একইভাবে, রাশিয়ার আরেকটি অঞ্চল রাশিয়াকে সুরক্ষা দিচ্ছে। এই অঞ্চলটাকে বলা হয়, "Russian Far East" বা "রাশিয়ার সুদূর পূর্ব"। এটা হলো রাশিয়ার সবচেয়ে পূর্বের অঞ্চল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা শহরগুলো অবস্থিত এই এলাকায়। এশিয়া থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে রাশিয়ায় এই এশিয়ান অংশে প্রবেশ করে বেশি দূরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। কোনো সেনাবাহিনী যদি এইসব প্রতিকূলতার জয় করে এগিয়েও যায়, তাদের শেষ সীমানা হলো উরাল পর্বতমালা। এরপরে আর যাওয়ার উপায় নেই। ফলে সেনাবাহিনীকে তখন আটকে থাকতে হবে প্রচণ্ড বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে। এরকম বিশাল আর দুর্গম এলাকায় টিকে থাকতে

হলে সাথে থাকতে হবে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আর অন্যান্য রসদ। আর যে কোনো মুহূর্তে পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনা তো থাকছেই! এসব কারণে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন রাশিয়াকে আক্রমণ করার হিম্মত হয়তো কারোরই নেই। কিন্তু রাশিয়ানরা এভাবে চিন্তা করে না। কারণ, বিগত ৫০০ বছরে পশ্চিম দিক থেকে অনেকবারই রাশিয়ার ওপর বহিঃশক্তির আক্রমণ হয়েছে।

পোলিশরা ১৬০৫ সালে উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি ধরে রাশিয়ায় হামলা করেছিল। এরপর ১৭০৮ সালে দ্বাদশ চার্লসের নেতৃত্বে আসে সুইডিশরা। নেপোলিয়নের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এমনকি জার্মানরাও দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় দুইবার চেষ্টা করেছে। একবার ১৯১৪ সালে, পরেরবার ১৯৪১ সালে। নেপোলিয়নের সময় থেকে, ১৮৫৩-৫৬ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে ধরে, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে, প্রতি ৩৩ বছরে একবার করে উত্তর ইউরোপীয় সমতলে যুদ্ধ করতে হয়েছে রাশিয়াকে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তৎকালীন পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে অবস্থিত জার্মানির নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু এলাকা রাশিয়ানরা দখল করে নেয়। এই এলাকাগুলো পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হয়ে যায়। ঐ সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন সাবেক রাশিয়ান সাম্রাজ্যের আগ্রাসী পথেই হাঁটছিল! রাশিয়ার এই আগ্রাসী স্বভাবের জবাব দিতেই মূলত পশ্চিমা দেশগুলো ১৯৪৯ সালে “ন্যাটো” সামরিক জোট প্রতিষ্ঠা করে। ইউরোপ আর উত্তর অ্যামেরিকার দেশগুলো ন্যাটোর অন্তর্ভূক্ত হয়। ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ এবং আটলান্টিকের উত্তর অংশকে রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা।

তবে সোভিয়েত ইউনিয়নও চুপ করে থাকেনি। ন্যাটো প্রতিষ্ঠার জবাব হিসাবে ১৯৫৫ সালে রাশিয়ার নেতৃত্বে 'ওয়ারশ প্যাক্ট' স্বাক্ষর করে ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো। এই চুক্তির মাধ্যমে দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে সামরিক প্রতিরক্ষা বাড়াতে চেয়েছিল। প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল এ বড় কঠিন বন্ধন, একদম যেন লৌহনির্মিত! কিন্তু ১৯৮০'র দশক থেকে এই

বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। আর বার্লিন দেওয়ালের পতনের সাথে সাথে চুক্তিও ভেস্তে যায়।

রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেভের খুব একটা অনুরাগী বলা যাবে না। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান দুরবস্থার জন্য এবং বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার জন্য তিনি গর্ভাচেভকেই দায়ী করেন। পুতিনের মতে, এই বিভক্তি ছিল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ভূ-রাজনৈতিক বিপর্যয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে রাশিয়া উদ্বেগের সাথে ন্যাটোর সম্প্রসারণ দেখে চলেছে। ন্যাটো ধীরে ধীরে হাত বাড়াচ্ছে সোভিয়েতপন্থী দেশগুলোর দিকে। অনেক দেশই কথা দিয়েছিল যে তারা সব সময় রাশিয়ার সাথেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত সেই দেশগুলোকেও সদস্য করে নিয়েছে ন্যাটো। চেক রিপাবলিক, হাঙ্গেরি আর পোল্যান্ড ন্যাটোয় যোগ দিয়েছে ১৯৯৯ সালে। বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া এবং স্লোভাকিয়া যোগ দিয়েছে ২০০৪ সালে। আর ২০০৯ সালে আলবেনিয়াকে যুক্ত করা হয়েছে। রাশিয়ার দাবি হলো- দেশগুলো ন্যাটো জোটে যোগ দিয়ে রাশিয়ার সাথে চুক্তি-বহির্ভূত কাজ করেছে। কিন্তু ন্যাটোর ভাষ্যমতে এই দেশগুলো রাশিয়ার কাছে কখনোই এমন কোনো শপথ করেনি।

অন্যান্য পরাশক্তিদের মতো রাশিয়াও পরিকল্পনা করার সময় ভবিষ্যৎ মাথায় রেখে কাজ করে। আগামী ১০০ বছরে কী কী হতে পারে সেটাও তাদের ভাবতে হয়। রাশিয়া জানে ভবিষ্যৎ সবসময় অনিশ্চিত। যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। ১০০ বছর আগেও কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে মস্কোর নাকের ডগায়, মাত্র কয়েকশ মাইল দূরে পোল্যান্ড আর বাল্টিক সাগরের মাঝখানে এসে মার্কিন সামরিক বাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে? ১৯৮৯ সালে ওয়ারশ চুক্তি ভেঙে যাওয়ার ১৫ বছরের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দেশগুলো সবাই ন্যাটো অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়ে ফেলে। এসব ঘটনা যে রাশিয়ার নেতাদের নাড়া দেয় না, একথা ভাবা মোটেই উচিত হবে না। পাশাপাশি নিজেদের ইতিহাসের দিকেও নজর রাখতে হয়।

রাশিয়া নামে যে একটি দেশ হতে পারে এই ভাবনার শুরু নবম শতাব্দীর দিকে। নিপার নদীর ধারে ছিল কিয়েভ শহর। সেই সময় কিয়েভ শহরকে কেন্দ্র করে নিপার নদীর আশেপাশের কয়েকটি শহর মিলে একটি ছোট ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়। এই কাজটি করেছিল কিছু পূর্ব স্লাভিক গোত্রের মানুষেরা। এই অঞ্চলটি এখন ইউক্রেন নামে পরিচিত। তাদের ফেডারেশনের নাম ছিল "কিয়েবান রুশ"। তবে কিয়েবান রুশকে বর্তমান সময়ের মতো কোনো জাতিরাষ্ট্র বলা চলে না। এরপর ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোলরা প্রবল প্রতাপে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য মঙ্গোলরা অন্যান্য অঞ্চলের মত রাশিয়ার ভূমিকেও রেহাই দেয়নি। এই অঞ্চলটি তখন দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে প্রচুর মঙ্গোল আক্রমণের শিকার হয়। এর জবাবে সদ্য জন্ম নেওয়া সেই রাশিয়া তখন একটু উত্তর-পূর্বে সরে এসে মস্কোকে কেন্দ্র করে তাদের অঞ্চলটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজায়। সেই সময়ের রাশিয়া "গ্র্যান্ড প্রিন্সিপালিটি অফ মস্কোভি" নামে পরিচিত ছিল। তখন অবশ্য রাশিয়াকে আক্রমণ করা সহজ ছিল! কারণ, দেশটির কোনো প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। ছিল না কোনো মরুভূমি বা বড় কোনো পর্বত। ছিল শুধু অল্প কয়েকটা নদী। আর 'স্তেপ' নামক বিশাল তৃণভূমির দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে ওত পেতে ছিল মঙ্গোলরা। এই মঙ্গোলরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তারা চাইলে যে কোনো দিক থেকেই আক্রমণ করতে পারত।

রাশিয়ার সম্রাটদের বলা হয় "জার"। রাশিয়ার প্রথম জার আইভান দ্যা টেরিবল "আক্রমণই শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা"-এই নীতি প্রবর্তন করেন। প্রথমে তিনি দেশের মানুষকে একত্রিত করার উদ্যোগ নেন। জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে রাশিয়া। শক্তি সঞ্চয়ের পরে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোযোগ দেন। বিশাল রাশিয়া এভাবেই বিশালতর হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করে। একা একজন মানুষ কীভাবে ইতিহাস বদলে দিতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন জার আইভান দ্যা টেরিবল।

তার দূরদৃষ্টি আর নির্মমতা ছাড়া রাশিয়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যরকম হতো। রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি অবশ্য শুরু হয়েছিল তাঁর দাদু আইভান দ্যা গ্রেটের আমল থেকেই। তবে বুড়ো আইভানের রাজ্য বিস্তারের ঝোঁক ততটা

তীব্র ছিল না। ১৫৩৩ সালে তাঁর নাতি আইভান দ্যা টেরিবল ক্ষমতায় আসার পর দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি অধিগ্রহণ করে নেন উরাল পর্বতমালার পূর্বাঞ্চল, কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণাঞ্চল এবং সুমেরুবৃত্তের উত্তর অংশ। রাশিয়া একে একে কাস্পিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণসাগরের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। এরপর তারা ককেশাস পর্বতমালাকে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। চেচনিয়াতেও তারা সেনা ঘাঁটি স্থাপন করে। এভাবে মঙ্গোলদের পাশাপাশি পার্সিয়ান এবং অটোমান সাম্রাজ্যকেও আটকানো সম্ভব হয়।

এর মাঝে কিছু বাধাবিপত্তি এলেও, রাশিয়া পরের ১০০ বছরে উরাল পর্বত অতিক্রম করে এগিয়ে যায় সাইবেরিয়ার দিকে। ধীরে ধীরে বহুদূর পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত দখলে নিয়ে নেয়।

রাশিয়ানরা এবার পেয়ে গেল একটা আংশিক বাফার জোন, সেই সাথে পিছু হটার জন্য একটা ভালো জায়গা। কেউ আক্রমণ করে বসলে গা বাঁচাতে পিছু হটার জন্য এই জায়গাগুলো আদর্শ। উরাল পর্বতমালা পার হয়ে, বা আর্কটিক সাগরের দিক থেকে তাদের কেউ আক্রমণ করতে আসবে না। মূলত, এই সময়টাতেই রাশিয়া দেশটা প্রথমবারের মত আমাদের পরিচিত রাশিয়া হয়ে উঠেছিল। ওই সময় রাশিয়াকে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন হত বিপুল পরিমাণ সৈন্য। আক্রমণ করতে চাইলে এই সেনাদের আবার অনেকদিন ধরে প্রচুর খাবার এবং রসদও সরবরাহ করতে হবে, যা মোটেই সহজ কাজ নয়। রাশিয়া এভাবে নিজেদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে চলল। গড়ে উঠতে লাগল আধুনিক রাশিয়া।

অষ্টাদশ শতকে রাশিয়া ছিল সম্রাট পিটার দ্যা গ্রেটের অধীনে। তার হাত ধরেই মূলত ১৭২১ সালে আধুনিক রাশিয়ান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। তিনি এবং তার পরে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দ্যা গ্রেট মিলে পশ্চিম দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। জাতীয়তাবাদের প্রসার ছাড়াও তাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানো। সম্রাটের উদ্দেশ্য দিনে দিনে বেশ ভালোভাবেই বাস্তবায়িত হতে থাকে। রাশিয়া হয়ে ওঠে একটি শক্তিধর এবং প্রভাবশালী রাষ্ট্র। শক্তিশালী

রাশিয়া তখন প্রবল প্রতাপে দখল করে নেয় ইউক্রেনকে এবং পৌঁছে যায় কার্পেথিয়ান পর্বতমালা পর্যন্ত। এরপর তারা বাল্টিক সাগরের আশেপাশের অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কার্যক্রম চালাতে থাকে। এদিকের অনেক অঞ্চলও তারা পর্যায়ক্রমে দখল করে নেয়। আমরা এখন যে দেশগুলোকে লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়া নামে চিনি- তারা ছিল সেইসব দখলকৃত এলাকায়।

এই এলাকাগুলো মস্কোর চারপাশে একটা শক্তিশালী সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছিল। রাশিয়া এতদিন ধরে যে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা চাইছিল তা পেয়ে গেল। আর এই মস্কোকে ঘিরে রাশিয়ার এই অংশটাই হয়ে উঠলো বিশাল দেশটির প্রাণকেন্দ্র। এই প্রতিরক্ষা বলয়ের শুরু হয়েছিল আর্কটিক অঞ্চল থেকে, এখন তা বাল্টিক অঞ্চল ধরে কাস্পিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এরপর উরাল· পর্বতমালার পাশ দিয়ে আর্কটিকে ফিরে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে বলয়টি। স্থল বা বাল্টিক সাগর কোনো পথেই রাশিয়া আক্রমণ আর সহজ রইল না।

বিংশ শতকের শুরুর দিকে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। সেই কমিউনিস্ট রাশিয়া থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের যাত্রা শুরু হয়। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" নামক স্লোগানের ব্যবহার করে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের মতোই দুর্দমনীয় আগ্রাসী গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে "সোভিয়েত ইউনিয়ন" তথা ইউনিয়ন অব সোভিয়েত স্যোসাল রিপাবলিকস (USSR)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সীমানা আরো বাড়িয়ে নেয়। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বার্লিন, আর্কটিক থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয় সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা। রাশিয়া পরিণত হয় সত্যিকারের এক পরাশক্তিতে। রাশিয়ার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তবে এই পরাশক্তি রাশিয়ার রয়েছে নানারকম অভ্যন্তরীণ সমস্যা। প্রথমত, রাশিয়া আকারে বিশাল, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। অ্যামেরিকা বা চীনের দ্বিগুণ, ভারতের পাঁচগুণ, যুক্তরাজ্যের পঁচিশ গুণ। কিন্তু দেশটির জনসংখ্যা সেই তুলনায় অত্যন্ত কম। মাত্র ১৪৪ মিলিয়ন। যা নাইজেরিয়া বা পাকিস্তানের চেয়েও কম। রাশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলেই ফসল উৎপাদনের জন্য খুব অল্প সময় পাওয়া যায়। এই অল্প সময়ে উৎপাদিত ফসল এত বড়

একটা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষের মধ্যে বিতরণ করাটা মোটেও সহজ কোনো ব্যাপার নয়। এছাড়া রাশিয়ার কিছু অংশ রয়েছে ইউরোপের মধ্যে, আর বাকি অংশ রয়েছে এশিয়ার মধ্যে। এশীয় অংশের রাশিয়া উরাল পর্বতমালা-সংলগ্ন ইউরোপীয় রাশিয়ার মতো এতটা শক্তিশালী নয়। এশিয়ার অংশে কাজাখস্তান, মঙ্গোলিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়ার সাথে সীমানা থাকলেও এই অংশে রাশিয়া তার প্রভাব দেখাতে পারেনি। রাশিয়ার সাথে জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রসীমানা রয়েছে। এই সমুদ্রসীমায় আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে বলতে গেলে ব্যর্থ হয়েছে রাশিয়া।

একটা সময় অ্যামেরিকার সিনেটর সারাহ পলিনের একটা উক্তি নিয়ে বেশ ঠাট্টা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন- "আমাদের আলাস্কা থেকেও রাশিয়া দেখা যায়"। মিডিয়া এটা অতিরঞ্জিত করে বলেছিল এভাবে, "আমি আমার ঘর থেকেও রাশিয়া দেখতে পাই"। পলিনের উক্তি নিয়ে যতই ঠাট্টা করা হোক না কেন, তিনি খুব ভুল কিছু বলেননি! তিনি আসলে বলেছিলেন, "রাশিয়াকে আপনি আলাস্কার একটি দ্বীপ থেকেও দেখতে পারবেন"। তার সেই কথার ব্যাখ্যায় আসা যাক এবার। বেরিং প্রণালিতে রাশিয়ার একটি দ্বীপ আছে। আর এই প্রণালিতে লিটল ডায়োমিড নামে একটি দ্বীপ মার্কিন আলাস্কার মধ্যে পড়েছে। দ্বীপ দুইটার মধ্যে দূরত্ব মাত্র আড়াই মাইল। লিটল ডায়োমিড থেকে রাশিয়ার ঐ দ্বীপটি খালি চোখেই দেখা যায়। তাই আলাস্কা অর্থাৎ অ্যামেরিকা থেকে রাশিয়াকে যে খালি চোখে দেখা যায়, সেই কথাটা মোটেও ভুল নয়!

উরাল পর্বতের যে জায়গাটা থেকে ইউরোপ মহাদেশ শেষ, সেখান থেকেই এশিয়ার শুরু। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তখন এই জায়গাটায় একটু সময় নিয়ে বসতে পারেন। সময়টা বৃথা যাবে না। সামনে তাকালে সারি সারি ফার গাছ পেরিয়ে দৃষ্টি চলে যাবে বহুদূরে, পূর্বে। শীত এলে এই এলাকা তুষারে ছেয়ে যায়। সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত এই সমতলভূমি নেমে গেছে বহু দূরের ইয়েকাতেরিনবার্গ শহরের দিকে। পর্যটকেরা এই জায়গায় এসে একটা মজার কাজ করেন। এক পা এশিয়া আর এক পা ইউরোপে রেখে উপভোগ করেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কিন্তু সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে এই বিশেষ অংশটিতে আসতে আপনাকে পশ্চিম রাশিয়ার প্রায় ১৫০০ মাইল পাড়ি দিতে হবে।

ভাবছেন এটাই যথেষ্ট? তবে জেনে রাখুন, সিনেটর সারাহ পলিনের উল্লেখ করা বেরিং প্রণালির ঐ জায়গাটা অর্থাৎ আলাস্কা থেকে খালি চোখে রাশিয়ার যে দ্বীপ দেখা যায় সেখানে পৌঁছাতে হলে আপনাকে আরো ৪৫০০ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। এটা হলো মাইলের হিসাব। কিলোমিটারে হিসাব করলে এই সংখ্যাটা আরো বড় হবে। রাশিয়া এতটাই বিশাল!

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অল্প কয়েক দিন পরেই আমি উরাল পর্বতের সেই জায়গাটাতে গিয়েছিলাম- যেখানে ইউরোপ মিশেছে এশিয়ার সাথে। আমার সাথে ক্যামেরায় ছিলেন একজন রাশিয়ান। ফটোগ্রাফিতে তিনি একজন ঝানু লোক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা এসে যখন স্তালিনগ্রাদে তাণ্ডব চালাচ্ছিল সেই সময়ের বহু ফুটেজ তার ক্যামেরায় তোলা আছে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তো বলুন, আপনি এশীয় না ইউরোপীয়?”। একটু ভেবে তিনি জবাব দিলেন, “কোনোটাই না, আমি রাশিয়ান”।

ইউরোপীয়রা রাশিয়াকে যা'ই ভাবুক না কেন, বিভিন্ন কারণে রাশিয়া কখনোই এশিয়ার পরাশক্তি হতে পারেনি। রাশিয়ার ৭৫ ভাগ ভূমিই এশিয়ায় অবস্থিত। অথচ এই ৭৫ ভাগ জায়গায় বসবাস করে রাশিয়ার জনসংখ্যার মাত্র ২২ ভাগ মানুষ। সাইবেরিয়াকে বলা যায় রাশিয়ার রত্নভূমি। কারণ, রাশিয়ার খনিজ পদার্থ, তেল এবং গ্যাসের বেশিরভাগই রয়েছে সাইবেরিয়াতে। কিন্তু এই অঞ্চলের পরিবেশ প্রচণ্ডরকম প্রতিকূল! মাসের পর মাস এখানে থাকে তীব্র ঠাণ্ডা। এখানে রয়েছে সুবিশাল এক বনাঞ্চল, এই বনের নাম তৈগা। এই বনাঞ্চল ছাড়া বাকি জায়গার মাটি আবার খুবই রুক্ষ। এছাড়াও রয়েছে মাইলের পর মাইল জলাভূমি। ফলে এই বিশাল সাইবেরিয়া অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য একদমই উপযুক্ত নয়। সাইবেরিয়ার পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে রেলপথ আছে মাত্র দুইটি। একটি হলো ট্রান্স-সাইবেরিয়ান লাইন, অন্যটি বৈকাল-আমুর মেইন লাইন। কিন্তু এই রেলপথ ছাড়া উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার আর তেমন কোনো ভালো বন্দোবস্ত নেই। আধুনিক মঙ্গোলিয়া অথবা চীনকে ক্ষমতা প্রদর্শনের মত লোকবল বা রসদ পরিবহণের রাস্তাঘাটও নেই রাশিয়ার।

বরং সুদূর ভবিষ্যতে কোনো এক সময় চীন এসে উল্টো সাইবেরিয়ার কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণও করতেও পারে। তবে এই নিয়ন্ত্রণটা কিন্তু চীন আক্রমণ

করে করবে না। আসলে রাশিয়ার এই অংশের জন্মহার দিন দিন কমে যাচ্ছে, আর এই অঞ্চলে চাইজিন মাইগ্রেশন দিন দিন বেড়ে চলেছে। পশ্চিমে উরাল পর্বতমালা থেকে ১০০০ মাইল পূর্বের ইয়েনিসেই নদী পর্যন্ত বেশিরভাগ শহরেই আপনি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট দেখতে পাবেন। এমনকি চীন থেকে আরো নানা ধরনের ব্যবসা রাশিয়ার এইসব অঞ্চলে "আসি আসি" করছে! আর পূর্ব দিকের বিরানভূমিতে চীনের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব চালু হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি ছাড়া কম নয়।

রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্র থেকে আপনি যতই দূরে যাবেন, ততই দেখবেন নানারকম মানুষ, নানারকম জাতি। তাদের অনেকেই জাতিগতভাবে রাশিয়ান নয়, মস্কো নিয়ে তাদের বিশেষ আগ্রহ নেই। রাশিয়াও তাদেরকে বিশ্বাস করে না। এই কারণে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে রাশিয়ায় এখনো সোভিয়েত আমলের মতোই বাড়াবাড়ি রকম তোড়জোড় রয়েছে। সোভিয়েত আমলে রাশিয়া একধরনের ঔপনিবেশিক শক্তির মতোই আচরণ করেছে। রাশিয়ান ফেডারেশনের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তারা ছিল মরিয়া। কেন্দ্র থেকে দূরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছে রাশিয়ানরা। এরকম জায়গার মধ্যে রয়েছে চেচনিয়া, দাগেস্তান এবং ককেশাস। এইসব অঞ্চলের জনগণ রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে তখনও একাত্মতা বোধ করত না, এখনো করে না। তবুও তাদেরকে সোভিয়েত বশ্যতা মানতে বাধ্য করা হয়।

নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের আগে দেশটির অর্থনীতি ধ্বসে পড়তে শুরু করে। আর পড়বে নাই বা কেন! সরকারের মনোযোগ তখন জনগণের কল্যাণের চাইতে আফগান যুদ্ধের দিকেই বেশি ছিল। এই যুদ্ধের পরাজয় সোভিয়েত অর্থনীতিকে একদম ডুবিয়ে দেয়। রিজার্ভে সঞ্চিত অর্থের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করে ফেলার কারণে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক মন্দার। এই অর্থনৈতিক মন্দাই সোভিয়েত রাশিয়াকে ভাঙনের পথে নিয়ে যায়। সোভিয়েত রাশিয়া ছোট হতে হতে প্রাক-সমাজতন্ত্র যুগের রাশিয়ার আয়তনে পৌঁছে যায়। তখন রাশিয়ার সাথে ইউরোপের সীমানায় ছিল এস্তোনিয়া, বেলারুশ, লাটভিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া আর আজারবাইজান।

১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারের সমর্থনে দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সোভিয়েত রাশিয়া। সরকারি বাহিনীকে রাশিয়া তখন সরাসরি সহায়তা করে। কমিউনিস্ট-বিরোধী মুসলিম গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা টিকিয়ে রাখছিল কমিউনিস্ট সরকারকে। তবে এই সহায়তা আফগানিস্থানের সাধারণ জনগণ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। সাধারণ আফগান জনগণের মনে মার্ক্স-লেনিনের মহান আদর্শ কখনো জায়গা করে নিতে পারেনি। মস্কো সবসময় চাইত অন্য কোনো শক্তি এই অঞ্চলে প্রভাব ফেলার আগেই আফগান অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে।

উগ্র জাতীয়তাবাদী রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির ঝিরিনোভস্কি স্বপ্ন দেখতেন ভারত মহাসাগরের উষ্ণ জলে সোভিয়েত আর্মি তাদের বুট পরিষ্কার করবে। তার দেখানো এই স্বপ্ন পূরণের পথেই চলেছিল রাশিয়া। ঝিরিনোভস্কি কেন এই স্বপ্ন দেখতেন? আসলে রাশিয়া সবসময় একটি উষ্ণ জলের বিশাল উৎস চাইত, যা শীতকালে জমে যাবে না। রাশিয়ার বন্দরগুলো ব্যবসার জন্য ভালো নয়। আর্কটিক অঞ্চলের মারমানস্ক বন্দরের জল বছরের বেশিরভাগ সময়ই জমে বরফ হয়ে থাকে। রাশিয়ার বৃহত্তম বন্দর ভ্লাদিভোস্টক বছরের চারমাসই থাকে বরফে ঢাকা। আর এই বন্দর রয়েছে জাপান সাগরে। জাপান সাগর আবার জাপানের নিয়ন্ত্রণে। রাশিয়ার মতো একটি পরাশক্তি এরকম আবদ্ধ অবস্থা মানতে চাইবে কেন? আর ব্যবসার জন্য এরকম অবস্থা মোটেও আদর্শ নয়। নৌপথে পরিবহনের খরচ সবসময়ই অনেক কম। আর এই সুবিধাটা না পাওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যিকারের বৈশ্বিক শক্তি হয়ে উঠতে পারছিল না। আফগানিস্তান দখল করলে তারা সেই সুবিধাটাই পেত। সেই সাথে বাণিজ্য প্রসারের জন্য ২৯টি নতুন পথও উন্মুক্ত হয়ে যেত।

রাশিয়ার আসলে এমন একটা সমুদ্র বন্দর দরকার যার সাথে মহাসাগরগুলোর সরাসরি সংযোগ রয়েছে এবং যে বন্দরের পানি ঠাণ্ডায় জমে যায় না। এই ধরনের একটা সমুদ্র বন্দর না থাকা রাশিয়ার জন্য বিশাল একটা প্রতিবন্ধকতা। কৌশলগত দিক থেকে এই বন্দরের বিষয়টাও উত্তর ইউরোপের সমতলভূমির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়ার নানারকম ভৌগোলিক প্রতিকূলতা থাকলেও দেশটিতে রয়েছে নানা রকম অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ, তেল এবং

গ্যাস। এই কারণে, আর যাই হোক না কেন দেশটি কখনোই দুর্বল ছিল না। নদী এবং সমুদ্রপথে এসব সম্পদের বাণিজ্য ঠিকঠাক করতে পারলে রাশিয়ার সবসময় শক্তিশালী একটি দেশ হয়েই টিকে থাকবে। কিন্তু তার জন্য চাই সুবিধাজনক বন্দর। রাশিয়ার মূল দুর্বলতা হলো উষ্ণ পানির বন্দরের অভাব। এই ব্যাপারটিকে তাদের "অ্যাকিলিস হিল" বলা যায়। আর এজন্য ১৭২৫ সালে পিটার দ্যা গ্রেট তার উত্তরসূরিদের উপদেশ দিয়েছিলেন কনস্টান্টিপোল ও ভারতের যত কাছাকাছি সম্ভব আধিপত্য বিস্তার করতে। যে দেশ এই জায়গাগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে, পুরো পৃথিবী তার! তুরস্ক থেকে শুরু করে পারস্যের উপসাগর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে ভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি।

সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পর পনেরটি দেশ গঠিত হয়। এ যেন ভৌগোলিক বাস্তবতার এক মধুর প্রতিশোধ! নতুন ম্যাপটি আগের চেয়ে যৌক্তিক। পর্বত, নদী, হ্রদ আর সাগরের মাধ্যমে দেশগুলো সঠিকভাবে বিভক্ত হয়। সীমানাও ঠিকঠাক নির্ধারিত ছিল। ভাষাগত আর সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ একে অপরের থেকে আলাদা। তবে 'স্তান' অঞ্চলগুলো, যেমন- উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান আবার এমন নয়। স্তালিন এই অঞ্চলগুলোর সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৌশলী আচরণ করেছিলেন। তিনি এমনভাবে এসব অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন, যেন প্রতিটি দেশে মধ্যেই সংখ্যালঘু হিসেবে পাশের দেশের প্রচুর সংখ্যক মানুষ থাকে। এভাবে বিভেদ জিইয়ে রেখে তিনি অঞ্চলগুলোকে দুর্বল এবং অস্থিতিশীল করে রাখতে চেয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়াকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। তাদেরকে যেতে হয়েছে নানারকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

দেশটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চল অধিগ্রহণ করেছে, আবার ভাঙনের মুখেও পড়েছে। সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রের অংশ ছিল যে দেশগুলো, তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব এখনো কমেনি। ওয়ারশ চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে দেশগুলোর কোনোটা হয়ে গেছে পশ্চিমাপন্থী, আবার কোনোটা হয়ছে রাশিয়াপন্থী। তবে কিছু কিছু দেশ নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান এবং তুর্কমেনিস্তান। পশ্চিমা বিশ্ব

অথবা রাশিয়ার সাথে যোগ না দেওয়ার পেছনে শক্ত কারণও আছে তাদের। এই দেশগুলো নিজেদের খনিজ সম্পদ ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করছে। অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ফেলেছে। রাশিয়াপন্থী দেশগুলো হচ্ছে কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, বেলারুশ এবং আর্মেনিয়া। এই দেশগুলোর অর্থনীতি নানাভাবে রাশিয়ার কাছে বাঁধা পড়ে আছে। অনেকটা পূর্ব ইউক্রেনের মতো পরিস্থিতি। রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার সূত্র ধরেই পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়াপন্থী বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। 'স্তান' অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশ হলো কাজাখস্তান। কূটনৈতিকভাবে তারা রাশিয়ার প্রতি বেশ ভালোভাবেই নির্ভরশীল। কাজাখস্তানে অল্প কিছু সংখ্যক রাশিয়ান বাস করে। এই সংখ্যালঘু রাশিয়ান জনগোষ্ঠীর কারণেও রাশিয়ার সাথে তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। রাশিয়াপন্থী এই পাঁচটি দেশের মধ্যে কাজাখস্তান এবং বেলারুশ আবার যোগ দিয়েছে ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নে। একে বলতে পারেন গরিবের ইউরোপীয় ইউনিয়ন! এই পাঁচটি দেশ আবার রাশিয়ার সাথে মিলে Collective Security Treaty Organization (CSTO) নামে একটি সামরিক জোটও তৈরি করেছে। এই বন্ধনকে অবশ্য সেই সোনালি সময়ের ওয়ারশ চুক্তির মতো এত পোক্ত বলা যায় না! তবে, এই সুযোগে কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং আর্মেনিয়াতে সৈন্য মোতায়েন করতে পারছে রাশিয়া।

এবার বলা যাক পশ্চিমাপন্থী দেশগুলোর কথা। এই দেশগুলো একসময় ওয়ারশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু এখন তারা ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে। এই দেশগুলো হলো পোল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, চেক রিপাবলিক, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া ও রোমানিয়া। এর মধ্যে কয়েকটি দেশ সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রদেশ হিসেবে ছিল। সোভিয়েত শাসনকালে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে। এসব দেশের পাশাপাশি জর্জিয়া, রোমানিয়া, ইউক্রেন এবং মালদোভাও ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চায়। কিন্তু রাশিয়ার সাথে 'বন্ধুত্ব' তাদেরকে আটকে রেখেছে। রাশিয়া তাদের মিত্র দেশের সাথে 'বন্ধুত্বের' নিদর্শন হিসেবে তাদের জমিনে রাশিয়ান সৈন্যও রেখেছে । ফলে, এই দেশগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি ন্যাটোতে যোগ

দিলেই যুদ্ধ বেধে যাবে। ২০১৩ সালে ইউক্রেনের এই ধরনের ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তৈরি হয়েছিল ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা। মস্কো তখন চরম অবস্থান নিয়েছিল। অতঃপর কিয়েভে রাশিয়াপন্থী সরকার নির্বাচিত হলে মস্কো আশ্বস্ত হয়। ফলে ইউক্রেন আবার উত্তর ইউরোপের সমভূমিতে রাশিয়ার বাফার জোন হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকে। নিরপেক্ষ ইউক্রেন প্রতিজ্ঞা করে যে তারা পশ্চিমা জোটে যোগ দেবে না। ইউক্রেন নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকুক, তা নিয়ে রাশিয়ার আপত্তি নেই। রাশিয়াকে ক্রিমিয়ার সেভাস্তোপোল বন্দরের উষ্ণ জল ব্যবহার করতে দিলেই হলো।

ইউক্রেন যদি ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়, রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের ওপর থেকে অধিকার হারিয়ে ফেলবে। আর, ন্যাটো এসে বসবে রাশিয়ার নাকের ডগায়! রাশিয়ার পক্ষে কি তা সহ্য করা সম্ভব? ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ দুই পক্ষের সাথেই মিত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি পশ্চিমের সাথে সদ্ভাব রাখতেন, আবার মস্কোকেও সম্মান জানাতেন। পুতিন তাই তাকে সহ্য করে গেছেন। কিন্তু ইয়ানুকোভিচ যখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটা বড় ব্যবসায়িক চুক্তির দিকে এগুতে থাকলেন, তখন নড়েচড়ে বসলেন পুতিন! রাশিয়ান পররাষ্ট্রনীতি বিশারদরা জানেন যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে কোনো চুক্তি করা মানে ন্যাটোর সদস্যপদ পাওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া। এটা রাশিয়ার জন্য একটা বিপদ সংকেত। পুতিন তখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে এমন একটা প্রস্তাব দিলেন, যা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তি নাকচ করতে তাকে বাধ্য করলেন এবং পরিবর্তে চুক্তি করালেন মস্কোর সাথে। ইউক্রেনের জনগণ এটা মেনে নেয়নি। ইউক্রেনে ইয়ানোকুভিচের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। খুব জলদিই ক্ষমতাচ্যুত হন তিনি।

সে-সময় যা হয়েছিল একটু বিস্তারিত বলা যাক। ওই সময়টাতে মস্কোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে ইউক্রেনের বিরোধী দলগুলোকে মদদ যোগায় যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। বক্সিং চ্যাম্পিয়ন থেকে নেতায় পরিণত হওয়া ভিতালি কিশকোকে দেখে তাদের মনে হয়, একে দিয়েই তাদের কাজ হবে। কিশকোর দলের মতো সরকারবিরোধী গনতন্ত্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে প্রশিক্ষণ এবং অর্থের

যোগান দিতে থাকে পশ্চিমা বিশ্ব। ইউক্রেনকে অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিকভাবে পশ্চিমাপন্থী করে তুলতে শুরু করে। আর এর ফলে কিয়েভের রাজপথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় তুমুল সরকারবিরোধী আন্দোলন। প্রতিবাদ সমাবেশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও। একদিকে ইউক্রেনের পূর্ব অঞ্চলের জনগণ রাস্তায় নামে সরকার ও প্রেসিডেন্টকে সমর্থন দিতে। অন্যদিকে লিভিভের মতো পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলোতে আবার রাশিয়ার প্রভাব নস্যাৎ করার কার্যক্রম জোরদার করা হয়। লিভিভ শহরটি একসময় পোল্যান্ডের অংশ ছিল।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে গিয়ে লিভিভ এবং অন্যান্য অঞ্চল ইয়ানুকোভিচ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আর রইল না। ২২শে ফেব্রুয়ারি ব্যাপক সংঘর্ষ হলো কিয়েভের রাস্তায়, প্রাণ হারাল অনেক মানুষ। প্রেসিডেন্ট প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। রাশিয়াবিরোধী নানা মতাদর্শের কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক গোষ্ঠী একজোট হয়ে ক্ষমতা দখল করলো। এদের মধ্যে কিছু দল ছিল পশ্চিমাপন্থী। কেউ কেউ আবার স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের। ফলে ক্রিমিয়া অধিগ্রহণ করে নেওয়া ছাড়া পুতিনের হাতে তখন আর তেমন কোনো বিকল্প রইল না। ক্রিমিয়ায় অনেক রুশভাষী ইউক্রেনিয়ান বাস করে। কিন্তু শুধু এজন্যই যে পুতিন ক্রিমিয়া অধিগ্রহণ করলেন, ব্যাপারটি তেমন নয়। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: ক্রিমিয়াতেই রয়েছে সেভাস্তোপোল বন্দর।

সেভাস্তোপোল বন্দর রাশিয়ার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বলতে গেলে এটাই রাশিয়ার একমাত্র উষ্ণ পানির বন্দর। এজন্য রাশিয়া বরাবরই ক্রিমিয়ায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইত। কিন্তু, ১৯৩৬ সালের মন্ট্রো কনভেনশনের চুক্তি অনুযায়ী এই অঞ্চলে রাশিয়ার যাতায়াত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ওই চুক্তি অনুযায়ী কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে যেতে পারত না রাশিয়া। এই চুক্তির সুযোগে তুরস্ক বসফরাস প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তুরস্ক আবার এখন ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে। রাশিয়ার জাহাজ এই বসফরাস প্রণালি ধরে এগুতে পারত বটে, তবে সীমিত সংখ্যায়। আর এই অঞ্চলে কোনো সংঘাত চললে তখন তো জাহাজ চলাচলের অনুমতিই মিলত না! তার থেকেও বড়

কথা, রাশিয়ার জাহাজ যদি ভূমধ্যসাগরে ঢুকতে চায়, তবে তাকে বসফরাস প্রণালি অতিক্রম করার পর ইজিয়ান সাগরও পার হতে হবে। আর তার পরে ভূমধ্যসাগরে দুইটি মাত্র পথ। আটলান্টিকে যেতে হলে জিব্রাল্টার প্রণালি পার হতে হবে। আর ভারত মহাসাগরে যেতে চাইলে পার হতে হবে সুয়েজ খাল। এই দুই জায়গা পার হওয়াও অনুমতি-সাপেক্ষ বিষয়।

ভূমধ্যসাগরের সিরিয়া উপকূলে টারটাস নামক জায়গায় রাশিয়ার একটি ছোট্ট নৌঘাঁটি ছিল। ২০১১ সালে পতনের মুখে থাকা সিরিয়ান সরকারকে রাশিয়া সমর্থন দেয়। এই সমর্থন দেওয়ার পেছনে এই নৌঘাঁটি একটা বড় কারণ। কিন্তু এই নৌঘাঁটিটা ছোট। খুব বেশি জাহাজ, সৈন্য বা সরঞ্জাম না থাকায় তাদের পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব হয়নি। সেখানে অস্ত্রের মজুদও ছিল কম।

রাশিয়ার আরেকটা কৌশলগত সমস্যা আছে। স্কাগারাক প্রণালির কারণে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাশিয়ান নৌবাহিনী বাল্টিক সাগর থেকে বের হতে পারে না। এই প্রণালি দিয়ে বাল্টিক সাগর সংযুক্ত হয়েছে উত্তর সাগরের সাথে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রণালিটি ন্যাটোর সদস্য ডেনমার্ক এবং নরওয়ের নিয়ন্ত্রণে। এতকিছুর তোয়াক্কা না করে যদি রাশিয়ান নৌবাহিনী উত্তর সাগরে বেরিয়েই পড়ে আটলান্টিকে তাদেরকে ঢুকতে হবে "গিউক গ্যাপ" (GIUK Gap) অঞ্চল দিয়ে। উত্তর সাগর এবং নরওয়েজিয়ান সাগর থেকে আটলান্টিককে ঢোকার একমাত্র পথ এই চ্যানেলটি। এর অবস্থান গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড আর যুক্তরাজ্যের মধ্যবর্তী এলাকায়, এই তিনটি দেশের নামের অদ্যাংশ নিয়ে চ্যানেলটির নামকরণ। এই জায়গাটা নিয়ে আমি পশ্চিম ইউরোপ অধ্যায়ে বিস্তারিত লিখেছি।

ক্রিমিয়া দখল করার পর রাশিয়া আর সময়ক্ষেপণ করল না। সেভাস্তোপোল বন্দরে তার গোটা কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবহর জড় করতে লাগল। কাছাকাছি নভোরোসিস্ক শহরে একটা নতুন নৌঘাঁটি তৈরির করে ফেলল। অথচ নভোরোসিস্ক শহরের এই উপকূলে গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির উপযুক্ত প্রাকৃতিক সুবিধা নেই। কিন্তু প্রয়োজন কোনো বাধা মানে না। কৃত্রিমভাবেই তৈরি করা হলো গভীর সমুদ্র বন্দর। এই অঞ্চলটা ব্যবহার করায় রাশিয়া

বাড়তি কিছু জায়গা পেল। ওই নৌবহরে তারা ৮০টি নতুন জাহাজ এবং কয়েকটা সাবমেরিন যোগ করল। এতকিছুর পরেও কৃষ্ণসাগর থেকে এক ধাক্কায় নৌবহর নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের হয়নি। তবে, তাদের এই নৌবহর আকারে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এসব দেখে যুক্তরাষ্ট্রও চুপ করে বসে নেই। তারা তাদের ন্যাটো-মিত্র রোমানিয়াকে বলল কৃষ্ণসাগরে বহর পাঠাতে। অপরদিকে বসফরাস প্রণালিতে রাশিয়াকে আটকানোর ভার থাকলো আরেক ন্যাটো-মিত্র তুরস্কের হাতে।

এই ক্রিমিয়া প্রায় দুই শতাব্দী ধরে রাশিয়ার অংশ ছিল। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের আওতায় দিয়ে দেন। ইউক্রেন আবার তখন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ। ক্রুশ্চেভ হয়তো ভেবেছিলেন ইউক্রেন আজীবন রাশিয়ার অনুগত থাকবে। কিন্তু তা আর হলো কই! ইউক্রেন এখন আর রাশিয়ার অংশ তো নয়ই, এমনকি তারা রাশিয়াপন্থীও না! এই অবস্থা বদলাতে চেয়েছিলেন পুতিন। তিনি জানতেন, এছাড়া রাশিয়ার উপায় নেই। পশ্চিমা কূটনীতিবিদরা কি তা জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। না জানা থাকলে বলতে হবে, কূটনীতিবিদ্যার প্রথম পাঠই তারা ঠিকঠাক পড়েননি। অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে বৃহৎ শক্তি গায়ের জোর খাটাবেই- এটা ভূ-রাজনীতির এক আদি নিয়ম। ইউক্রেনকে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যুক্ত করতে গেলে যে তাদেরকে ক্রিমিয়া অঞ্চলটা হারাতে হতে পারে, এই কি তারা বুঝেননি? এটা অবশ্যই তারা জানতেন।

সাদা চোখে দেখলে মনে হবে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ এত কিছু করেছে শুধু ইউক্রেনকে গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় নিয়ে আসার জন্য। মনে হবে, তারা চেয়েছে ইউক্রেনও পশ্চিমা বিশ্বের উদারনৈতিক সংগঠন, উদারনৈতিক নিয়ম-কানুনের সুবিধা ভোগ করুক। এই ব্যাপারে রাশিয়ার তো আসলে কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু এধরনের ভাবনার সময় ভুলে যাওয়া হয় যে, এই একবিংশ শতকেও ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এটাও মাথায় রাখা হয় না যে, পশ্চিমা নিয়মকানুন মানার কোনো দায় রাশিয়ার নেই।

বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ঐ সময় ইউক্রেনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বোকার মত কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন, বিভিন্ন অঞ্চলের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয়

ভাষা হিসেবে রাশিয়ান ভাষার যে দাপ্তরিক মর্যাদা ছিল, তা বাতিল করা। এসব অঞ্চলে প্রচুর রুশ ভাষাভাষীর বাস, আর স্বাভাবিকভাবেই তারা রাশিয়াপন্থী। আর এসব অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে মহাগুরুত্বপূর্ণ ক্রিমিয়াও। ফলে, একটা সংকট দানা বাঁধতে শুরু করল। আর পুতিন সাথে সাথে সুযোগটা কাজে লাগালেন। ইউক্রেনে বাস করা রাশিয়ানদের রক্ষা করতে হবে- এই মর্মে প্রোপাগান্ডা শুরু করলেন ব্যাপকভাবে।

ক্রেমলিনের একটা আইন অনুযায়ী সকল জাতিগত রাশিয়ানকে রক্ষা করা তাদের রাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় একটি কর্তব্য। কিন্তু, সোভিয়েত আমলে তৈরি আইনের এই ধারাটি যথেষ্ট অস্পষ্ট। জাতিগত রাশিয়ান কারা এবং কখন তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে যেতে হবে- তা নির্ধারণ করবে কে? সোভিয়েত আমলে প্রতিটি সংকটের সময় নতুন করে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এক সময় বলা হলো যারা 'রাশিয়ান' ভাষায় কথা বলে তাদের সবাইকেই জাতিগতভাবে রাশিয়ান বলে ধরে নিতে হবে। কিছুদিন পরে এর সাথে আবার নতুন নিয়ম যুক্ত হলো। এই নিয়ম অনুযায়ী যাদের পিতামহ রাশিয়ায় বাস করে এবং রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে তারাও রাশিয়ার নাগরিকত্ব নিতে পারবে। যে কোনো সংকটের সময় তারা রাশিয়ান নাগরিকত্ব নিয়ে নেবে এবং রাশিয়াকে সমর্থন করবে- এটাই আশা। ক্রিমিয়ার জনগণের ৬০ শতাংশ জাতিগতভাবে রাশিয়ান। নিজেদের আইনের এই সুযোগটা পুতিন একদম লুফে নিলেন। ক্রিমিয়ায় বাস করা রাশিয়ানদের রক্ষার অজুহাতে সেখানে ঢুকে পড়ল ক্রেমলিন।

কিয়েভের নতুন সরকারবিরোধী আন্দোলনের পালে হাওয়া দিচ্ছিলেন পুতিন নিজেই। আন্দোলন এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে তা দমন করতে সামরিক বাহিনী পাঠায় সরকার। ফলে একসময় তা সামরিক বাহিনী বনাম জাতিগত রাশিয়ান- তীব্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। রাস্তায় নেমে আসা মানুষদের রক্ষা করার ছুতোয় নৌঘাঁটি থেকে বের হয়ে আসে রুশ সৈন্য। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী তখন পড়ে যায় মহাবিপদে। একদিকে রাস্তার মানুষ, অন্যদিকে পুতিনের সেনা, তারা কয়দিক আর সামলাবে! ক্রিমিয়া ছেড়ে পিছিয়ে যায় তারা। এর ফলে ক্রিমিয়া কার্যত আবারও রাশিয়ার অংশ হয়ে যায়।

পুতিন কেন এরকম যুদ্ধাংদেহী মনোভাব দেখালেন তা নিয়ে সমালোচনা করাই যায়। এটাও বলা যায় যে ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তার নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ঈশ্বর রাশিয়ার ভৌগোলিক পরিস্থিতি এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, অন্য কিছু ভাবার মতো সুযোগ পুতিনের নেই। ক্রিমিয়াকে হারালে উষ্ণ পানির আরেকটা বন্দর কোথায় পাবে রাশিয়া? তাই যে কোনো মূল্যে ক্রিমিয়াকে দখলে রাখবে তারা।

ইউক্রেনকে তখন কেউ সাহায্য করেনি। ক্রিমিয়া অঞ্চলটা আয়তনে "বেলজিয়াম" বা যুক্তরাষ্ট্রের "মেরিল্যান্ড" রাজ্যের সমান। ইউক্রেনের হাত থেকে এত বড় একটা অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে গেলেও কোনো পশ্চিমা বন্ধু তখন এগিয়ে আসেনি। ইউক্রেন বা তার আশেপাশের দেশগুলো জানতো- ন্যাটোর সদস্য না হতে পারলে রাশিয়ার এসব খবরদারি সহ্য করতে হবে। ক্রিমিয়া হাতছাড়া হওয়ার অর্থ রাশিয়ার অস্তিত্বের জন্যই ঝুঁকি তৈরি হওয়া। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের কাছে ক্রিমিয়ার তেমন গুরুত্ব নেই।

তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একদম হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। তারা রাশিয়ার ওপর সামান্য কিছু নিষেধাজ্ঞা দেয়। নিষেধাজ্ঞাগুলো খুব কঠোর না হওয়ার কারণ হচ্ছে, জার্মানিসহ বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশ আবার রাশিয়ার পেট্রোলিয়াম বা গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। শীতের সময় ঘর গরম রাখতে রাশিয়ার সাহায্য তাদের দরকার। এদিকে গ্যাস পরিবহনের পাইপলাইন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এই পাইপলাইনগুলো চাইলেই নিজের ইচ্ছেমতো চালু বা বন্ধ করতে পারে ক্রেমলিন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে জ্বালানি শক্তির ব্যবহার ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। রাশিয়াও তাদের কর্মকাণ্ডে ন্যায্যতা দিতে জাতিগত রাশিয়ানদের রক্ষা করার অজুহাত বারবার দেখিয়ে যাবে।

পুতিন ২০১৪ সালের এক ভাষণে নভোরোশিয়া বা নতুন রাশিয়া গঠনের কথাও উল্লেখ করে বসেন। ইউক্রেনের দক্ষিণ এবং পূর্ব অংশকে ধরেই তিনি এই নতুন রাশিয়ার কথা বলেন। ১৮ শতকে অটোমান সাম্রাজ্য থেকে এই অংশটি ছিনিয়ে নেন ক্যাথরিন দ্যা গ্রেট। তার নেতৃত্বেই ঐ অঞ্চলে রুশভাষীরা

বসবাস করতে শুরু করে এবং রাশিয়ান ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পুতিনের এই "নতুন রাশিয়া" গঠনের ঘোষণা শুনে পশ্চিমা পর্যবেক্ষকরা একটু নড়েচড়ে বসলেন । সোভিয়েত আমলে ১৯২২ সালে তৈরি হওয়া সমাজতান্ত্রিক ইউক্রেন রাষ্ট্রকেই এতদিন 'নভোরোশিয়া' বলা হতো। কিন্তু পুতিন হুংকার ছুড়লেন, "কেন এমন বলা হয়? ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন।" এছাড়াও ইউক্রেনের খারকিভ, লুহানস্ক, দোনেতস্ক, খেরসন, মাইকোলাইভ এবং ওদেসা অঞ্চলগুলোর তালিকা দিয়ে তিনি বললেন, "বিভিন্ন কারণে এসব অঞ্চল আর রাশিয়ার সীমানার মধ্যে নেই। কিন্তু মানুষগুলো ঠিকই রাশিয়ান রয়ে গেছে"। সাবেক সোভিয়েত অঞ্চলের ভেতরে, কিন্তু বর্তমান রাশিয়ার সীমানার বাইরে বসবাস করেন- কয়েক মিলিয়ন রাশিয়ান।

ক্রিমিয়া দখলের পর ইউক্রেনের অন্যান্য অংশে বাস করা রাশিয়াপন্থীদের উসকানি দিতে শুরু করলেন পুতিন। বিশেষ করে লুহানস্ক এবং দোনেতস্কের মতো পূর্ব দিকের শিল্পাঞ্চলগুলোতে। চাইলে পূর্ব দিকের এই অঞ্চলগুলো থেকে নিপার নদীর ধার দিয়ে পশ্চিমের কিয়েভ পর্যন্তই রাশিয়া খুব সহজেই সৈন্য পাঠাতে পারত। কিন্তু এতে অনেক ঝামেলা, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে, ব্যয়ও হবে অনেক। এর চেয়ে পূর্বাঞ্চলীয় সীমানায় অস্থিরতা তৈরি করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিয়েভ তখন টের পাবে- গ্যাসের যোগান আসলে কারা নিয়ন্ত্রণ করে। ইউক্রেন তখন আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোর সাথে অত দহরম-মহরম করতে পারবে না।

পূর্ব ইউক্রেনের বিদ্রোহকে আড়ালে থেকে উসকে দেওয়া এবং অস্থিরতা তৈরির এই কৌশল খুব সহজ এবং ঝামেলাবিহীন। এর বাইরে আরো বড় একটা সুবিধাও আছে। রাশিয়াই যে আসলে অস্থিরতা তৈরিতে মদদ দিচ্ছে, এর কোনো প্রমাণ নেই। জাতিসংঘে বা ন্যাটো অধিবেশনে তারা সহজেই এই বিষয়টা অস্বীকার করতে পারত। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলা খুব সহজ। যদি প্রতিপক্ষের হাতে সরাসরি কোনো প্রমাণ না থাকে, স্রেফ চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বীকার করে যেতে হবে। তাছাড়া শক্ত প্রমাণ কেউই আসলে চায়নি। কারণ, প্রমাণ পেলেই তো এ ব্যাপারে কিছু

একটা করতে হবে। পশ্চিমের অনেক কূটনীতিবিদ এবং নেতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অনেকেই বললেন, "ভাগ্যিস ওরা ন্যাটোর সদস্য না! না হলে আমাদেরও নাক গলাতে হত"।

ক্রিমিয়া অধিগ্রহণের মাধ্যমে আরেকটা বার্তা দিল রাশিয়া। তা হলো, বিভিন্ন দেশের সাথে সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলগুলোকে নিজেদের কবজার মধ্যে রাখার জন্য প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত তারা। এই গোটা পরিকল্পনায় ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, পশ্চিমা বিশ্ব তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। ফলে খুব সহজেই ক্রিমিয়া কবজা করে নেওয়া যাবে। পুতিন একটা জুয়া খেলেছেন, এবং সেই জুয়াতে তিনি জিতে গেছেন। ক্রিমিয়া অঞ্চল রাশিয়ার সীমান্তের খুবই কাছাকাছি। তার ওপর রাশিয়া সহজেই কৃষ্ণ সাগর এবং আজভ সাগর দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম বা রসদ পাঠাতে পারবে। অন্যদিকে, এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ রাশিয়াপন্থী হওয়ায় ভেতর থেকেও প্রচুর সাহায্য পাবে। তাই ক্রিমিয়া আপাতত সুরক্ষিত।

তবে ইউক্রেন নিয়ে পুতিনের পরিকল্পনা ক্রিমিয়া দখল করেই শেষ হয়নি। তেমনি প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ নিয়েও তার পরিকল্পনা আছে। পরিস্থিতি খুব বেশি সঙিন না হলে রাশিয়া বাল্টিক সাগরের দিকে সামরিক বাহিনী পাঠাবে না। কিন্তু জর্জিয়াতে ঠিকই সামরিক শক্তি পাঠিয়ে অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, রাশিয়াকে এরকম হয়তো আরো করতে হবে।

২০০৮ সালে জর্জিয়ার সাথে যুদ্ধে রাশিয়া ন্যাটোকে একটা বার্তা দিয়ে রেখেছিল- "আর এগিয়ে এসো না"। ২০১৪ সালে তো ন্যাটোও পাল্টা জবাবে বলল, "এর বেশি পশ্চিমে আর এসো না"। বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলোর ওপর দিয়ে ন্যাটোর যুদ্ধবিমান উড়তে লাগল। প্রতিরক্ষা আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ঘনঘন মালদোভা আর জর্জিয়া সফর করে জানিয়ে দিলেন "ন্যাটো আছে তোমাদের সাথে।" অ্যামেরিকা বাল্টিক সাগরে পোল্যান্ডের সাথে যৌথ মহড়া ঘোষণা করলো। চেষ্টা করা হলো বেশি শক্তিশালী জাহাজগুলো রাশিয়ান সমুদ্রসীমার যতটা কাছাকাছি সম্ভব রাখার।

কিছু আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সে সময় ঠাট্টা করছিলেন ন্যাটোর কার্যক্রম নিয়ে। তারা বললেন, রয়াল এয়ারফোর্সের ছয়টি ইউরোফাইটার টাইফুন

রাশিয়ান বাহিনীর কী এমন করতে পারবে! কিন্তু বুঝতে হবে, এসব আপাত-বালখিল্যতা আসলে এক ধরনের কূটনৈতিক জবাব। আর তা হচ্ছে- ন্যাটো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ন্যাটোভুক্ত কোনো দেশের সাথে এমন হলে তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হতো। কারণ তা না করলে ন্যাটো চুক্তিই তো অশ্বডিম্বে পরিণত হবে। এমনিতেই সবকিছু নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে বেশ বিরক্ত। তারা চাইছে নতুন ধরনের একটা পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে যা তাদেরকে আগের মত "বেঁধে" রাখবে না। কিন্তু ন্যাটো আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষ্ক্রিয়তায় তা হয়ে উঠছে না। ইউরোভুক্ত দেশগুলোর সামান্য ডিফেন্স বাজেট দেখতে দেখতে তাদের অসন্তুষ্টি ক্রমেই বাড়ছে।

এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া আর লাটভিয়া- এই তিনটি বাল্টিক দেশ নিয়ে ন্যাটোর অবস্থান স্পষ্ট। এদের ওপর কোনো আক্রমণ হওয়া মানে ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন চুক্তিনামার আর্টিকেল ৫ ভঙ্গ করা। যেখানে বলা হয়েছে "ইউরোপ বা উত্তর অ্যামেরিকায় ন্যাটো জোটভুক্ত কোনো দেশের ওপর আক্রমণ আসলে, তা সব সদস্যদেশের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হবে"। ন্যাটো তখন সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে। ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর এই ধারাটি দেখিয়েই আফগানিস্তানে ন্যাটোর যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা হয়।

পুতিনের আচরণে মনে হচ্ছে ইতিহাস থেকে তিনি যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছেন। সোভিয়েত আমলে আগ্রাসীভাবে এগিয়ে যাওয়া বিশাল রাশিয়া ঠিক একই গতিতে ভেঙে পড়েছিল। তাই পুতিন এবার আরেকটু কৌশলী হলেন। তিনি বাল্টিক দেশ তিনটিতে সৈন্য পাঠালেন না। তাতে অনেক বেশি এলাকা নিয়ে সামরিক পরিকল্পনা করতে হবে। তাছাড়া ন্যাটো জোর করেই তাদের বক্তব্য পুতিনকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ২০১৬ সালে এসে পুতিনও বুঝিয়ে দেওয়ার মত জবাব দিতে চাইলেন। নিজেদের সকল সামরিক বা নৌ সমর-পরিকল্পনায় নতুন শব্দ যুক্ত করলেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লিখিতভাবে "বহিঃশত্রু" হিসেবে উল্লেখ করলো রাশিয়া।

তাছাড়া লাটভিয়া বা এস্তোনিয়ায় প্রভাব খাটানোর জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনও নেই। তবে তা করতে চাইলে অজুহাত প্রস্তুত রয়েছে রাশিয়ার। শুধু বলতে হবে, "এসব দেশে বাস করা রাশিয়ানরা বঞ্চনার শিকার

হচ্ছে"। এই দুই দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক চতুর্থাংশ রাশিয়ান। আর লিথুয়ানিয়ায় ৫.৮ শতাংশ রাশিয়ান। বঞ্চনার কথা একেবারে মিথ্যাও না। এস্তোনিয়ায় বাস করা রাশিয়ানরা নানাভাবে বঞ্চনার শিকার হয়। তাদের অনেকের নাগরিকত্বও নেই। তার মানে কিন্তু আবার এই নয় যে তারা রাশিয়ার সাথে যুক্ত হতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তবে, এটা পুতিনের জন্য একটা ভালো সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। বাল্টিক অঞ্চলের রুশভাষী বাসিন্দাদের উসকানি দিয়ে বড় ঝামেলা তৈরি করা সহজ। এমনিতেই এসব দেশে এমন অনেক রাজনৈতিক দল আছে যেখানে রুশভাষীরা প্রভাবশালী। আবার শীতকালে এইসব অঞ্চলের বাড়ি-ঘর গরম রাখার সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম চলে রাশিয়ার জ্বালানিতে। রাশিয়া চাইলেই ইচ্ছামত দাম ঠিক করতে পারে। তারা চাইলে সরবরাহ বন্ধও করে দিতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই বাল্টিক অঞ্চলের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে আসছে রাশিয়া। সেই সময় থেকে এই অঞ্চলটাই রাশিয়ান প্রতিরক্ষার সব থেকে দুর্বল দিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাল্টিক সাগর থেকে প্রথমে দক্ষিণ এবং তার পরে দক্ষিণ-পূর্বে উরাল পর্বতমালাকে সংযুক্ত করে যে প্রতিরক্ষাব্যূহ কল্পনা করে রাশিয়া, বাল্টিক দেশগুলো তাতে বড়সড় একটা ছিদ্র।

আর এই ছিদ্র প্রসঙ্গেই মালদোভার কথা বলতে হয়। মস্কো মালদোভাকে বাফার হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। দেশটির দিকে সবসময় ঈগলের মতো নজর রাখে। কিন্তু মালদোভা নিয়ে অন্যরকম ঝামেলা আছে। রাশিয়ার সামরিক শক্তি মালদোভাতে পাঠাতে হলে রাশিয়াকে নিপার নদী ধরে ইউক্রেনের ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা যেতে হবে। ওদেসায় স্টেজিং পয়েন্ট বসিয়ে, তারপরে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে হয়তো রাশিয়া মালদোভাকে কবজা করতে পারবে। কিন্তু আবার অন্য ঝামেলাও আছে। মালদোভা ন্যাটোভুক্ত না হওয়ায় ন্যাটো হয়তো সরাসরি যুদ্ধ হয়তো করতে আসবে না, তবে নানা রকমের নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। রাশিয়ার সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর বর্তমান যে সম্পর্ক, আর তা যেদিকে গড়াচ্ছে, একে 'নব্য স্নায়ু যুদ্ধ' বলাই ভালো।



চিত্র: যেসব দেশ একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এখন ইউরোপের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এইসব দেশের মধ্যে আবার কিছু অঞ্চল রয়ে গেছে রাশিয়াপন্থী। যেমন, যেমন মালদোভার ট্রান্সনিস্ত্রিয়া অঞ্চল। এইসব অঞ্চলে ভবিষ্যতে সংঘাত তৈরি হওয়ার তীব্র সম্ভাবনা রয়েছে।

রাশিয়া মালদোভাকে কেন চায় তা একটু ব্যাখ্যা করলেই বুঝতে পারবেন। কার্পেথিয়ান পর্বতমালা বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে ট্রান্সেলভেনিয়া অঞ্চলে আল্পস পর্বতমালায় রূপ নিয়েছে। আর দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে একটা সমতলভূমি চলে গেছে সরাসরি কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত। এই অংশটা রাশিয়ার কাছে একটা সমতল করিডোরের মতো। এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা দেখেছিলাম- রাশিয়া উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে পোল্যান্ডের সরু করিডোরটা দিয়ে। ঠিক একইভাবে রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরের সমভূমিটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আর এই সমতলভূমির নামই মালদোভা। এই অঞ্চলের পুরোনো নাম ছিল বেসারাবিয়া।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় অটোমান শাসিত তুরস্ক এবং তুরস্ককে রক্ষা করতে আসা পশ্চিম ইউরোপীয় মিত্রদের সাথেও লড়াই করতে হয়েছে রাশিয়াকে। এই যুদ্ধের পর ১৮৫৬ সালের প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বেসারাবিয়ার কিছু অংশ মালদোভাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে কৌশলগতভাবে রাশিয়াকে দানিউব নদী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ জলপথের অধিকার ফিরে পেতে রাশিয়ার প্রায় এক শতাব্দী লেগে যায়। কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে রাশিয়াকে আবারও পূর্ব দিকে সরে যেতে হয়।

তবে মালদোভাকে একভাবে কবজায় রেখেছে রাশিয়া। নিস্টার নদীর পূর্ব দিকে ইউক্রেনের সীমান্তঘেঁষা মালদোভার ট্রান্সনিস্ত্রিয়া অঞ্চল। স্তালিন অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে এই এলাকায় বিপুল হারে রাশিয়ান মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। ক্রিমিয়া থেকে তাতারদের বাস্তুচ্যুত করার পরেও ঠিক একই কাজ করেছিলেন তিনি।

আধুনিক ট্রান্সনিস্ত্রিয়ার অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষ রুশ অথবা ইউক্রেনিয়ান ভাষাভাষী। আর এরা সবাই রাশিয়াপন্থী। ১৯৯১ সালে মালদোভা স্বাধীনতা লাভ করার পরে ট্রান্সনিস্ত্রিয়ার রাশিয়াপন্থী লোকজন বিদ্রোহ শুরু করে। এমনকি এক পর্যায়ে মালদোভা ভেঙে ট্রান্সনিস্ত্রিয়া প্রজাতন্ত্র নামে নতুন দেশ ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনা রাশিয়াকে সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। এমনকি এখনো সেখানে ২০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী রয়ে গেছে। দেশটি রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি শক্তি নেয়, আর রাশিয়াতে পাঠায় শস্য। পাশাপাশি মালদোভাতে তৈরি হয় চমৎকার ওয়াইন। আর রাশিয়াতে এই ওয়াইনের বেশ চাহিদা। মালদোভার ওয়াইন রপ্তানির হার কমে বা বাড়ে মূলত রাশিয়ার সাথে এই বছর সম্পর্ক কেমন তার উপর ভিত্তি করে।

কৃষ্ণসাগরের তীরে মালদোভার পাশে আরেকটি ওয়াইন উৎপাদনকারী দেশ আছে। দেশটি হলো জর্জিয়া। জর্জিয়া দখলের জন্য অবশ্য আপাতত রাশিয়ার তেমন একটা আগ্রহ নেই। এর পেছনে আছে দুইটি কারণ। প্রথমত, ২০০৮ সালের জর্জিয়া-রাশিয়া যুদ্ধ শেষ হলেও রাশিয়ান বাহিনীর একটা অংশ সেখানে থেকে যায়। আবখাজিয়া এবং দক্ষিণ ওসেটিয়া অঞ্চল এখন পুরোপুরি

তাদের নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয়ত, ককেশাস পর্বতমালার দক্ষিণের দেশ আর্মেনিয়ায় রাশিয়ার সেনা ঘাঁটি আছে। বাফার জোন হিসেবে জর্জিয়া এখনো কার্যকর আছে। জর্জিয়া যদি ন্যাটোর অংশ হয়ে যায়, এই সুবিধাটা রাশিয়া আর পাবে না। আর ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ঠিক এই কারণেই বারবার জর্জিয়ার আবেদন ফিরিয়ে দিচ্ছে। কারণ, এতে সরাসরি ন্যাটো-রাশিয়া যুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জর্জিয়ার অধিকাংশ মানুষই ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত হতে চাইত। কিন্তু ২০০৮ সালের যুদ্ধ তাদেরকে বাস্তবতা দেখিয়ে দেয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল সাকাশভিল বোকার মতো ভেবেছিলেন- রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধ লাগলে মার্কিনিরা তাদের উদ্ধার করতে ছুটে আসবে। কিন্তু, কেউ আসেনি। ২০১৩ সালে জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন রাশিয়াপন্থী গিওর্গি মার্গভেলাশভি। জর্জিয়ানরা বুঝতে পেরেছিল, অ্যামেরিকা বহুদূর। এর চেয়ে প্রতিবেশী মস্কোর সাথে মিত্রতাই ভালো।

এত ভাঙনের পরেও রাশিয়ার শক্তিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাদের মূল শক্তি কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র, সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনী নয়। বর্তমানে তাদের মূল শক্তি হচ্ছে তাদের হাতে থাকা প্রচুর তেল আর গ্যাস। তেল ও গ্যাস রপ্তানিতে রাশিয়ার চাইতে এগিয়ে আছে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভালো সম্পর্ক থাকলে তেল আর গ্যাস ন্যায্য দামে পাবে, নাহলে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে, এই হলো রাশিয়ার সাফ কথা। যেমন, বাল্টিক দেশগুলোর চাইতে অনেক সাশ্রয়ে জ্বালানি পায় ফিনল্যান্ড। এই নীতি রাশিয়া এতটাই আগ্রাসীভাবে ব্যবহার করেছে যে, রাশিয়ার ওপর জ্বালানি-নির্ভরতা কমানোর উপায় খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো। তারা রাশিয়া থেকে পাইপলাইনে জ্বালানি আনার বদলে বন্দর ব্যবহার করে অন্যান্য দেশ থেকে নৌপথে গ্যাস আনার কথা ভাবছে।

বর্তমানে ইউরোপে তেল ও গ্যাস সরবরাহের শতকরা ২৫ ভাগ রাশিয়ার দখলে। যে দেশ রাশিয়ার যত কাছে, সে দেশ তত বেশি নির্ভরশীল। আর এর প্রভাব পড়ে সেসব দেশের পররাষ্ট্রনীতির ওপর। লাটভিয়া, স্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড ও এস্তোনিয়া রাশিয়ান জ্বালানির উপর শতভাগ নির্ভরশীল। চেক

প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া ও লিথুয়ানিয়া ৮০ ভাগ নির্ভরশীল। গ্রিস, অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির নির্ভরশীলতা ৬০ শতাংশ। জার্মানির ৫০ ভাগ জ্বালানি-চাহিদা মেটায় রাশিয়ানরা, তাও আবার দীর্ঘমেয়াদি সুবিধাজনক চুক্তিতে। একারণেই রাশিয়া কোনো আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটালে ব্রিটেন যেখানে সমালোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, জার্মানিকে তার তুলনায় ধীরে-সুস্থে মৃদু তিরস্কার করতে দেখা যায়। ব্রিটেন এমনটা পারে। একে তো রাশিয়ার ওপর তার নির্ভরশীলতা মাত্র ১৩ শতাংশ, তার ওপর তাদের নিজেদেরই জ্বালানি শিল্পের অবকাঠামো আছে। নয় মাস জ্বালানি চাহিদা মেটানোর মত রিজার্ভ আছে তাদের।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে রাশিয়ার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন আছে। কোনোটা দিয়ে যায় গ্যাস, কোনোটা দিয়ে তেল। গ্যাস পাইপলাইনগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একদম উত্তরে আছে "নর্ড স্ট্রিম রুট"। বাল্টিক সাগরের মধ্যে দিয়ে এই লাইনটা সরাসরি জার্মানিতে চলে গেছে। একটু দক্ষিণে বেলারুশের বুক চিরে চলে গেছে ইয়ামাল পাইপলাইন। এই লাইন পোল্যান্ড হয়ে জার্মানিকে সংযুক্ত করেছ। একদম দক্ষিণে ব্লু স্ট্রিমের মাধ্যমে কৃষ্ণসাগর হয়ে পাঠানো হচ্ছে তুরস্কে। ২০১৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সাউথ স্ট্রিম নামে একটা প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছিল। সেটা ব্লু স্ট্রিমের পথ ধরেই এগিয়ে যাবে, কিন্তু মূল লাইন থেকে শাখা বের হয়ে যাবে হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, সাইবেরিয়া, বুলগেরিয়া এবং ইতালির দিকে।

এই প্রকল্পটি রাশিয়ার জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইউক্রেনের সাথে ঝামেলা শুরু হলেও, এই পাইপলাইনের কারণে পশ্চিম ইউরোপ এবং বলকান অঞ্চলে জ্বালানি পৌঁছানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল খোলা থাকত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত অনেক দেশই তাদের প্রতিবেশীকে চাপ প্রয়োগ করছিল এই প্রজেক্টে সহযোগিতা না করতে। বুলগেরিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের দাবির সাথে একমত হয়। তারা বলে দেয়, তাদের দেশের ওপর দিয়ে এই পাইপলাইন যেতে পারবে না। ফলে প্রকল্পটা স্থগিত হয়ে গেল। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট পুতিন এবার তুরস্কের কাছে নতুন প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। এবারের প্রকল্পের নাম টার্ক স্ট্রিম।

সাউথ স্ট্রিম এবং টার্ক স্ট্রিম, এই দুই প্রকল্পেরই উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনকে বাইপাস করার সুযোগ পাওয়া। ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত রাশিয়া-ইউক্রেন বিবাদ চলাকালে বারবার পাইপলাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়। আঠারোটি দেশে গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এই সময়। ২০১৪ তে ক্রিমিয়া সংকটের সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলার ব্যাপারে সাউথ স্ট্রিমের সুবিধা পেতে যাওয়া ইউরোপীয় দেশগুলো খুব সাবধান ছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ইউরোপের জন্য একটা চমৎকার প্রস্তাব নিয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলো যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপীয়রা চায় গ্যাস। আবার তারা এটাও চায় যে রাশিয়ান পররাষ্ট্রনীতির কাছে তাদের যেন নতজানু হতে না হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এর চমৎকার একটা সমাধান ছিল। তাদের দেশে তখন চলছে শেল গ্যাসের বাম্পার উৎপাদন। তাদের নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত গ্যাস তো ছিলই, উদ্বৃত্ত অংশ ইউরোপের কাছে বিক্রি করারও সুযোগ ছিল তাদের। এই কাজটি করতে হলে গ্যাসকে তরলে পরিণত করে জাহাজের মাধ্যমে আটলান্টিক পাড়ি দিতে হবে। একে বলা হয় লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস বা এলএনজি।

কিন্তু তার জন্য ইউরোপের উপকূল জুড়ে বন্দর এবং এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করতে হবে। এই টার্মিনালগুলোতে কার্গোতে বহন করে আনা তরলকে আবার গ্যাসে পরিণত করা হবে। ওয়াশিংটনে ততদিনে এই ব্যাপারে দাপ্তরিক কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইউরোপও এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নিয়ে নিয়েছে। পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়া এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শুরুও করে দিয়েছে। চেক প্রজাতন্ত্রও এইসব টার্মিনালের সাথে পাইপলাইন স্থাপন করতে খুবই আগ্রহী। কারণ, এর ফলে অ্যামেরিকান গ্যাস পাওয়ার পাশাপাশি তারা উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকেও জ্বালানি কিনতে পারবে। ক্রেমলিন চাইলেই সুইচ বন্ধ করে দিয়ে দেশগুলোকে চাপে রাখতে পারবে না।

রাশিয়া বুঝতে পারল যে সামনে বিপদ আসছে। তারা বলা শুরু করল, এলএনজি'র চেয়ে পাইপলাইনের গ্যাস সস্তা। ভ্লাদিমির পুতিন মুখে একটা গোবেচারা ভাব ঝুলিয়ে আচমকা খুব ইউরোপপ্রেমী হয়ে উঠলেন। তিনি তাদেরকে বুঝাতে চাইলেন ইউরোপের হাতে তো আরো সস্তা এবং নির্ভরযোগ্য

বিক্রেতা আছেই। খামোখা মার্কিনিদের ঢুকতে দেওয়ার কী দরকার! তবে এসব বক্তব্য ধোপে টেকেনি। যদিও মার্কিন এলএনজি দিয়ে রাশিয়ার গ্যাসকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর ফলে দুর্বল দেশগুলো দরদাম করার স্বাধীনতা পাবে, নিজেদের পররাষ্ট্রনীতিকেও মজবুত করতে পারবে। রাশিয়া বুঝল যে অবস্থা বেগতিক হতে যাচ্ছে। তখন তারা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাইপলাইন স্থাপন করে চীনে গ্যাস বিক্রির কথা ভারতে শুরু করল।

ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধের একটা ক্ল্যাসিক উদাহরণ এটা। সেই সাথে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়, তারও চমৎকার উদাহরণ। একটা সময় এই সুযোগ ছিল না। ২০১৪ সালের ক্রিমিয়া ইস্যুতে রাশিয়ার অর্থনীতি বেশ বড় একটা ধাক্কা খায়। ২০১৫ সালে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৫০ ডলারেরও নিচে নেমে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ২০১৬ সালে পরের অর্থবছরের বাজেট করার সময় রাশিয়াকে ধরে নিতে হয়েছে যে- ২০১৭ সালে ব্যারেলপ্রতি দাম ৫০ ডলারের বেশি উঠবে না। রাশিয়া এখনো হয়তো তেল উত্তোলনের আগের সব রেকর্ড ভেঙে চলেছে, কিন্তু তা দেখে ব্যালান্স শিট বুঝা যায় না। ব্যারেলপ্রতি এক ডলার দাম কমলেই ২ বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ হারায় রাশিয়া। এই ধাক্কা রাশিয়াতে ভালোভাবেই লেগেছে। সাধারণ মানুষ বেশ কষ্টের মধ্যে আছে। এই রাষ্ট্রের ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নিয়েও সরগরম আলোচনা শুরু হয়েছে। এর পরেও নিজেদের ক্রমবর্ধমান সামরিক বাজেটের খরচ চালানোর জন্য আয় বাড়ানোর চাপ আছে তাদের মাথায়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদিও বলছে এতকিছুর পরেও রাশিয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই চলবে এই দশকজুড়ে। আর আর্কটিক অঞ্চলে নতুন পাওয়া তেলের বিশাল সম্ভার থেকে যদি ঠিকঠাকভাবে তেল নিয়ে আসতে পারে, তাহলে অর্থনীতির পালে আরো জোর হাওয়া লাগবে।

রাশিয়া বৈশ্বিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। তার আশেপাশের দেশগুলো পেরিয়ে আরো দূরেও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। যেমন, লাতিন অ্যামেরিকা। এই অঞ্চলে তাদের কিছু বন্ধু আছে। লাতিন অ্যামেরিকার যে দেশের সাথে যখনই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খারাপ থাকে, রাশিয়া তখন থাকে তার

সব থেকে বড় বন্ধু। যেমন, ভেনিজুয়েলা। মধ্যপ্রাচ্যের সাথেও রাশিয়া সুসম্পর্ক বজায় রাখতে শুরু করেছে, যেন তাদের ওপর মার্কিন প্রভাব কমানো যায়। আর সেই সাথে তারা মনোযোগ দিয়েছে আর্কটিক দখলে রাখার কাজে। আর্কটিককেন্দ্রিক সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচুর টাকা ঢালছে তারা। গ্রিনল্যান্ডের দিকেও আগ্রহ নিয়ে তাকাতে শুরু করেছে রাশিয়া। আফ্রিকায় সমাজতন্ত্রের পতনের পর তারা সেখানের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছিল অনেকটাই। এই ফাঁকে চীন সেখানে গেঁড়ে বসতে শুরু করেছে। আফ্রিকায় চীনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে রাশিয়া।

চীন আর রাশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তারা একে অপরকে নানা পর্যায়ে সহায়তা করে থাকে। ইউরোপকে রাশিয়ান জ্বালানি-নির্ভরতা কমিয়ে ফেলতে মরিয়া হতে দেখে রাশিয়া এখন চীনে নতুন বাজার তৈরি করতে আগ্রহী। ক্রেতা হিসেবে যদিও চীনই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, তবে দুই দেশের মধ্যে বেশ উষ্ণ আলোচনাই হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে রাশিয়া প্রতিবছর চীনকে ৩৮ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করবে।

বর্তমান সময়ে এসে রাশিয়া আর চীনের জন্য সামরিক হুমকি নয়। ১৯৪৫ সালের মত মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেওয়া আজকাল আর রাশিয়ার পোষাবেও না। তবে তারা একে অপরের দিকে নজর ঠিকই রাখে। কাজাখস্তানের মত জায়গা নিয়ন্ত্রণে রাখতে, উভয়ই একে অপরের সাথে হম্বিতম্বি করে। তবে আগের দিনের মত বড় কমিউনিস্ট হতে চাওয়ার সেই প্রতিযোগীতা আর নেই। একারণে সামরিকভাবে তারা মুখোমুখি না হয়ে বর্তমানে অনেকটা সহযোগী হয়ে এসেছে বলা যায়। যেমন ২০১৫ সালের মে মাসে দুইদেশ মিলে ভূমধ্যসাগরে একটা যৌথ মহড়া দিল।

একদিকে নিজের দেশ থেকে ৯০০০ মাইল দূর পর্যন্ত সমুদ্রসীমা দাবি করার মাধ্যমে চীন নৌ পরাশক্তি হয়ে উঠতে চাইছে। অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে গ্যাস পাইপলাইনের নিরাপত্তার জন্য গ্রিসের সাথে দেনদরবার করছে রাশিয়া। সিরিয়া উপকূলে নিজেদের উপস্থিতিটাও বজায় রাখতে চায় তারা। তাছাড়া দুইটি দেশই এই অঞ্চলের ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোকে বিরক্ত করতে

পছন্দ করে। ইটালির মিলানে অবস্থান নেওয়া অ্যামেরিকার ষষ্ঠ নৌবহরকেও স্বস্তিতে থাকতে দিতে রাজি নয় তারা।

বিশাল রাশিয়ার সমস্যাগুলোও বিশাল। ভৌগোলিক অবস্থানগত সমস্যা তো আছেই, জনসংখ্যাও অনেকদিন ধরেই কমতে শুরু করছে। রাশিয়ান পুরুষদের গড় আয়ুও কম, ৬৫ বছরের নিচে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৩টি দেশের মধ্যে এই গড় আয়ু একদম নিচের দিকে। ক্রিমিয়াকে বাদ দিলে এই বিশাল দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ১৪৪ মিলিয়ন।

গ্র্যান্ড প্রিন্সিপালিটি অফ মাস্কভি থেকে শুরু করে আধুনিক রাশিয়া পর্যন্ত ভূ-প্রকৃতির সমস্যা একইরকম রয়ে গেছে। পিটার দ্যা গ্রেট, স্তালিন, পুতিন সবাই একই বিষয় নিয়ে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। যুগে যুগে রাশিয়ায় জারের শাসনামল এসেছে, এসেছে কমিউনিজম, আবার কখনো এখানে চলেছে সরকার নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ বা "ক্রনি ক্যাপিটালিজম"- কিন্তু এখনো তাদের বন্দর জমে বরফ হয়ে যায়! উত্তর ইউরোপের সমতলভূমি এখনো আগের মতোই সমতল আছে। তাই ম্যাপের যেসব সমস্যা নিয়ে আইভান দ্যা টেরিবল চিন্তিত ছিলেন, সেই সমস্যা থেকে পুতিনও মুক্ত হতে পারছেন না।

অধ্যায় দুই

চীন



"চীন মূলত একটা সভ্যতার নাম, যা নিজেকে দেশ হিসেবে দেখাতে চাইছে।"

-লুসিয়ান পাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
Manchuria
KYRGYZSTAN
TAJIKISTAN
Xinjiang
AFGHANISTAN
PAKISTAN
Inner Mongolia
Beijing
Vladivostok
NORTH KOREA
SOUTH KOREA
JAPAN
CHINA
Tibet
Lhasa
NEPAL
BHUTAN
Shanghai
INDIA
BANGLADESH
TAIWAN
BURMA
VIETNAM
LAOS
THAILAND
PHILIPPINES



চীন

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনা। পূর্ব চীন সাগর ধরে কাউকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে চলছে মার্কিন নৌবাহিনীর এক ঝাঁক যুদ্ধজাহাজ। বহরের নেতৃত্বে রয়েছে ১০০০ ফুট দৈর্ঘ্যের সুপারক্যারিয়ার ইউএসএস কিটি হক। অঞ্চলটি দক্ষিণ জাপান আর তাইওয়ানের মাঝামাঝি। কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই হুট করে ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে ভেসে উঠল চাইনিজ নেভির একটা সাবমেরিন। এই আকারের একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের আশেপাশে নানারকমের অন্তত ১২টা যুদ্ধজাহাজ থাকে, যার ওপরে থাকে এয়ার কভার, নিচে থাকে সাবমেরিন কভার। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনচালিত সং-ক্লাস চাইনিজ সাবমেরিনটি একদম নিঃশব্দে মাথা জাগালেও এর উপস্থিতি খুব সরব একটি বার্তা দেয়। কোকা-কোলার বোর্ড মিটিংয়ের সময় আচমকা টেবিলের নিচ থেকে পেপসি-কোলা কোম্পানির কর্মকর্তারা মাথা বের করলে যেমন হবে, ঘটনাটা ঠিক তেমন।

মার্কিনিরা একদিকে অবাক হলো, আবার রেগেও গেল। অবাক, কারণ চীনা সাবমেরিন এত নিঃশব্দে হাজির হতে পারে, তা তারা ভাবতেই পারেনি। আর রেগে যাওয়ার কারণ হলো, সাবমেরিনের অস্তিত্ব আগে টের পায়নি তারা। পাশাপাশি তাদের কাছে ঘটনাটা যথেষ্ট উস্কানিমূলকও বটে। কেননা মাথা জাগানোর সময় খোদ কিটি হকই ছিল সাবমেরিনের টর্পেডো রেঞ্জের মধ্যে। অ্যামেরিকা এই ঘটনা নিয়ে একটু বেশিই জোরালো প্রতিবাদ জানাল। জবাবে চীন বলল, 'আহা, বড়ই কাকতালীয় ব্যাপার! তোমরা যে তোমাদের যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আমাদের সমুদ্রসীমা ধরে যাচ্ছ তা তো আমরা জানতামই না। হুট করে কেমন মাঝখানে পড়ে গেলাম!"

এই হচ্ছে একবিংশ শতকের "রিভার্স গানবোট ডিপ্লোমেসি"। এক সময় দুর্বল দেশগুলোর সমুদ্রসীমায় একটা করে যুদ্ধজাহাজ রেখে সতর্ক করে দিত

ব্রিটেন। “গানবোট ডিপ্লোমেসি” নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে এই আচরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিনিরাও এধরনের কাজ করে চলেছে। কিন্তু চীন করল এর উল্টোটা। তারা নিজেদের বাড়ির পাশের সাগরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিল। জানিয়ে দিল, “আমরা বর্তমানে নৌ-পরাশক্তি, এখন আমাদের পালা, এই সাগর আমাদের।” এই কথাটি বলতে চীনের সময় লাগল অবশ্য ৪০০০ বছর!

বর্তমান সময়ের আগে চীনের নেভি কখনোই তেমন একটা শক্তিশালী ছিল না। আয়তনে চীন সুবিশাল। আশপাশের দেশগুলোর সাথে একাধিক স্থলসীমান্ত আছে তাদের। স্থানীয় দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য করার জন্য ছোট ছোট সাগরপথও আছে। তাছাড়া অন্যের এলাকা দখল করার মতাদর্শও তাদের ছিল না কখনো। তাদের ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করতে অনেককাল ধরেই মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। তবে, চীনা নেভি কখনো নিজেদের সমুদ্রসীমার বাইরের এলাকা নিয়ে সেভাবে আগ্রহী ছিল না। নিজেদের সীমানা থেকে বেরিয়ে প্রশান্ত, আটলান্টিক বা ভারত মহাসাগরে টহল দিয়ে বেড়ানো একে তো ঝামেলার কাজ, খরচেও তেমন পোষায় না। চীন বরাবরই ছিল স্থলশক্তি। যেমন বিশাল এই দেশের ভূমির আয়তন, তেমনই বিশাল এর জনসংখ্যা। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি।

চৈনিক সভ্যতার সূচনাকাল আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে। এই সভ্যতার উৎপত্তিস্থল ছিল উত্তর চীনের একটা বিশাল সমভূমি এলাকা। এই অঞ্চলটার নাম “উত্তর চীনের সমভুমি”। কিন্তু চীনের মানুষদের কাছে প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলটা “কেন্দ্রীয় সমভূমি” নামেও পরিচিত। কারণ, এক সময় প্রাচীন চীনের মানুষরা এই অঞ্চলটাকে পৃথিবীর কেন্দ্র মনে করত। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে, ইনার মঙ্গোলিয়ার ঠিক নিচে অবস্থিত বিশাল এই সমতল অঞ্চল হুয়াংহো নদী-অববাহিকার ১,৬০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত। এর সীমানা চলে গেছে ইয়াংসি নদী পর্যন্ত। এই দুইটি নদীই পূর্ব-পশ্চিমে প্রবহমান। এই অঞ্চল বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর একটি।

যুগ যুগ ধরে নিয়মিত বিধ্বংসী বন্যার কারণে চরম ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে আসছে হুয়াংহো নদীর অববাহিকা। স্থানীয়রা এই নদীর নাম দিয়েছে

"হান-এর পুত্রদের অভিশাপ"। পঞ্চাশের দশক থেকে এই এলাকায় শিল্পায়ন শুরু হয়। বিশেষ করে বিগত তিন দশকে উন্নয়নের গতি অনেক বেড়েছে। আর এই উন্নয়নের কারণেই প্রমত্তা হুয়াংহো নদী এখন প্রচণ্ড দূষিত। শিল্পবর্জ্যে পরিপূর্ণ এই নদীটির অবস্থা এখন এমন যে- সমুদ্রে পৌঁছানোর পথও বন্ধ হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। এতকিছুর পরেও চীনাদের কাছে এই নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের কাছে যেমন নীলনদ, চীনের কাছে হুয়াংহো নদীর গুরুত্বও তেমনই। চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই নদীকে কেন্দ্র করে। প্রাচীনকালে এই নদীর অববাহিকাতেই তারা চাষ করতে শিখেছে। কালক্রমে তারা আবিষ্কার করেছে কাগজ, তৈরি করেছে বারুদ।

প্রাচীন সেই চীনের উত্তরে ছিল রুক্ষ গোবি মরুভূমি। বর্তমানে এই অঞ্চলটা মঙ্গোলিয়ার মধ্যে পড়েছে। চীনের পশ্চিম দিকে ভূমি ধীরে ধীরে উঁচু হতে হতে একসময় তিব্বত মালভূমিতে মিলে গেছে, তারপর শুরু হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে সাগর।

চীনের প্রাণকেন্দ্র হলো "উত্তর চীনের সমভুমি" অঞ্চল। প্রাচীনকাল থেকেই এই সমতলভূমি অত্যন্ত উর্বর। দুইটি নদী-অধ্যুষিত এই অঞ্চলে বছরে দুইবার করে চাল এবং সয়াবিন উৎপাদিত হতো। আবহাওয়ার এমন চমৎকার আনুকূল্য পাওয়ায় এই অঞ্চলে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে অনেকগুলো ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র। তারা নিয়মিতই একে অপরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যেত। এইসব যুদ্ধ-বিবাদ সত্ত্বেও খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ এই অঞ্চলে গঠিত হয় প্রথম চৈনিক রাজ্য, "শ্যাং"। শ্যাং রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে হান জনগোষ্ঠী। চীনের এই প্রাণকেন্দ্রকে রক্ষা করার পাশাপাশি একে ঘিরে তারা গড়ে তোলে বাফার জোন।

বর্তমান চীন রাষ্ট্রের ৯০ শতাংশই হান জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনীতির নিয়ন্ত্রণও তাদেরই হাতে। চীনে ভাষাগত বিভাজন আছে। মান্দারিন, ক্যান্টোনিজ এবং আরো অনেক প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলে এ দেশের মানুষেরা। তা সত্ত্বেও তারা একে অপরের সাথে জাতিগত নৈকট্য অনুভব করে। নিজেদের প্রাণকেন্দ্র রক্ষায় তারা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। চীনের উত্তরাঞ্চল থেকে আসা মান্দারিন ভাষাতেই বেশিরভাগ মানুষ কথা বলে। চীনের

দাপ্তরিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের ভাষা, এমনকি শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভাষাও মান্দারিন। লিপির দিক থেকে বা লেখার ক্ষেত্রে ক্যান্টোনিজের সাথে মান্দারিনের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বলার সময় এই দুই ভাষার পার্থক্যটা বুঝা যায়।

চীনের প্রাণকেন্দ্র এই হুয়াংহো-ইয়াংসি অববাহিকাই তাদের রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক এবং কৃষি কার্যক্রমের ভিত্তিভূমি। এই অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের কাছাকাছি। কিন্তু গোটা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা যেখানে মাত্র ৩২ কোটি, সেখানে এই অববাহিকা ঘিরে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের বসবাস। এই অঞ্চলের স্থায়ী বসতি এবং কৃষিভিত্তিক জীবনধারার কারণে আশেপাশের অ-হান অঞ্চলগুলো নিয়ে সতর্ক থাকতে হত প্রথম দিকের প্রতিটি হান রাজবংশকেই। বিশেষ করে মঙ্গোলিয়া নিয়ে সর্তকতা ছিল একটু বেশি। কারণ মঙ্গোলিয়ায় তখন অনেকগুলো যাযাবর গোত্র বাস করত। আর মঙ্গোলরা পরিচিত ছিল ভয়ানক নিষ্ঠুর যোদ্ধা হিসেবে।

চীন অনেকটা রাশিয়ার মত সামরিক পরিকল্পনা নেয়- প্রতিরক্ষার উপায় হিসেবে আক্রমণকে বেছে নিয়ে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে হবে। নিজেদের রক্ষার জন্য তারা বেছে নেয় আগ্রাসী নীতি। রাশিয়ার মতো চীনেরও প্রাকৃতিক সুরক্ষার অভাব ছিল। নিজেদের নিরাপত্তা জোরদার করতে হলে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা-সম্বলিত অঞ্চলগুলো দখলে নিতে হবে- এই কথা হান জনগোষ্ঠী জানত। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা এই প্রচেষ্টাই চালিয়ে গেছে। তবে ১৯৫১ সালে চীন যখন তিব্বত অধিগ্রহণ করে নেয়, তখন তারা ব্যাপারটার গুরুত্ব পুরোপুরি বুঝতে পারে।

বিখ্যাত চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের সময়কালে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯) চীনে শক্তিশালী জাতীয়তাবোধ জন্ম নেয়। তারা নিজেদেরকে সভ্য মানুষ ধরে নিয়ে আশেপাশের অঞ্চলের মানুষকে 'অসভ্য' আখ্যা দিত। এভাবে একটা স্পষ্ট বিভাজন তৈরি করেছিল তারা। সেই সময়ে নিজেদের এমন উচ্চস্তরের মানুষ ভাবত চীনের প্রায় ছয় কোটি জনগণ।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সাল নাগাদ বিভিন্ন দিকে রাজ্য সম্প্রসারণ শুরু করে চীন। দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় তিব্বত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উত্তর দিকে মধ্য এশিয়ার

তৃণভূমি থেকে শুরু করে দক্ষিণে চীন সাগর পর্যন্ত দখলে নিয়ে আসে। তবে শুধু রাজ্য সম্প্রসারণেই থেমে থাকেনি চীন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে যাযাবর কিছু গোত্র প্রায়ই চীনে আক্রমণ চালাত। এইসব যাযাবর গোত্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চীন এক বিশাল প্রাচীন নির্মাণের কাজ শুরু করে। চীনের এই মহাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয় কিন রাজবংশের আমলে (২২১-২০৭ খ্রিস্টপূর্ব)। আর সে-সময় থেকেই আধুনিক চীনের গোড়াপত্তন হয়। তবে চীনের বর্তমান সীমানাকে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের প্রায় ২০০০ বছর সময় লেগে গেছে।

চীনের মহাপ্রাচীরই চীনের একমাত্র বড় কর্মযজ্ঞ নয়। চীনের ভেতরের নদীগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরি করার জন্য চীন কয়েক শতাব্দী ধরে খাল খনন প্রকল্প চালু রেখেছিল। এটাকে বলা হয় গ্র্যান্ড ক্যানাল। ৬০৫ থেকে ৬০৯ সাল পর্যন্ত এই খালকে আরও বড় করার প্রকল্প গ্রহণ করে চীন। অবশেষে এই খালের মাধ্যমে হুয়াংহো নদী এসে মিলিত হয় ইয়াংসি নদীর সাথে। এই গ্র্যান্ড ক্যানাল বর্তমান সময়ে এসেও সবচেয়ে বড় কৃত্রিম জলপথ। কিন রাজবংশের (২২১-২০৭ খ্রিস্টপূর্ব) আমলে চীনের সবগুলো রাজ্য একীভূত থাকলেও, এই রাজবংশের পতনের সাথে সাথে তা আবার কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। সুই রাজবংশ (৫৮১ - ৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ) চীনকে আবারও একীভূত করে। একীভূত চীন আবারও শক্তিশালী। এবার দেশের সব অঞ্চল থেকে বিশাল শ্রমশক্তিকে একজোট করে এই সাম্রাজ্য খাল খননের কাজে ব্যবহার করে। এভাবে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যায় তারা। কয়েক মিলিয়ন দাসকে পাঁচ বছর ধরে খাটিয়ে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করা হয়। প্রাকৃতিক শাখা নদীগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দুই মহানদীর মধ্যে চলাচলযোগ্য জলপথ তৈরি করা হয়। এর ফলে চীনের উত্তর অঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে সহজতর হয়ে ওঠে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে মালামাল বহনজনিত প্রাচীন সমস্যারও সমাধান হয় এতে। তবে বন্যা সমস্যার সমাধান হয়নি। এই সমস্যা বর্তমান সময়েও রয়ে গেছে।

এত কিছুর পরেও হানেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। তবে, ক্রমেই তা কমে আসতে থাকে। বিশেষ করে একাদশ শতকের গোড়ার দিকে

যখন উত্তর থেকে মঙ্গোলরা বানের জলের মতো ধেয়ে আসতে থাকে, সবাইকে সেদিকে নজর ফেরাতে হয়। পরের তিন শতাব্দীর মধ্যে চীনের উত্তর-দক্ষিণের সকল রাজবংশকেই একের পর এক পরাজিত করে মঙ্গোলরা। আর মঙ্গোল অধিনায়ক কুবলাই খান ১২৭৯ সালে গোটা চীন অধিকার করে সম্রাটের সিংহাসন দখল করেন। এই প্রথমবারের মতো কোনো বিদেশি জাতির মানুষ চীনের সম্রাট হয়ে বসলেন। এরপরই শুরু হলো মঙ্গোল বা ইউয়ান রাজবংশের শাসনামল। মঙ্গোলদের রাজত্বকালের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় নব্বই বছর। এরপর মিং রাজবংশ স্থাপনের মাধ্যমে হানেরা আবারও চীনের ক্ষমতা দখল করে।

এই আমলে এসে ইউরোপের বণিকদের সাথে চীনের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ইউরোপের নবগঠিত জাতিরাষ্ট্র পর্তুগাল ও স্পেন থেকে দূতদের আনাগোনা শুরু হয়। ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের বিরোধী হলেও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চল উন্মুক্ত করে দেন চীনের নেতারা। এই বাণিজ্যিক সুবিধার ফলে উপকূলীয় এলাকাগুলো সমৃদ্ধ হতে থাক। কিন্তু ভেতরের দিকের এলাকাগুলো অবহেলিত রয়ে যায়। এই পরিস্থিতি আজো একই রকম আছে। বাণিজ্যের আনুকূল্যে শাংহাইয়ের মতো বন্দরনগরী সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠলেও, সেই সমৃদ্ধির ছোঁয়া গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছায় না। এই কারণে চীনে বেড়ে চলছে আঞ্চলিক বৈষম্য, গ্রামাঞ্চল থেকে স্রোতের মত মানুষ চলে আসছে শহরাঞ্চলে।

অষ্টাদশ শতকে এসে চীন আবারও রাজ্য সম্প্রাসারণ শুরু করে। দক্ষিণে বার্মা এবং ইন্দো-চীনের কিছু অংশ দখল করে নেয়। উত্তর-পশ্চিমে জিনজিয়াং দখলের পর তা চীনের সব থেকে বড় প্রদেশে পরিণত হয়। পাহাড়-পর্বত আর মরুময় এই জিনজিয়াং প্রদেশটির আয়তন ৬,৪২,৮২০ বর্গমাইল। আকারে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের দ্বিগুণ। চীনের এই একটা প্রদেশের মধ্যেই গোটা যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামকে ভরে ফেলার পরেও লুক্সেমবার্গ আর লিশটেনস্টাইনের জন্য খানিকটা জায়গা বাকি থেকে যাবে! তাহলে বুঝতেই পারছেন আয়তনে কত বিশাল এই জিনজিয়াং!

কিন্তু আয়তনে বড় হওয়ার পাশাপাশি চীনের সমস্যাও বাড়তে থাকল। জিনজিয়াং প্রদেশের বাসিন্দারা প্রধানত তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর এবং ধর্মে মুসলিম।

ফলে অস্থিরতা এবং বিদ্রোহের একটা স্থায়ী সম্ভাবনা তৈরি হলো। তবে এত বিশাল একটা বাফার জোন পাওয়ার লক্ষ্যে এই ঝামেলা পোহাতে কোনো আপত্তি ছিল না হানদের। এমনকি ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনের পরেও এই বাফারের গুরুত্ব একই রকম থেকে যায়।

ব্রিটিশসহ অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তি চীনে পৌঁছানোর পরে নিজেদের প্রভাবের বলয় অনুসারে দেশটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নেয়। মঙ্গোল আক্রমণের পরে চীনের অধিবাসীদের জন্য এটাই ছিল সব থেকে অপমানজনক বিষয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ঘন ঘন এই ন্যারেটিভই প্রচার করে থাকে। এর মধ্যে খানিকটা সত্যি তো আছে বটেই। কিন্তু একই সাথে নিজেদের ব্যর্থতা এবং চীনের বর্তমান দমনমূলক নীতিকে চাপা দিতেও এই ন্যারেটিভ খুব কার্যকর।

বিংশ শতকে এসে নব্য পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় জাপান। দেশটি নিজেদের রাজ্যসীমা বাড়ানোর লক্ষ্যে বারবার চীন আক্রমণ করতে থাকে। প্রথমবার তারা হামলা চালায় ১৯৩২ সালে। পরের দফায় ১৯৩৭ সালে তারা চীনের প্রাণকেন্দ্রের বেশিরভাগ অংশ দখল করে নেয়। সেই সাথে দখলে নেয় মাঞ্চুরিয়া ও ইনার মঙ্গোলিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর চীনে জাপানি আধিপত্যের অবসান ঘটে। চীন থেকে জাপানি সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে মাঞ্চুরিয়ায় দেখা দেয় নতুন বিপদ। সেখানে শুরু হয় সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসন।

সে-সময় পশ্চিমা বিশ্বের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা স্বপ্ন দেখছিলেন যে-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চীনে হয়তো উদারপন্থী গণতন্ত্র আসবে। সাম্প্রতিক আরব বসন্তের সময়েও স্বপ্নালু পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদেরকে এমন বোকা বোকা উচ্চাভিলাষ ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে না জানা, জনগণকে না বুঝা এবং ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবই এই ধরনের অযৌক্তিক আশাবাদের কারণ।

বাস্তবে চীনে এরকম কিছুই হয়নি। বরং, আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে চিয়াং কাই-শেক এর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং চেয়ারম্যান মাও জেদং-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট সেনাদল পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই শুরু

করে। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয়, আর জাতীয়তাবাদীরা পিছিয়ে তাইওয়ানে চলে যায়। সেই বছরই রেডিও বেইজিং-এ ঘোষণা দেওয়া হয়- তিব্বত, জিনজিয়াং, হাইনান ও তাইওয়ানসহ সকল চৈনিক অঞ্চলকে মুক্ত করবে পিপলস লিবারেশন আর্মি।

এরপর মাও চীনের ক্ষমতাকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করলেন, যা আগের কোনো রাজবংশের আমলেই দেখা যায়নি। তিনি ইনার মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব রুখে দিলেন। মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত চীনের প্রভাব বিস্তার করলেন। ১৯৫১ সালে পরিপূর্ণভাবে তিব্বত অধিগ্রহণ করল চীন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আরো একটি অ-হান অঞ্চল চীনের করায়ত্ব হলো। চীনের স্কুলের পাঠ্যবইতে ছাপানো ম্যাপে এমনকি মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হলো। চীন আবারও একীভূত হলো এবং এই অবস্থা নিশ্চিত রাখতেই জীবনের বাকি দিনগুলো ব্যয় করলেন মাও। জনগণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। তবে, কোনো এক কারণে বহির্বিশ্বের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে রাখলেন। দেশ একতাবদ্ধ হলো বটে, তবে উপকূলবর্তী এলাকা বাদে বাকি দেশটা নিতান্তই দরিদ্র হয়ে রইল।

মাও জেদং বিজয় অর্জন করেছিলেন লং মার্চের মাধ্যমে। তাঁর উত্তরসূরিরা অর্থনৈতিক মার্চের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করতে চাইলেন। ১৯৮০'র দশকের গোড়ার দিকে দেং জিয়াওপিং নামে এক নেতা এলেন নতুন এক তত্ত্ব নিয়ে। তিনি তার তত্ত্বের নাম দিলেন "চৈনিক বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্র"। যদিও এর অর্থ গিয়ে দাঁড়াল "পুঁজিবাদের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ"। এই সময় থেকে বাণিজ্যিক ও সামরিক পরাশক্তি হয়ে উঠতে লাগল চীন। ১৯৮৯ সালে ঘটে যাওয়া তিয়েনআনমেন স্কয়ারের হত্যাযজ্ঞের ধকল ১৯৯০-এর দশকের শেষ নাগাদ কাটিয়ে ওঠে তারা। তবে তখনও হংকং এবং ম্যাকাও চীনের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এরপর প্রায় একই সময়ে ব্রিটিশ এবং পর্তুগিজদের হাত থেকে যথাক্রমে হংকং এবং ম্যাকাওকে ফিরে পায় চীন। এর সাথে সাথে নিজেদের সীমানার চারপাশে পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করে বহির্বিশ্বের দিকে নজর দিতে শুরু করে তারা।

আধুনিক চীনের সীমান্ত অঞ্চলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব- এই পরাশক্তি ভৌগোলিক সুরক্ষাবলয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সামরিক এবং বাণিজ্য খাতেও প্রবৃদ্ধি এসেছে। চীনের ক্ষেত্রে কম্পাসের কাঁটার ক্রম ধরা হয় পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর অনুসারে। তবে এখানে আমরা উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটা বরাবর আলোচনা শুরু করব।

উত্তরে মঙ্গোলিয়ার সাথে চীনের আছে ২৯০৬ মাইল দীর্ঘ সীমানা। আর এই সীমানাজুড়ে আছে সুবিশাল গোবি মরুভূমি। প্রাচীনকালের যাযাবর যোদ্ধারা হয়তো এই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে দক্ষিণে হামলা চালাতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আধুনিক সামরিক বাহিনীর হিসেবে বিচার করলে এই অঞ্চলটা একই সাথে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাব্যূহ। কারণ, এই বিস্তীর্ণ সমতলে সমরসজ্জা শুরু হলেই তা চীনের নজরে চলে আসবে। তাছাড়া ইনার মঙ্গোলিয়া হয়ে চীনের প্রাণকেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছাতে এই দুর্গম এলাকার ওপর দিয়ে তৈরি করতে হবে বিশাল লম্বা রসদ সরবরাহের রুট। এই অঞ্চলে বসবাসযোগ্য এলাকা তেমন একটা নেই। ভারি সামরিক যানবাহন চলাচলের মতো রাস্তাঘাট পর্যন্ত নেই। ফলে উত্তর দিকে চীনের সম্প্রসারণও তাই সামরিক কায়দায় হবে না, হবে বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে। মঙ্গোলিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ভার হাতে পাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চীন। এর সূত্র ধরে মঙ্গোলিয়ায় হান জনগোষ্ঠীর অভিবাসন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বেশকিছু হান জনগোষ্ঠীর মানুষ মঙ্গোলিয়াতে বসবাস করতে শুরু করলে চীনের এই মিশন সফল করতে অনেক সুবিধা হবে।

পূর্ব দিকে চীন-রাশিয়া সীমান্ত চলে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জাপান সাগর পর্যন্ত। সীমান্তের উত্তরে রাশিয়ার রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল। দেশটির একদম পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা খুবই কম। এই সীমান্ত দিয়ে চীনের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছাতে চাইলে রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ পার হতে হবে। মাঞ্চুরিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি এবং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অপরদিকে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের লোকসংখ্যা বড়জোর ৭০ লাখ, আর তা বাড়ারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণের চীন থেকে উত্তরের রাশিয়ায় গণ-অভিবাসনকে সম্ভাবনা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

এর ফলে রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীন অবশ্যই কিছু বাড়তি সুবিধা পেতে পারে। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চীন থেকে রাশিয়ায় অনুপ্রবেশের জন্য রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর ভ্লাদিভোস্টক অঞ্চল সব থেকে সুবিধাজনক জায়গা। তবে এই অনুপ্রবেশের আপাতত কোনো কারণ নেই, তেমন কোনো ইচ্ছাও নেই চীনের। তাছাড়া ইউক্রেন-সংকট ঘিরে রাশিয়ার ওপরে নানারকম পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ফলে, নিজেদের অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে চীনের সাথে বড় বড় অর্থনৈতিক চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে রাশিয়া। আর এসব চুক্তিতে চীনই বরং লাভজনক অবস্থায় আছে।

রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে উপকূলরেখা ধরে ক্রমে দক্ষিণে যেতে থাকলে চীনের হুয়াংহো নদী, পূর্ব চীন সাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগর। পূর্ব চীন সাগর চলে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে, দক্ষিণ চীন সাগর মিলিত হয়েছে ভারত মহাসাগরে। এসব অঞ্চলে আছে ব্যবসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চমৎকার সব বন্দর। উপকূল থেকে খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে গেলে রয়েছে বেশ কিছু ঝঞ্ঝাটময় দ্বীপাঞ্চল। তারই একটি হচ্ছে জাপান। জাপানের বিষয়ে একটু পরে আসা যাক।

ঘড়ির কাঁটা ধরে স্থলসীমান্ত বরাবর এগোতে থাকলে এর পরে আসবে ভিয়েতনাম, লাওস এবং বার্মা। বহু শতাব্দী ধরেই সীমানা নিয়ে ভিয়েতনামের সাথে চীনের বিরোধ চলছে। দুই দেশের সীমান্তে নানারকম প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও দক্ষিণ দিকে একটা জায়গা আছে যে অংশ দিয়ে সহজেই সেনা চলাচল সম্ভব। এই সুযোগেই খ্রিস্টপূর্ব ১১১ সাল থেকে ৯৩৮ সাল পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভিয়েতনামকে শোষণ করেছে চীন। ১৯৭৯ সালে সীমানা নিয়ে একটি ছোটখাটো যুদ্ধও হয়েছিল। তবে চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব বিবাদে জড়াতে অনাগ্রহী হতে শুরু করে ভিয়েতনাম। এর বদলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে খাতির জমানোর দিকে মন দিয়েছে। পাশাপাশি বেইজিংয়ের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যও তারা চেষ্টা চালাচ্ছে। চীন এবং ভিয়েতনামের রাজনৈতিক মতাদর্শ কাছাকাছি। তবে রাজনৈতিক মতাদর্শ এই দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। মূলত ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণেই তাদের

মধ্যে এই দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক। বেইজিং-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ভিয়েতনাম তেমন কোনো হুমকি হিসেবে গণ্য হয় না। তবে, তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলেও চাইলে এই হুমকি দমন করতে পারে তারা।

ভিয়েতনামের পর আলোচনায় আসবে লাওস। লাওসের সীমান্ত পাহাড় আর জঙ্গল দিয়ে পরিপূর্ণ। এই সীমান্ত বাণিজ্যপথ হিসেবে একেবারেই সুবিধাজনক নয়। সামরিক বাহিনীর জন্য তো এই এলাকা পার হওয়া আরো ঝামেলার। এখান থেকে পশ্চিমে মায়ানমারের দিকে এগোতে থাকলে পাহাড় আর জঙ্গল ক্রমেই পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। একদম পশ্চিমে পর্বতের উচ্চতা ২০,০০০ ফিট ছাড়িয়ে গেছে। এখান থেকে পার্বত্য অঞ্চল ধীরে ধীরে হিমালয়ে গিয়ে মিলেছে।

আর এখানেই আমরা পাই তিব্বতকে। তিব্বত চীনের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। হিমালয় পর্বতমালা পুরো চীন-ভারত সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। তারপরে নিচু হয়ে মিশেছে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণিতে। কারাকোরাম অঞ্চলে চীনের সীমান্ত আছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তানের সাথে। এই পার্বত্য সীমানাকে চীনের প্রাকৃতিক মহাপ্রাচীর বলা চলে। ভারতের দিক থেকে ভাবলে ভারতীয় মহাপ্রাচীরও বলা যায়। এই মহাপ্রাচীর পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দুই দেশ চীন ও ভারতকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

চীন ও ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক বিবাদ যে একদম নেই, তা নয়। একদিকে চীন অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করছে। অপরদিকে ভারতের দাবি হলো- তাদের আকসাই-চীন অঞ্চলকে দখল করে রেখেছে চীন। হিমালয় জুড়ে একে অপরের দিকে কামান তাক করে রাখলেও, দুই দেশই পরস্পরের সাথে অত্যন্ত সতর্ক আচরণ করে থাকে। ১৯৬২ সালের মতো বড় আকারের পার্বত্য যুদ্ধে আর জড়াতে চায় না তারা। এই দুই দেশের মধ্যে বিবাদ সদা চলমান থাকবে এবং সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করাই উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যায়, চীন আর ভারতের মধ্যে কখনোই তেমন কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। সামনের দিনগুলোতেও যে এই

অবস্থার পরিবর্তন হবে, এমনটা মনে হয় না। দুই দেশের মধ্যে সত্যিকারের সীমান্তপথ বলতে মূলত তিব্বত-ভারত সীমান্ত। আর এই কারণেই তিব্বতকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় চীন। কেন চায়? ভয়ের কারণে। ভয়ের কারণেই যুগে যুগে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। ভূ-রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা এটি।

চীন যদি তিব্বতকে নিয়ন্ত্রণে না নেয়, তাহলে ভারত নিশ্চয়ই বসে থাকবে না! তারা চেষ্টা করবে সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার। এতে করে ভারত কিছু কৌশলগত সুবিধা পেয়ে যাবে। তিব্বত মালভূমি চলে আসবে তাদের দখলে এবং খুব সহজেই তারা চীনের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবে। তাছাড়া চীনের প্রধান তিনটি নদী হুয়াংহো, ইয়াংসি এবং মেকংয়ের উৎসও তিব্বতে। তাই তিব্বতকে বলা হয় চীনের জলস্তম্ভ। আর এই সব কারণেই তিব্বতের অধিকার কোনোভাবেই হারাতে চায় না চীন।

ভারত চীনের এই পানির সরবরাহ বন্ধ করে দিতে "চায়" না কি "চায় না", সেটা মূল প্রশ্ন না। ব্যাপারটা হলো, ভারত চাইলেই এটা করতে সক্ষম। আর চীন এই কারণেই উদ্বিগ্ন। ঐতিহাসিকভাবেই চীন সবসময় ভারতের হাত থেকে নদীর উৎস রক্ষা করতে চেয়েছে। তিব্বতে চীনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং হান জনগোষ্ঠির অভিবাসনের বিরুদ্ধে অনেক জায়গা থেকেই প্রতিবাদ এসেছে। হলিউডের অভিনেতা রিচার্ড গিয়ার এবং 'ফ্রি তিব্বত' নামে একটি সংস্থা এই বিষয়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ করে চলেছে। দালাইলামা নিয়মিত আন্তর্জাতিক জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিব্বতের পক্ষে আছে দালাইলামা, তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও হলিউড তারকা। আর এদের বিপক্ষে আছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। তবে এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ আছে মাত্র একটি পক্ষেরই। আর সে পক্ষ হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

পশ্চিমারা যখন তিব্বত ইস্যু নিয়ে কথা বলে, অথবা রিচার্ড গিয়ার বা বারাক ওবামা যখন জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন, চীন খুবই বিরক্ত হয়। কিন্তু, এসব প্রতিবাদকে তারা বিপদ বা উদ্বেগের বিষয় হিসেবে ভাবে না। তাদের কাছে এসব স্রেফ বিরক্তিকর। এই বিষয়টিকে তারা মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার চেষ্টাও করে না। তারা এই বিষয়টিকে দেখে ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তার

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তারা মনে করে পশ্চিমারা চীনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে চায়। তবে চীনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা এত সহজ হবে না। এতদিনে তা হয়নি এবং খুব সহসা তা হবেও না। ভূ-প্রকৃতি আর ভূ-রাজনীতির কারণে তিব্বতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কোনো কারণ নেই চীনের কাছে। তারা এখন পৃথিবীর ছাদে দাঁড়িয়ে সেখানের জন্য নতুন নিয়ম তৈরিতে ব্যস্ত। ১৯৫০-এর দশকে চীনের কমিউনিস্ট সরকার তিব্বত পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ শুরু করে। এভাবে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংযুক্ত হয় প্রাচীন এই রাজ্যটি। তবে সেই রাস্তা এবং বর্তমান সময়ের রেলপথ ধরে হান জনগোষ্ঠী তিব্বতে ঢুকে পড়তে শুরু করে।

তিব্বতের দুর্গম বরফাচ্ছাদিত পাহাড় ও উপত্যকা চিরে রেলপথ বানানো একটা সময় অসম্ভব মনে করা হতো। এমনকি আল্পস পর্বতমালার ভেতর দিয়ে টানেল তৈরি করা ইউরোপের সেরা ইঞ্জিনিয়াররাও এটাকে অসম্ভব মনে করতেন। ১৯৮৮ সালে ভ্রমণ বিষয়ক লেখক পল থেরো তার "রাইডিং দ্যা আয়রন রুস্টার" বইতেও একই কথা বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "কুনলুন রেঞ্জ এই নিশ্চয়তা দেয় যে লাসায় কখনো রেলপথ যাবে না"। কুনলুন পর্বতমালা জিনজিয়াং প্রদেশ থেকে তিব্বতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আর এই বিষয়টিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পল থেরো লিখেছিলেন- "এটাই সম্ভবত ভালো হয়েছে। আমি এতদিন রেলপথকে খুবই পছন্দ করতাম। কিন্তু তারপরেই আমি তিব্বত দেখলাম, আর রেলপথের চাইতে প্রকৃতিই আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল।" তবে চীনারা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। হয়তো তাদের পক্ষেই শুধু কাজটি সম্ভব। ২০০৬ সালে তিব্বতের রাজধানী লাসায় এই রেলপথের উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও। এখন সাংহাই বা বেইজিং-এর মত অতি দূরের এলাকা থেকেও দৈনিক চারটি করে যাত্রীবাহী এবং মালবাহী ট্রেন লাসায় যাচ্ছে।

এই ট্রেনগুলোর মাধ্যমে চীন থেকে তিব্বতে আসে নানারকম নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। যেমন- কম্পিউটার, রঙিন টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। ট্রেনগুলোতে চড়ে আসে ট্যুরিস্টরা। আর এই ট্যুরিস্টদের কল্যাণে সমৃদ্ধ হচ্ছে তিব্বতের অর্থনীতি। রহস্যে ঘেরা প্রাচীন এই রাজ্যে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া

লেগেছে। জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতেও এসেছে বিপুল উন্নতি। পাশাপাশি তিব্বতে প্রস্তুতকৃত পণ্যও এখন বাইরের বিশ্বে যাবার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু, এসবের পাশাপাশি চীন থেকে তিব্বতে এসে ঘাঁটি গড়েছে কয়েক মিলিয়ন হান সেটেলার।

"ফ্রি তিব্বত" আন্দোলনের কর্মীদের মতে তিব্বতীরাই এখন এই অঞ্চলে সংখ্যালঘু। চীনা সরকার অবশ্য আলাদা হিসাব দিচ্ছে। তারা বলছে, তিব্বতের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষই তিব্বতি। উভয়পক্ষের বক্তব্যেই অতিরঞ্জন আছে। তবে, চীন সরকারের বক্তব্যে যে অতিরঞ্জনটা একটু বেশি, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। চীন থেকে অভিবাসী হয়ে যাওয়া হান জনগোষ্ঠীর অনেকেই কোনোরকম নাগরিকত্ব সনদ ছাড়াই তিব্বতে বাস করছে। চীন সরকার তাদেরকে হিসাবের মধ্যে ধরছে না। তাই সব মিলিয়ে চীনা আধিপত্য যে বেড়ে চলেছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেটাই বলা যায়।

এক সময় মাঞ্চুরিয়া, ইনার মঙ্গোলিয়া এবং জিনজিয়াং-এর বেশিরভাগ মানুষ ছিল জাতিগতভাবে মাঞ্চুরিয়ান, মঙ্গোলিয়ান ও উইঘুর। এখন প্রতিটি অঞ্চলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে চৈনিক হান জনগোষ্ঠীর মানুষ। তিব্বতের ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন! ফলে হান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে, বারবার দাঙ্গা হবে। ২০০৮ সালে দাঙ্গার সময় লাসায় হান জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক লুটপাট এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তিব্বতের প্রতিবাদকারীরা। এতে মারা যায় ২১ জন, আহত হয় শত শত মানুষ।

তিব্বতে রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়ন চলতেই থাকবে, স্বাধিকার আন্দোলন চলবে, সন্ন্যাসীরা গায়ে আগুন লাগিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাতে কিছুই বদলাবে না। চীন থেকে হানদের তিব্বতে এসে বসতি গড়া বন্ধ হবে না। এটাই তিব্বতের নিয়তি।

বিশাল জনসংখ্যার চাপে পিষ্ট চীন তার প্রাণকেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বিস্তৃত হতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। মার্কিনিরাও এই কাজটা করেছিল। তারা পশ্চিমে সীমানা বাড়িয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। ইউরোপীয়রা যেভাবে রেললাইন বসিয়ে কোমাঞ্চি আর নাভাহোদের ভূমি দখল করেছিল, সেভাবেই আধুনিক রেলপথ ধরে হানরা তিব্বতে অনুপ্রবেশ করতে থাকবে।

তিব্বত থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে যেতে যেতে পাওয়া যাবে পাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরগিজস্তানকে। এর মধ্যে কিরগিজস্তান পুরোটাই পার্বত্য এলাকা। এরপরে কাজাখস্তান সীমান্ত হয়ে উত্তরে আমরা আবার মঙ্গোলিয়াতেই ফিরে আসব। এই পথটিকে বিশেষভাবে খেয়াল করুন। এটাই হচ্ছে সেই প্রাচীন সিল্ক রুট। এই পথ ধরেই এশিয়ার সাথে বাকি বিশ্বের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পার্বত্যভূমি ও মরুভূমির মাঝ বরাবর একটা ফাঁকা এলাকা। তাত্ত্বিকভাবে এটা চীনের প্রতিরক্ষার জন্য কিছুটা দুর্বল জায়গা। কিন্তু এই এলাকাটা চীনের মূলভূমি থেকে বহুদূরে অবস্থিত। তাছাড়া কাজাখদের পক্ষে চীনের জন্য হুনকি হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। রাশিয়াও কয়েকশ মাইল দূরে।

কাজাখ সীমান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ। উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলটা আধা স্বায়ত্তশাসিত এবং রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল। উইঘুররা কথা বলে টার্কিশের কাছাকাছি একটা ভাষায়। জিনজিয়াং-এর সাথে আটটি দেশের সীমান্ত আছে- রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারত।

জিনজিয়াং সবসময়ই একটা বিরোধপূর্ণ এলাকা। ১৯৩০ আর ১৯৪০-এর দশকে উইঘুররা দুইবার "পূর্ব তূর্কিস্তান রাজ্য" নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল। তারা চোখের সামনে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের পতন হতে দেখেছে। পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী 'স্তান' দেশগুলোকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে দেখে তারাও উদ্দীপ্ত হয়। তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলনও তাদের মনোবল যুগিয়ে চলেছে। তারা আর চীনের অংশ হিসেবে থাকতে চায় না। এই অঞ্চলে জাতিগত বিদ্বেষ এবং দাঙ্গা চরমে ওঠে ২০০৯ সালে। এসময় ২০০ জনের বেশি নিহত হয়। বেইজিং এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানায় তিনভাবে। তারা নির্মমভাবে ভিন্নমতকে দমন করে, প্রচুর টাকা ঢালতে থাকে এবং গণহারে হান শ্রমিকদেরকে জিনজিয়াং প্রদেশে পাঠাতে থাকে। জিনজিয়াং চীনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, ফলে এখানে স্বাধীনতা আন্দোলন বাড়তে দেওয়া তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই প্রদেশের সাথে প্রতিবেশী আটটি দেশের সীমান্ত থাকায় মূলভূমির সাথে বাফার হিসেবে কাজ করছে এই অঞ্চলটি। আবার এখানে তেলও আছে। তাছাড়া এই এলাকা চীনের

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার মূল কেন্দ্র। চীনের নতুন অর্থনৈতিক নীতি "এক অঞ্চল, এক পথ"-এর জন্য এই এলাকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য পরিবহণের জন্য একটি নতুন মহাসড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করেছে চীন। একে বলা হচ্ছে "সিল্ক রোড অর্থনৈতিক অঞ্চল"। পুরাতন সিল্ক রুট ধরে জিনজিয়াং প্রদেশের মধ্য দিয়ে এই মহাসড়ক চলে গেছে দক্ষিণে পাকিস্তানের দিকে। পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের গোয়েদার-এ একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করছে চীন। ২০১৫ সালের শেষদিকে পাকিস্তানের কাছ থেকে ৪০ বছরের মেয়াদে বন্দরটি লিজ নিয়েছে তারা।

জিনজিয়াংয়ে একের পর এক শহর গজিয়ে উঠছে। চীনা সরকার সেখানে প্রচুর বিনিয়োগ করছে, গড়ে তুলছে শিল্প কারখানা। ফলে তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান। আর এই কাজের আকর্ষণেই এইসব শহরে বানের জলের মতো ঢুকে পড়ছে হানরা। জিনজিয়াংয়ের রাজধানী উরুমকি থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ৮৫ মাইল দূরে শেনজেই শহর। এই শহরের ৬,৫০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৬,২০,০০০ জনই হান জনগোষ্ঠীর। যদিও সরকারি হিসেবে সেখানে হান জনগোষ্ঠী আছে মাত্র ৪০ শতাংশ। এ তো গেল শেনজেই শহর। খোদ উরুমকিতেও হানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে মনে করা হয়। যদিও রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে সঠিক তথ্য কখনোই প্রকাশ করা হয় না।

উইঘুর জনগোষ্ঠীর মানুষ এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে এবং আন্দোলন করে যাচ্ছে। জার্মানিতে আছে বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেস । তুরস্কে চলছে "পূর্ব তুর্কস্তান স্বাধীনতা সংঘ"-এর কার্যক্রম। কিন্তু দালাইলামার মতো একজন নেতা তাদের নেই। দালাইলামার কারণে বিশ্ব তিব্বতের কথা জেনেছে। কিন্তু উইঘুরদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। চীনের নেতাদেরও চাওয়া হচ্ছে-পরিস্থিতি যেন এমনই থাকে। সীমানাঘেঁষা দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছে তারা। যেন স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করার মত পর্যাপ্ত রসদ এসব দেশ থেকে না আসতে পারে, বা মারের মুখে পিছিয়ে গিয়ে যেন এসব দেশে ঢুকে না পড়তে পারে উইঘুররা। উইঘুরের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদেরকে ইসলামপন্থী জঙ্গি হিসেবে দেখাতে চায় চীন। অবশ্য, তাজিকিস্তান থেকে আল কায়েদা বা অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠী উইঘুর

বিচ্ছিন্নতাবাদিদের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই আন্দোলন মূলত জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। জিনজিয়াংয়ের বিভিন্ন এলাকায় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও হানদের বিরুদ্ধে বন্দুক, বোমা এবং ছুরির মাধ্যমে আক্রমণ ঘটছে প্রায়ই। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সামনে এসব আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

২০১৬ সালের গোড়ার দিকে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারা জানান এই এলাকার উঠতি ইসলামপন্থী আন্দোলনকে তারা মৌলবাদ-বিরোধী কর্মকাণ্ড দিয়ে অনেকটাই দমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু, ২০১৫ সালে তুরস্কের সেনাবাহিনী জানিয়েছে তারা উইঘুর অঞ্চল থেকে আগত ৩২৪ জন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে সিরিয়া যাওয়ার পথে আটক করেছে। এতে চীনা কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের অসারতাই প্রকাশ পায়।

তিব্বতের মতো এই জিনজিয়াং অঞ্চলটাও চীন কোনোভাবেই ছাড়বে না। দুইটিই বাফার অঞ্চল। জিনজিয়াং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ। উভয় অঞ্চলই নতুন বাজারের সম্ভাবনা হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশটির সমৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে ক্রমাগতভাবে উৎপাদন ও বিপণন চালিয়ে যেতে হবে। জিনজিয়াংকে ছাড়লে চীনের ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে আর ব্যবসা না হলে কর্মসংস্থান কমে যাবে। তখন বেকারত্বের শঙ্কা প্রকট আকার ধারণ করবে। এর ফলে তৈরি হবে বিশাল এক সামাজিক সমস্যা। ফলে দেশের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ হুমকির মুখে পড়ে যাবে। চীনের সার্বভৌমত্ব নিয়েও শঙ্কা তৈরি হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি নানা কারণে দেশে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকার বিপক্ষে। যদি সবাইকে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে হান জনগোষ্ঠী বিপদে পড়ে যাবে। তাদের একতা বজায় রাখা কঠিন হবে। শহর এবং গ্রামের মধ্যে শুরু হবে সংঘাত। চীনের বাফার জোনে অবস্থিত অঞ্চলগুলোও এতে উৎসাহিত হবে। তারা মাঠে নেমে যাবে নানারকম দাবিদাওয়া নিয়ে। এতসব আন্দোলনের মুখে একতা বিনষ্ট হওয়ার পাশাপাশি দুর্বল হতে থাকবে বিশাল চীন। বহিঃশক্তি দ্বারা চীনের ধর্ষিত হওয়ার এক শতকও পার হয়নি। চীন সেই অবমাননা এবং অপমান এখনো ভোলেনি। তাই

সবকিছুর আগে একতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেন বেইজিংয়ের নীতিনির্ধারকেরা। গণতন্ত্রের মূলনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই।

সমাজ নিয়ে চীন আর পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। পশ্চিমারা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যতটা গুরুত্ব দেয়, চীন ততটা দেয় না। তাদের কাছে সামষ্টিক চেতনা গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য যদি একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা বা গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়, তো হোক। পশ্চিমারা যে তত্ত্বকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভাবে, চীনারা তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য হুমকি হিসেবে মনে করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো- চীনের অধিকাংশ জনসাধারণও তা মেনে নেয়। তাদের অনেকেই ভাবে একক ব্যক্তির চাইতে যৌথ পরিবারের গুরুত্ব অনেক বেশি।

একবার আমি এক চীনা রাষ্ট্রদূতকে লন্ডনের একটা নামী ফ্রেঞ্চ রেস্তোঁরায় নিয়ে যাই। ভেবেছিলাম রিচার্ড নিক্সনের প্রশ্ন "ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব কী"-এর জবাবে তাদের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এর বিখ্যাত উত্তরটা নিয়ে একটা জমজমাট আলোচনা হবে। নিক্সনের সেই প্রশ্নের জবাবে চীনা প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন "এটা বলার সময় এখনো আসেনি"। তবে ওই রাষ্ট্রদূত কিন্তু সে প্রসঙ্গে মুখ খুলতে আগ্রহী হলেন না। এর বদলে তিনি বিশাল একটা ভাষণ শুনিয়ে দিলেন। বললেন, পশ্চিমাদের মানবাধিকার আর ব্যক্তি স্বাধীনতা বিষয়ক মতবাদ যদি চীনে কার্যকর করতে যাওয়া হয়, কী ভয়ানক সহিংসতা শুরু হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না! আমাকে পাল্টা প্রশ্নও ছুড়ে দিলেন, "যে সংস্কৃতি তোমরা বুঝ না, সেখানে তোমাদের মতবাদ খাটবে বলে ভাবো কেন তোমরা?"

চীনে অন্তত এক প্রজন্ম ধরে জনগণ ও সরকারের মধ্যে একটা অদৃশ্য চুক্তি আছে। সেটা হলো- "তোমরা আমাদের আদেশ পালন করো, আমরা তোমাদের ভালো রাখব"। অর্থনীতি যতদিন বেগবান থাকবে, ততদিন হয়তো এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। কিন্তু উন্নয়ন ব্যাহত হলেই চাকা উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করবে। বর্তমান সময়ে দূর্নীতি ও অদক্ষতার বিরুদ্ধে যে পরিমাণে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে- তা প্রমাণ করে দিচ্ছে চুক্তি ভেস্তে গেলে কী হতে পারে।

চীনের অপর একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হলো বিশাল সংখ্যক মানুষকে খাদ্যের যোগান দেওয়া। চীনের কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, দেশটির আবাদযোগ্য ভূমির ৪০ শতাংশই বর্তমানে হয় দূষণের শিকার নয়তো অনুর্বর হয়ে পড়েছে। চীন পড়ে গেছে এক দুষ্টচক্রে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কলকারখানা দরকার। কিন্তু কলকারখানার দূষণের প্রভাবে খাদ্য উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান করা অতি জরুরি। নাহলে সংকট এড়ানো যাবে না।

চীনে এখন প্রতিদিন গড়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৫০০টির মত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়ে থাকে। যদি ক্ষুধা এবং বেকারত্ব বাড়তে থাকে, এই সমাবেশগুলো আর শান্তিপূর্ণ থাকবে না। বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়বে সারাদেশে এবং সহিংসতা বাড়তে থাকবে। চীনের মূল চালিকাশক্তি এর অর্থনীতি। বিশ্বের সাথে চীনের এক ধরনের চুক্তি আছে বলা যায়- "আমরা কম দামে জিনিস বানাব, তোমরা আমাদের কাছ থেকে কম দামে কিনবে"। তবে চিন্তার বিষয় হলো, চীনে শ্রমিকের মজুরি দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে পণ্যের দামের দিক থেকে চীনের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। শুধু উৎপাদন স্বল্পতার কারণে তারা চীনের থেকে পিছিয়ে আছে। কিন্তু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যদি চীন সহজে সংগ্রহ না করতে পারে তাহলে কি তারা ভবিষ্যতে এই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে? যদি তারা নৌ অবরোধের শিকার হয়, বা আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়, তখন কী হবে? এসব কারণেই চীনের নৌশক্তি বাড়ানো দরকার।

ঐতিহ্যগতভাবে চীনারা দক্ষ সমুদ্র অভিযাত্রী ছিল। বিশেষ করে পঞ্চদশ শতকে তারা ভারত মহাসাগর জুড়ে দাপিয়ে বেড়াত। অ্যাডমিরাল ঝেং এর নেতৃত্বে সাগরপথে আফ্রিকার কেনিয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছিল তারা। তবে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সমুদ্র ব্যবহার করেনি তারা। ক্ষমতা প্রদর্শন বা দেশ দখলের জন্য সমুদ্র পাড়ি দিতে তারা আগ্রহী ছিল না। তাছাড়া সামরিক কর্মকাণ্ডের সুবিধার জন্য দূরদেশে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করাও তাদের স্বভাবে নেই।

চার হাজার বছর ধরে ভূমিতে রাজত্ব করার পর চীন এখন মনোযোগ দিচ্ছে "নীল জল" বা গভীর সাগরের নৌবাহিনী গড়তে। এতদিন ধরে তাদের "সবুজ জল" বা উপকূলীয় সক্ষমতার নৌবাহিনীই মূলত সক্রিয় ছিল। সবুজ জলের নৌবাহিনী কাজ করে সমুদ্রসীমা রক্ষায়। নীল জলের নৌবাহিনী তাদের কার্যক্রম চালায় খোলা সমুদ্রে। বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা নৌশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হতে চীনের আরো তিন দশক লেগে যেতে পারে। কিন্তু সে তো দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। স্বল্প ও মাঝারি পাল্লায় তারা বর্তমানে নির্মাণ, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে ব্যস্ত। সেই সাথে সাগরে নিজেদের প্রতিপক্ষদের সাথে সামান্য টক্করও নিচ্ছে। এইসব টানাপোড়েন, বিশেষ করে মার্কিনিদের সাথে টক্কর নেওয়ার বিষয়টা চীন কীভাবে সামলাবে তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে আগামী শতকের ভূ-রাজনৈতিক ভবিষ্যত।

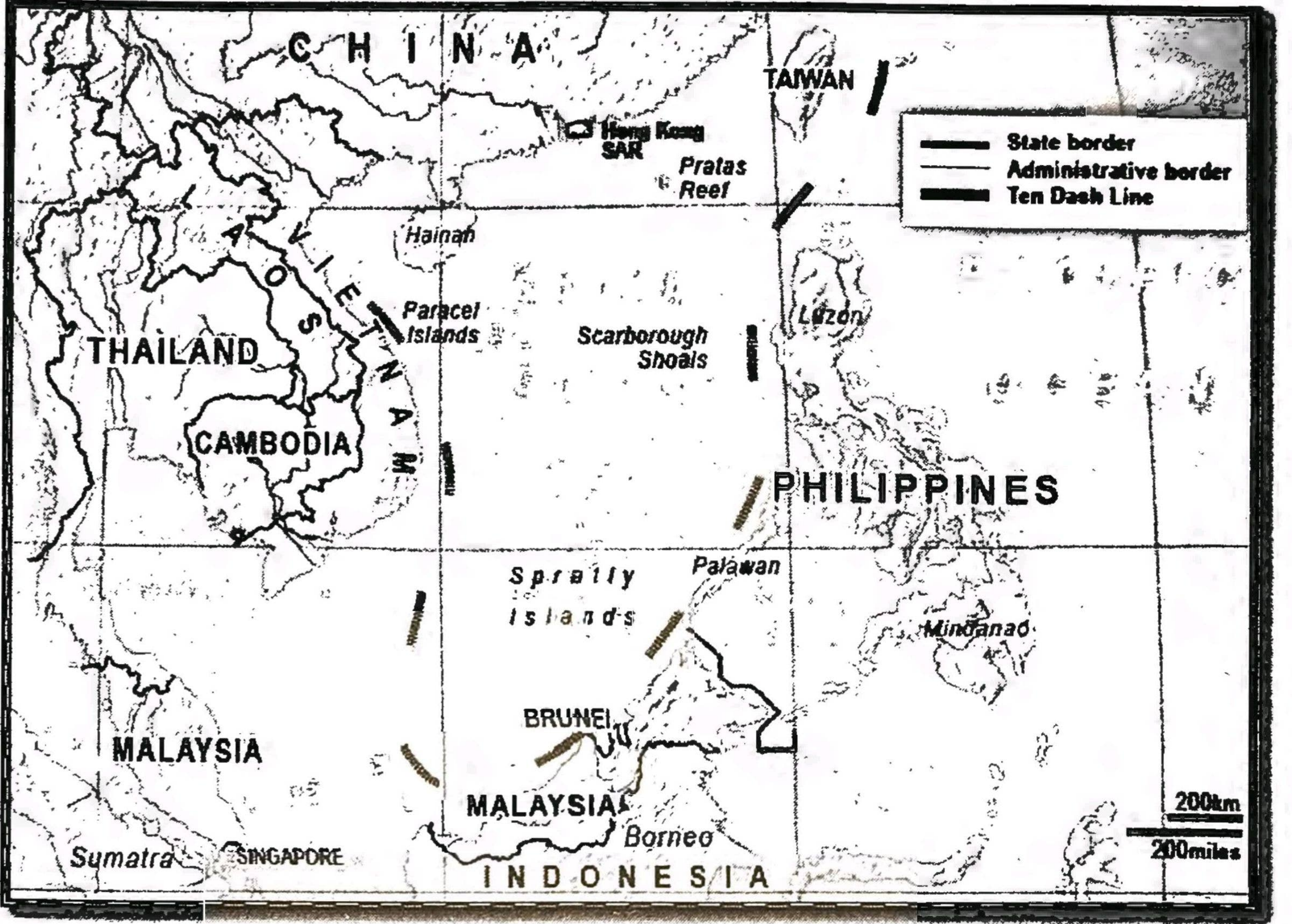
ইউক্রেনের কাছ থেকে কেনা পরিত্যক্ত একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার মেরামত করে চীনের তরুণ নাবিকেরা বর্তমানে প্রশিক্ষন নিচ্ছে। একদিন তাদের কেউ কেউ অ্যাডমিরাল পদবি পাবে। ততদিনে বারোটা জাহাজের বহর নিয়ে গভীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিশ্বের অপর পারে গিয়ে কীভাবে আবার ফিরে আসা যায় তা শিখে যাবে তারা। চলার পথে বাধাবিপত্তি অথবা বিরোধের মুখোমুখি হলে কীভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে তাও শিখে যাবে। যেভাবে ধনী আরব দেশগুলো এতদিনে বুঝে গেছে, শুধু টাকা দিয়ে দক্ষ একটা সেনাবাহিনী কেনা যায় না। এই অনুধাবন হওয়ার পর থেকে চীন ধীরে ধীরে উপকূলীয় অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নৌশক্তি বাড়িয়ে চলছে। এর মধ্যেই নিজেরা দুইটি এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার বানিয়েও ফেলেছে। যদিও এই দুইটির একটাও পরমাণুশক্তি চালিত না হওয়ায় সক্ষমতায় এখনো মার্কিন নৌবহরের ধারেকাছেও আসে না। কিন্তু, সাগরে চীনের শক্তি তো বাড়ছে।

নিজেদের সমুদ্রসীমা থেকে দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একের পর এক জাহাজ পাঠিয়ে চলেছে চীন। এভাবে চীন যখনই একটা নতুন জাহাজ পাঠাচ্ছে, মার্কিনিদের জন্য দুই চীন সাগরে জায়গা কিছুটা কমে যাচ্ছে। এভাবেই চীন তাদের নিজেদের এলাকার সাগরের আধিপত্য নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। অ্যামেরিকা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তারা এটাও

জানে, ভূমি থেকে ছোঁড়ার উপযোগী জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে চীন। ফলে একদিন হয়তো দক্ষিণ চীন সাগরে জাহাজ ঢোকানো নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেরকে। ভূমি থেকে জাহাজে আঘাত হানার ক্ষমতাসম্পন্ন দূরপাল্লার আর্টিলারি সিস্টেম ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে চীন। এর ফলে উপকূল প্রতিরক্ষায় অচিরেই জাহাজের আর তেমন কোনো ভূমিকা থাকবে না। ফলে চীনের যুদ্ধজাহাজগুলো তখন নিশ্চিন্তে নিজেদের সমুদ্রসীমা ছেড়ে দূর সাগরে বিচরণ করতে পারবে। এর একটা নমুনা ২০১৫ সালেই দেখা গেছে। সে বছর ৫টি চৈনিক যুদ্ধজাহাজ আলাস্কা উপকূলে মার্কিন সমুদ্রসীমায় চলে যায়। আর এই ঘটনা ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সফরের ঠিক আগমুহূর্তে। আর্কটিক সাগরে চৈনিক জাহাজ যাওয়ার দ্রুততম পথ হচ্ছে বেরিং প্রণালি। তাই ভবিষ্যতে আলাস্কা উপকূলে নিয়মিত চৈনিক যুদ্ধজাহাজ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর মধ্যে চীনের মহাশূন্য প্রকল্পও চলছে পুরোদমে। মার্কিনিরা কখন কী করছে, কোথায় যাচ্ছে সবই তাদের নজরে। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র রাষ্ট্রগুলোও এই নজরদারি থেকে মুক্ত নয়।

ঘড়ির কাঁটা ধরে চীনের গোটা স্থলসীমান্ত ঘুরে আসার পর আমরা এবার তাকাব পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরের দিকে। চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক মাঝখানে একটি দ্বীপপুঞ্জ আছে। বেইজিং এই দ্বীপপুঞ্জকে বলে "ফার্স্ট আইল্যান্ড চেইন"। এই দ্বীপপুঞ্জ চীনের দখলে। এছাড়াও দক্ষিণ চীন সাগরে রয়েছে "নাইন ড্যাশ লাইন"। ২০১৩ সালে তাইওয়ানকে এই অঞ্চলের অধিভূক্ত করে "টেন ড্যাশ লাইন" নামে ডাকছে চীন। আর এই পুরো দ্বীপাঞ্চলকে চীন নিজেদের সীমানায় বলে দাবি করে। এই অঞ্চলে অবস্থিত দুইশরও বেশি ছোট ছোট দ্বীপ এবং ডুবোপাহাড়ের মালিকানা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে চীনের বিরোধ চলছেই। এই অঞ্চলকে জাতির গর্ব বলে দাবি করলেও চীন মূলত চায় চেইন দ্বীপমালার মধ্য দিয়ে নৌযান চলাচলের পথ নিজেদের কবজায় রাখতে। ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে চিন্তা করলে এছাড়া চীনের আর কোনো উপায়ও নেই। দক্ষিণ চীন সাগরের এই অঞ্চলটি জাহাজ চলাচলের জন্য পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এমনিতে এই পথে চলাচলের জন্য অনেকগুলো চ্যানেল উন্মুক্ত আছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়

চ্যানেলগুলো আটকে দিয়ে চীনকে অবরুদ্ধ করে ফেলা সম্ভব। বড় বড় দেশগুলো শান্তির সময়টাতেও কেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে তার উত্তর এখান থেকে পাওয়া যায়।



চিত্র- দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে চীনের বিরোধ লেগেই আছে। এখানকার দ্বীপগুলোর মালিকানা, প্রাকৃতিক সম্পদ, এবং সাগর ও নৌপথের দখল নিজেদের হাতে রাখতেই এই বিরোধ।

প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের নির্বিঘ্ন প্রবেশের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে জাপান। প্রশান্ত মহাসাগরে যেতে হলে চৈনিক জাহাজগুলোকে পীত সাগর থেকে কোরিয়া উপদ্বীপ ঘুরে জাপান সাগর হয়ে হোক্কাইডোর উত্তরে লা পেরোজ প্রণালি ধরে এগোতে হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা হয় জাপানের, নয়তো রাশিয়ার সমুদ্রসীমার অন্তর্গত। সংকটের সময়ে এই জায়গাগুলোতে চীনের প্রবেশের সুযোগ থাকে না। এর পরেও যদি চৈনিক জাহাজ এই এলাকা পার হয়ে যায়, তাদেরকে হোক্কাইডোর উত্তর-পূর্ব দিকের কুরিল দ্বীপপুঞ্জের

মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই দ্বীপপুঞ্জকে জাপান নিজের বলে দাবি করলেও নিয়ন্ত্রণ করে মূলত রাশিয়া।

আরেকটি মনুষ্যবসতিহীন দ্বীপমালা নিয়ে চীন আর জাপানের মধ্যে বিরোধ চলমান রয়েছে। জাপান এটাকে বলে সেনকাকু, আর চীনে এটা দিয়ায়ু নামে পরিচিত। এই দ্বীপমালা তাইওয়ানের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক বিরোধগুলোর মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে তৈরি হওয়া সংকট প্রধানতম। এত ঝামেলা না করে চীন যদি সোজা পথে যেতে চায়, তাহলে সাংহাই থেকে পূর্ব চীন সাগর ধরে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করতে হবে। এর জন্য আবার পার হতে হবে রায়ুকু দ্বীপপুঞ্জ, যার মধ্যে পড়েছে ওকিনাওয়া। ওকিনাওয়াতে রয়েছে অ্যামেরিকান সামরিক ঘাঁটি। তাছাড়া ভূমি থেকে জাহাজে নিক্ষেপ করার জন্য অসংখ্য মিসাইলও প্রস্তুত রেখেছে জাপান। এই মিসাইলের মাধ্যমে জাপান চীনকে জানিয়ে দিচ্ছে “আমরা জানি যে তোমরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছ, তবে যাওয়ার পথে কোনো ঝামেলা করো না যেন”।

পূর্ব চীন সাগরের গ্যাসের মজুদ নিয়েও জাপানের সাথে বিরোধ আছে চীনের। বেইজিং এই সাগরের বেশিরভাগ অংশকেই “আকাশ প্রতিরক্ষা চিহ্নিতকরণ অঞ্চল” হিসেবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, এই জায়গা দিয়ে বিমান চালাতে হলে আগে থেকে চীনকে জানিয়ে রাখতে হবে। জাপান আর অ্যামেরিকা এই নিষেধাজ্ঞাকে নিয়মিত অগ্রাহ্য করে। কোনো একদিন হয়তো চীন এই বিষয় নিয়ে নিজের সুবিধামত একটা ঝামেলা তৈরি করবে। আবার সমন্বয়হীনতার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তা নিয়েও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে।

ওকিনাওয়ার দক্ষিণে আছে তাইওয়ান। তাইওয়ান চীনের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্ব চীন সাগর আর দক্ষিণ চীন সাগর আলাদা হয়েছে তাইওয়ানের মাধ্যমে। তাইওয়ানকে চীন তাদের তেইশতম প্রদেশ হিসেবে দাবি করে। কিন্তু দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ। ওয়াশিংটন বর্তমানে তাইওয়ানের নৌ ও বিমানবাহিনীকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রে সুসজ্জিত করে রেখেছে। সপ্তদশ শতকে তাইওয়ান চীনের কবজায় আসে। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে চীনের শাসনে এটি ছিল মাত্র পাঁচ বছর, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত।

তাইওয়ানের আনুষ্ঠানিক নাম “প্রজাতন্ত্রী চীন”। চীনের আনুষ্ঠানিক নাম “গণপ্রজাতন্ত্রী চীন” থেকে আলাদা থাকার লক্ষ্যেই এই নাম রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা একে অপরের ভূখণ্ডকে নিজের বলে দাবি করে যাচ্ছে। তাইওয়ানের আনুষ্ঠানিক নাম নিয়ে বেইজিং কোনো আপত্তি করে না। কিন্তু তাদেরকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকারও করে না। ১৯৭৯ সালে চীন যখন তাইওয়ানকে আক্রমণ করেছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “তাইওয়ান রিলেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৯” পাস করে। আর এই আইন মোতাবেক তারা চীনের আক্রমণ থেকে তাইওয়ানকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে তাইওয়ান যদি অফিসিয়ালি চীনের থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তাহলে চীন এটাকে যুদ্ধের ঘোষণা হিসেবে ধরবে। সেক্ষেত্রে আবার যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে রক্ষায় বাধ্য থাকবে না। কেননা, এই ধরনের ঘোষণা তাইওয়ানের তরফ থেকে উস্কানিমূলক আচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

দুই পক্ষের সরকারই নিজেদের দাবি নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি দেশের কাছে। তাইওয়ান চায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি। আর চীন লড়ছে তাইওয়ানকে নিজেদের অধিকারে রাখার স্বীকৃতি পেতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেইজিং জয়ী হয়েছে। ১৪০ কোটি মানুষের বিশাল বাজারের সাথে কি আর ২৩ লক্ষ মানুষের ছোট্ট বাজার পারে! বেশির ভাগ দেশই সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেয়নি। ২২টি দেশ অবশ্য তাইওয়ানের পক্ষে আছে। স্বল্পোন্নত এই দেশগুলোর মধ্যে আছে সোয়াজিল্যান্ড, বুর্কিনা ফাসো এবং সাও তোমে ও প্রিন্সিপ দ্বীপপুঞ্জে। এই স্বীকৃতি প্রদানের পুরস্কারও তাইওয়ানের কাছ থেকে তারা বেশ ভালোভাবেই পেয়েছে। তাইওয়ানকে দখল করতে চীন বদ্ধপরিকর। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সামরিক শক্তি খাটানোর সামর্থ্য তাদের এখনো আসেনি। তাই সহিংস পথে না গিয়ে তারা তাইওয়ানের সাথে অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে ভ্রমণপিপাসুদের যাতায়াতও বেড়েছে।

২০১৪ সালে হংকংয়ে ছাত্র আন্দোলনের সময় চীন কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ওপর কঠোর হয়নি। অথচ এর আগে উরুমকিতে এমন পরিস্থিতিতে তারা চরমপন্থা অবলম্বন করেছিল। এর কারণ, উরুমকির ঘটনা বহির্বিশ্বে প্রচারিত

হওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু হংকংয়ে প্রস্তুত ছিল শত শত ক্যামেরা। সহিংসতা ঘটলে তা মুহূর্তের মধ্যেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল সাংবাদিকেরা। চীনে হয়তো এইসব ফুটেজ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা যেত। কিন্তু তাইওয়ানের মানুষ বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষ সবই দেখতে পেত। ফলে চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা কতটা সমীচীন- এই নিয়ে তারা দ্বিধায় পড়ে যেত। দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কথা চিন্তা করেই চীনা কর্তৃপক্ষ সহিংসতার পথে যায়নি।

তাইওয়ানকে নিয়ে চীনের এই আলতো-শক্তি নীতির মর্মার্থ হচ্ছে সেখানকার মানুষকে এটা বুঝানো যে- 'মাতৃভূমি'র সাথে আবার যুক্ত হওয়াতে ভয়ের কিছু নেই। তারা নিরাপদেই থাকবে। বিমান প্রতিরক্ষা চিহ্নিতকরণ অঞ্চল ঘোষণা দেওয়া, বা মার্কিন জাহাজের পাশে চৈনিক সাবমেরিনের মাথাচাড়া দেওয়া বা নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করাটা চীনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব খর্ব করা। চীনের উপকূল থেকে তাইওয়ান মাত্র ১৪০ মাইল দূরে। অপরদিকে তাইওয়ান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের দূরত্ব ৬৪০০ মাইল। ফলে চীনের নৌশক্তি বাড়লে ওয়াশিংটন এই অঞ্চলে কিছুটা সমস্যায় তো পড়বেই।

দক্ষিণ চীন সাগর থেকে বেরিয়ে ভারত মহাসাগরে যাক আর প্রশান্ত মহাসাগরেই যাক, চৈনিক জাহাজকে সমস্যায় পড়তেই হয়। এই দুই পথ দিয়েই বহির্বিশ্ব থেকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস চীনে আসে। এই জ্বালানি ছাড়া চীন মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। পশ্চিম দিকে গিয়ে গালফ অঞ্চলগুলো থেকে জ্বালানি কিনতে গেলে ভিয়েতনাম পার হতে হবে। ভিয়েতনামের সাথে আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের বেশ দহরম মহরম চলছে। ভিয়েতনাম পার হলে আবার ফিলিপিনকে অতিক্রম করতে হবে, তারাও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। মালাক্কা প্রণালিতে যাওয়ার আগে পথে পড়বে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া। এই দেশগুলোও কুটনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। মালাক্কা প্রণালি প্রায় ৫০০ মাইল দীর্ঘ, আর এর সব থেকে সরু অংশ প্রস্থে মাত্র ২ মাইল। পৃথিবীর অন্যতম সরু এই প্রণালি দিয়ে বৈরী পরিস্থিতিতে জাহাজ

চালাতে গেলে প্রতিপক্ষ চাইলে খুব সহজেই আটকে দিতে পারবে। তাই এই পথ চীনের জন্য সবসময়ই বিপজ্জনক।

মালাক্কা প্রণালির আশেপাশের দেশগুলো চীনের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে শঙ্কিত। এদের বেশিরভাগের সাথেই বেইজিংয়ের আঞ্চলিক বিরোধ রয়েছে। চীন মনে করে দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় পুরোটাই তাদের এবং এই সাগরের বুকে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, সেগুলোর অধিকারও শুধু তাদেরই। ওদিকে এই অঞ্চলের নানা অংশের অধিকার নিয়ে মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন এবং ব্রুনেইয়ের নিজেদের মধ্যে এবং চীনের সাথে বিরোধ আছে। যেমন, দক্ষিণ চীন সাগরের একটা বৃহৎ প্রবাল দ্বীপ হলো মিসচিফ দ্বীপ। এটি নিয়ে ফিলিপাইন এবং চীনের মধ্যে বিরোধ লেগে আছে। এখন পর্যন্ত এই নিয়ে বড় কিছু ঘটেনি, কিন্তু একসময় যে ঘটবে না, তা বলা যায় না। দক্ষিণ চীন সাগরে এরকম হাজার হাজার প্রবাল দ্বীপ এবং দ্বীপপুঞ্জ আছে। এর প্রতিটাই বিবাদের উৎস। এমনকি সাগরের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ানো পাথরের সারিও কূটনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব জায়গার আশপাশে মাছ ধরার অধিকার নিয়ে বিবাদ আছে, সাগর তলে খনিজ অনুসন্ধানের স্বত্ব নিয়ে বিবাদ আছে, বিবাদ আছে সার্বভৌমত্ব নিয়েও।

নিজেদের লক্ষ্যে আরো এগিয়ে যেতে বিবাদপূর্ণ এই এলাকায় ড্রেজিং এবং ভূমি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে চীন। এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা এই এলাকার বেশকিছু এটল (Atoll) এবং রিফকে দ্বীপে পরিণত করেছে। উদাহরণ হিসেবে স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জের ফিয়েরি ক্রস রিফ-এর কথা বলা যায়। এটি বর্তমানে একটি পরিপূর্ণ দ্বীপ। এখানে একটি বন্দর এবং জেট বিমান উড্ডয়নসক্ষম একটি রানওয়ে নির্মাণ করেছে চীন। এর ফলে এই এলাকার আকাশসীমায় আগের তুলনার বেশি নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছে তারা।

২০১৫ সালের গ্রীষ্মে এই বিষয় নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, "শুধু একটা ডুবো পাথরকে বিমান বন্দরে রূপান্তর করলেই একটা জায়গার ওপর সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিমান বা জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করারও অধিকার মেলে না"। চীন

নিজেদের সামরিক বাহিনীকে প্রতিরক্ষামূলক শক্তি থেকে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণমূলক শক্তিতে রূপান্তরের ঘোষণা দেওয়ার কদিন পরেই তিনি বক্তব্যটি দেন। চীনের এই নীতি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে- তারা এই অঞ্চলের নীতি-নির্ধারক মোড়ল হয়ে উঠতে চাইছে। আর এই লক্ষ্যে প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা এবং হুমকি উভয় পদ্ধতিই তারা ব্যবহার করবে।

দক্ষিণ চীন সাগরে নিজেদের জন্য পরিপূর্ণ নিরাপত্তা চীনকে নিশ্চিত করতেই হবে। নির্বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও জ্বালানি সরবরাহ পাওয়া এবং দেশে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারার নিশ্চয়তা পেতে এই সাগরে তাদের দরকার নির্বিঘ্ন যাতায়াতের সুযোগ। অবরোধে পড়ে অর্থনৈতিক ক্ষতির মোকাবেলা করার সামর্থ্যও নেই তাদের। এই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড, আর অন্য উপায়টি হলো নিজেদের নৌশক্তিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা। কিন্তু সব থেকে নির্বিঘ্ন উপায় হচ্ছে পাইপলাইন, রাস্তাঘাট এবং বন্দর নির্মাণ। আর চীন এই তিনটি পদ্ধতিই ব্যবহার করছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দূরে সরানোর জন্য প্রলোভন এবং হুমকি- এই দুই ধরনের কুটনৈতিক নীতিই অবলম্বন করবে চীন। চীন যদি বেশি কঠোর হয়, তাহলে এই দেশগুলো নিরাপত্তার জন্য ওয়াশিংটনের দ্বারস্থ হবে। আর বেশি প্রলোভন দেখালে বেইজিংকেই উল্টো পেয়ে বসবে। তাই এই মিশ্র নীতি। তবে এই মুহূর্তে দেশগুলো নিরাপত্তার জন্য ওয়াশিংটনের দিকেই ঝুঁকছে বেশি।

বর্তমানে এই অঞ্চলের যেসব ম্যাপ চীন ছাপে, তাতে দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় পুরোটাই নিজেদের অংশ হিসেবে দেখায়। এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তাদের অভিপ্রায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি তারা আগ্রাসী ভঙ্গিমায় নৌ টহল এবং সরকারি বিবৃতিও জারি রেখেছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনার ধরনটাও বদলে দিতে চাইছে চীন। আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে ক্রমাগতভাবে নিজেদের এজেন্ডা চাপিয়ে দিচ্ছে তারা। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ পিছু না হটবে, ততক্ষণ তারা এসব চালিয়েই যাবে। কিন্তু এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জলসীমা এবং শান্তিকালীন সময়ে উন্মুক্ত নৌ চলাচলের নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাই অন্য পরাশক্তিগুলো এত সহজে ছাড় দেবে না চীনকে।

ভূ-রাজনীতি বিষয়ক লেখক রবার্ট ক্যাপলানের মতে বিংশ শতকের শুরুর দিকে ক্যারিবিয়ান অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একবিংশ শতকের চীনের কাছে দক্ষিণ চীন সাগর ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। সেসময় অ্যামেরিকা প্রথমে বিশাল স্থলসীমা অধিকার করে করে প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগরের পরাশক্তি হয়ে ওঠে। এরপর তারা কিউবা থেকে স্প্যানিশদের তাড়িয়ে দেয়।

প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরে এই কাজটাই করতে চাইছে চীন। তারাও দুই মহাসাগরের পরাশক্তি হতে চায়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চীন এখন বার্মা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এসব বিনিয়োগের মাধ্যমে এই দেশগুলোর সাথে চীনের উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে চীনের নৌবাহিনী এসব বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সমুদ্রসীমায় বিচরণ করতে পারবে, এমনকি চাইলে অবস্থানও করতে পারবে। সেইসাথে বাণিজ্যের সম্ভাবনা তো থাকছেই।

চীনের ভবিষ্যত সুরক্ষিত রাখার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হচ্ছে ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের বন্দরগুলো। পাকিস্তানের গোয়েদার-এ গভীর সমুদ্র বন্দর লিজ নেওয়ার মাধ্যমে পাকিস্থান থেকে চীন পর্যন্ত একটা বিকল্প স্থলপথ তৈরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ যদি শান্ত থাকে তাহলে এই বন্দর ভবিষ্যতে চীনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এদিকে মায়ানমারের পশ্চিম উপকূল থেকে চীন পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল বহন করা হবে। এর ফলে জ্বালানি বহনের জন্য মালাক্কা প্রণালির ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবে তারা। বর্তমানে মালাক্কা প্রণালি ধরেই চীনের ৮০ শতাংশ তেল আর গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে। বিবাদপূর্ণ এই অঞ্চলের একটা ভালো বিকল্প তাদের দরকার ছিল।

২০১০ সালে বার্মার সামরিক জান্তা যখন ধীরে ধীরে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ শুরু করে, তখন সম্পর্ক স্থাপনের দৌড়ে চীন একা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানও দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে

আসে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে নিজেরাই মায়ানমার গিয়ে শুভেচ্ছা জানান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন; মায়ানমারকে নিজেদের পকেটে রাখতে পারলে চীনকে প্রতিহত করা যাবে। যদিও এখন পর্যন্ত এই বৈশ্বিক দাবাখেলায় চীনই এগিয়ে আছে, তবে ভবিষ্যতে ওয়াশিংটন চীনকে পেছনে ফেলে দিতেও পারে। বার্মিজ সরকারের সাথে থাকার আস্থা বজায় রেখে যেতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের সফল হওয়ার সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আফ্রিকা মহাদেশেও প্রচুর বিনিয়োগ করে চলেছে চীন। কেনিয়াতে বন্দর বানিয়েছে, অ্যাঙ্গোলায় বানিয়েছে রেললাইন, আর ইথিওপিয়াতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বাঁধ। খনিজ সম্পদ এবং মূল্যবান ধাতুর জন্য গোটা আফ্রিকা চষে ফেলছে তারা।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে চীনের কোম্পানিগুলো। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চীনের কর্মীরা। ধীরে ধীরে তাদের পিছুপিছু চীনের সামরিক বাহিনীও পৌঁছাবে। শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে দায়িত্বও বেড়ে যায়। আশেপাশের সাগর পথে মার্কিন খবরদারি চীন একেবারেই বরদাস্ত করবে না। আবার অনেকসময় নিজের দেশের বাইরেও তাদের সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চীনা কর্মীরা সন্ত্রাসী হামলা অথবা অপহরণের কবলে পড়তে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও সৃষ্টি হতে পারে সংকটময় পরিস্থিতি। এসব পরিস্থিত মোকাবেলায় চীনকে ব্যবস্থা নিতেই হবে। আর এই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন হবে। তা সম্ভব না হলেও, অন্তত বিভিন্ন অঞ্চল নির্বিঘ্নে অতিক্রম করার জন্য নানা দেশের সাথে চুক্তি করতে হবে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি চীনা কর্মী। আফ্রিকার অনেক জায়গায় বিশাল বিশাল হাউজিং কমপ্লেক্সে বাস করছে তারা। তাই বৈরী পরিস্থিতির জন্য চীনকে প্রস্তুত থাকতেই হবে।

ক্ষিপ্রতা অর্জনের জন্য আগামী এক দশক জুড়ে চীনকে সংগ্রাম করতে হবে। সিচুয়ান প্রদেশে ২০০৮ সালে ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের সময় তারা এই বাস্তবতাটা বুঝেছে। ভূমিকম্পের পরে সহায়তার জন্য সামরিক সরঞ্জাম সেখানে নিয়ে যেতে নাকানিচুবানি খেতে হয়েছে তাদের। সেনাবাহিনী

সেখানে খুব দ্রুত পৌঁছে গেলেও তাদের ভারী ভারী সরঞ্জাম পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। বিশাল বহর নিয়ে দ্রুত অন্য দেশে পৌঁছানো আরো বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এই সমস্যারও সমাধান চীন হয়তো করে ফেলবে।

অন্যান্য দেশের সাথে লেনদেনের সময় মানবাধিকার নিয়ে একদমই মাথা ঘামায় না চীন। তারা তাদের নিজের সীমানার মধ্যে একদম নিরাপদ। বর্তমান সময়ে এসে আত্মবিশ্বাসের সাথে তারা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করছে। বাড়িয়ে চলছে তাদের কার্যক্রমের সীমানা। জাপান অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বড় কোনো সংঘাত এড়াতে পারলে, চীনের জন্য সব থেকে বড় হুমকি হিসেবে থাকে চীন নিজেই।

চীন সফল হলে এর পেছনে থাকবে ১৪০ কোটি কারণ। যুক্তরাষ্ট্রকে ডিঙিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম পরাশক্তি না হতে পারলেও তার পিছনে থাকবে ১৪০ কোটি কারণ। ত্রিশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া গ্রেট ডিপ্রেশনের মতো অর্থনৈতিক মন্দা যদি চীনে আসে, তাহলে তারা কয়েক দশক পিছিয়ে যাবে। বৈশ্বিক অর্থনীতির পাকচক্রে চীন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আমরা যদি তাদের পণ্য না কিনি, তারা উৎপাদন করবে না। আর যদি উৎপাদন না হয়, চীনে দেখা দেবে গণ-বেকারত্ব। জনাকীর্ণ শহরগুলোতে যদি দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তৈরি হবে সামাজিক অস্থিরতা এবং বিক্ষোভ। আর সেই বিক্ষোভের মাত্রা হবে আধুনিক চীনের আর সবকিছুর মতোই বিশাল আকারের, যা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও দেখা যায়নি।

অধ্যায় তিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র



"পত্রিকায় আমার মৃত্যু সংবাদগুলোতে অনেক বেশি রং চড়ানো হয়েছে"

- মার্ক টোয়েন



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

লোকেশন, লোকেশন, লোকেশন। আজকের পৃথিবীতে লোকেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি লটারিতে জয়ী হওয়ার পর যদি অন্য কোনো দেশে জায়গা কিনে বসবাস করতে চান, তাহলে রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা আপনাকে প্রথম যে দেশটি দেখাবে, তা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওপরে মার্ক টোয়েনের মৃত্যু নিয়ে একটি উক্তি দেওয়া হয়েছে। একবার মার্ক টোয়েনের মৃত্যু নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পরে, আর বিভিন্ন পত্রিকা অতিরিক্ত রঙ-চড়িয়ে সেগুলো প্রকাশও করে। ঠিক তেমনি, ইতিহাসে অনেকবারই যুক্তরাষ্ট্রের পতন নিয়ে মিডিয়া অনেক অতিরঞ্জিত রিপোর্ট করেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অবস্থা একদমই আলাদা।

প্রকৃতপক্ষে, অ্যামেরিকা দেশটির অবস্থান খুবই চমৎকার একটা জায়গায়। দেশটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে পরিপূর্ণ। পানির অভাব নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। চারপাশের প্রতিবেশীরাও খুবই ভালো, কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু বসবাসের জন্য চমৎকার এই জায়গাটিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করলে এর কদর কমে যাবে। বিশেষ করে এই দেশের বাসিন্দারা যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে বা ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রায় ভাড়া পরিশোধ করে, তখন অনেক সমস্যা দেখা দেবে। তবে এই দেশের নাগরিকরা যদি একটি পরিবার হিসাবে বাস করতে চায়, আর সেই পরিবারের মধ্যে যদি একতা থাকে, তাহলে এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ৫০। এই অঙ্গরাজ্যগুলো সবাই মিলেমিশে যেভাবে এক দেশ হয়ে আছে, তার নজির বড় একটা দেখা যায় না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধিভুক্ত ২৮টি সার্বভৌম দেশের মধ্যে এরকম একতা নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা

অনেক বেশি। তাদের জাত্যাভিমান প্রবল। একজন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক প্রথমত নিজেকে ফ্রেঞ্চ বলাটাই শ্রেয় মনে করেন, তারপরে তিনি নিজেকে একজন ইউরোপীয় ভাবেন। সংযুক্ত ইউরোপের প্রতি তার কোনো আনুগত্য নেই। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপারটা সেরকম না। একজন ব্যক্তি ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া বা ওয়াশিংটন যে অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীই হন না কেন নিজেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেই ভাবেন। খুব কম ইউরোপীয় নাগরিকের মধ্যে এমন অনুভূতির দেখা মেলে। দেশটির ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণেই এই একতা তৈরি হয়েছে। রাজ্যগুলোর একত্রীকরণের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে এর ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। এই অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত বিশাল এই ভূখণ্ডকে এক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট কসরৎ করতে হয়েছে।

দেশটিকে মোটা দাগে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে আসা যাক পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের কথায়। আটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে পশ্চিমে আপালাচিয়ান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে জালের মত বিছিয়ে আছে অসংখ্য নদীপথ। নদীবিধৌত এই অঞ্চলের ভূমিও যথেষ্ট উর্বর। আপালাচান পেরিয়ে পশ্চিমে গেলে পাওয়া যাবে দূর পশ্চিমের রকি পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। আর এই অঞ্চলেই আমরা পাবো মিসিসিপি নদী অববাহিকা। অসংখ্য উপনদী এই অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিসিসিপি নদীতে এসে মিলেছে। আর মিসিসিপি দক্ষিণে গিয়ে মিলিত হয়েছে মেক্সিকো উপসাগরের সাথে। পূর্ব দিকে এই উপসাগরের মুখে প্রহরী হয়ে আছে ফ্লোরিডা উপদ্বীপ এবং একসারি ছোট ছোট দ্বীপ। বিশাল রকি পর্বতমালা পার হওয়ার পরে পাওয়া যাবে মরুভূমি এবং সিয়েরা নেভাদা পার্বত্য অঞ্চল। এর পরে কিছুদূর পর্যন্ত উপকূলীয় সমভূমি পেরিয়ে একদম পশ্চিমে দেখা হবে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে। একদম উত্তরে বিশাল বিশাল হ্রদ পার হলে সামনে পড়বে "কানাডিয়ান শিল্ড"। এই কানাডিয়ান শিল্ড হলো পৃথিবীর সব থেকে বড় প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পাথর দিয়ে গঠিত এলাকা। এই পাথরগুলো তৈরি হয়েছিল ক্যাম্ব্রিয়ান যুগেরও আগে, অর্থাৎ এগুলোর বয়স ৫০ কোটি বছর থেকেও অনেক বেশি! এই পাথুরে অঞ্চল মানুষের বসবাসের একেবারেই অনুপযুক্ত। আর দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল প্রায় পুরোটাই মরুভূমি।

ভূগোল খুবই অদ্ভুতভাবে এই অঞ্চলটিকে সাজিয়েছে। ইউরোপ-এশিয়া আর অ্যামেরিকার মধ্যে রয়েছে বিশাল বিশাল দুই মহাসাগর। কোনো রাজনৈতিক শক্তি অ্যামেরিকার এই বিস্তৃত ভূমি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সে পরাশক্তি হয়ে উঠবে। আর এই এলাকায় কেউ পরাশক্তি হয়ে উঠলে তাকে আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা এমন দেখেছি। বিশালতা রাশিয়ার প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিরক্ষাবাহিনী চাইলেই পিছু হটে দেশের একদম গভীরে চলে যেতে পারে। কানাডা এবং মেক্সিকোর বিশাল আকারও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষা-সুবিধা দিয়েছে। এই দুই দেশের মধ্য দিয়ে আক্রমণ করতে হলে প্রয়োজন হবে বিশাল লম্বা রসদ সরবরাহের লাইন।

এর বাইরেও আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আধুনিক এই সময়ে কেউ যদি বোকার মত যুক্তরাষ্ট্রে হানা দিয়েও বসে তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে দেশটির নাগরিকদের নাগালের মধ্যে থাকা কোটি কোটি আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে। আর এই দেশের নাগরিকেরা নিজেদের জীবন, স্বাধীনতা এবং আনন্দকে অসম্ভব গুরুত্ব দেয়। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ছাড়াও এই দেশে আছে ন্যাশনাল গার্ড, রাজ্যকেন্দ্রিক ও নগরকেন্দ্রিক পুলিশ বাহিনী। প্রয়োজনের মুহূর্তে তারাও বিকল্প সামরিক বাহিনী হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বহিঃশক্তির আক্রমণের মুখে এদেশের ফলসাম, ফেয়ারফ্যাক্স বা ফার্মারভিলের মত ছোট ছোট শহরগুলো হয়ে উঠতে পারে প্রতিরোধ-ঘাঁটি। যেমনটি হয়েছিল ২০০৪ সালে ইরাকের ফাল্লুজা শহরে।

কিন্তু এরকম ভৌগোলিক অবস্থান কায়েম করে প্রথাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে চাইলে আগে এই পুরো এলাকা অধিগ্রহণ করে একীভূত করতে হবে। এই মহাদেশের দুই দিকে দুই মহাসাগর। একদিকের তীর থেকে অপরটির দূরত্ব ৩০০০ মাইলেরও বেশি। আর এই দেশটি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে এই বিশাল এলাকা করায়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউরোপীয়রা এই অঞ্চলে আসে সতেরো শতকের শুরুর দিকে। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই মহাদেশের পূর্ব উপকূলে পৌঁছে তারা দেখল- জায়গাটা বন্দর স্থাপনের জন্য চমৎকার, জমিও খুবই উর্বর। তারা ভাবলো

নিজের দেশের চাইতে এখানেই বরং বেশি সুখে শান্তিতে থাকা যাবে। মুক্তভাবে থাকা যাবে নিজেদের দেশের কট্টর আইন-কানুনের বেড়াজাল থেকে। তবে আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করার তেমন কোনো ইচ্ছা প্রথম দিকের এইসব বসতি স্থাপনকারীদের ছিল না। এসব ঘটেছে আরো অনেক পরে। আসলে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণেই দলে দলে লোক ইউরোপ থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে হাজির হতে থাকে। তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে।

আটলান্টিকের তীরে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশরা মোট ১৩ টা কলোনি স্থাপন করেছিল। এই কলোনিগুলো "থার্টিন অরিজিনাল কলোনি" নামে পরিচিত। এই ১৩টি বসতির সর্বশেষটি স্থাপিত হয় ১৭৩২ সালে, জর্জিয়ায়। বসতিগুলোর পূর্ব দিকে ছিল আটলান্টিক মহাসাগর আর পশ্চিমে আপালাচান পর্বতমালা। ১৫০০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত এই পর্বতমালা রকির মতো অত উঁচু না হলেও পশ্চিমে যাওয়ার পথে বেশ বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া প্রথম দিকে বসতি স্থাপনকারীরা নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করা এলাকায় স্থায়ী হয়ে নিজেদের প্রশাসন তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। তার ওপরে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক বিধিনিষেধ। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ছিল আপালাচানের পশ্চিমে বসতি স্থাপনের ঘোরতর বিরোধী। বাণিজ্য এবং রাজস্বের হিসাবটা পূর্ব উপকূলীয় এলাকার মধ্যে থাকাটাই ব্রিটিশদের জন্য ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু ব্রিটিশদের খবরদারি তারা আর মানতে চাইছিল না। বসতিগুলো গড়ে উঠেছিল বিচ্ছিন্নভাবে, উত্তরের ম্যাসাচুসেটস থেকে দক্ষিণের জর্জিয়া পর্যন্ত প্রায় ১০০০ মাইল এলাকা জুড়ে। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৭৭৫-১৭৮৩) আগের বছরগুলোতে কলোনিগুলো স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে থাকে। ব্রিটিশ শাসন তাদের আর ভালো লাগছিল না। তারা একটা পর্যায়ে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করে। আর এভাবেই অ্যামেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সূচনা হয়। সে-সময় সবগুলো বসতি মিলে আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ২৫ লাখের মত।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখা হয় ১৭৭৬ সালে। সেই ঘোষণাপত্রে সময় এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ব্যতীত আর কোনো

পথ খোলা নেই বলে দাবি করা হয়। সেখানে মানুষের সমতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় (তবে দাসদের ব্যাপারটা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়)। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা যুদ্ধ বেগবান হয়। আর এর ফলে জন্ম হয় একটি নতুন জাতিরাষ্ট্রের।

তবে নতুন এই দেশের নেতারা ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকেও এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখতেন না। প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান সম্পর্কেও কার্যত কোনো ধারণা ছিল না তাদের। তারা জানতেন না যে তাদের অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে। কিছু দুঃসাহসিক অভিযাত্রী অবশ্য ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে আপালাচান পার হয়ে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা আশা করেছিল এই নদী ধরে এগোলেই তারা প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছাতে পারবে। আর সেই সাথে পাওয়া যাবে বিস্তীর্ণ বাসযোগ্য এলাকা। আসলে সে সময় পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর-সংক্রান্ত তথ্য স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ছাড়া কার্যত আর কারো কাছেই তেমন ছিল না। প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী এলাকা (বর্তমানের ক্যালিফোর্নিয়া) ছিল স্প্যানিশদেরই দখলে। সেইসাথে তাদের দখলে ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের বিশাল এলাকা (বর্তমানের টেক্সাস)।

এই সময়টায় যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে খুব ভালো ছিল, তা বলা যাবে না। তৎকালীন সীমানার মধ্যে আটকে থাকলে পরাশক্তি হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যেত। সে সময় আপালাচান পর্বতমালার পশ্চিমে ওহাইও নদী ধরে মিসিসিপি নদীর পূর্ব পার পর্যন্ত তারা যেতে পারত সহজেই। কিন্তু এই নদীর পশ্চিম তীর ছিল আবার ফরাসিদের দখলে। একদম দক্ষিণের বন্দর নগরী নিউ অরলিন্স পর্যন্ত পুরো এলাকা তখন ফরাসিদের আওতাধীন। ফলে মেক্সিকো উপসাগর হয়ে ইউরোপমুখী মার্কিন বাণিজ্য পুরোপুরি ছিল ফরাসি দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠা গোটা মিসিসিপি অববাহিকাই তখন ফরাসিদের দখলে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বছরখানেক পর, ১৮০২ সালে থমাস জেফারসন লিখেছিলেন, "পৃথিবীতে একটামাত্র জায়গা আছে, যে জায়গার দখলদাররা আমাদের সহজাত এবং স্বভাবজাত শত্রু। আর সে জায়গাটি হলো নিউ অরলিন্স"।

মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রান্সকে তখন দখলদার এবং সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হতো। তবে সমস্যা সমাধানে যুদ্ধের পরিবর্তে বেছে নেওয়া হয় ভিন্ন কৌশল। ১৮০৩ সালে পুরো লুইজিয়ানা অঞ্চলটি ফ্রান্সের কাছ থেকে কিনে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই অঞ্চলটির বিস্তার ছিল দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিমে রকি পর্বতমালা পর্যন্ত। স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিকে একত্র করলে যতটুকু হবে, লুইজিয়ানা একাই আয়তনে তার সমান। আর বিশাল এই ভূমির সাথে তারা পেল গোটা মিসিসিপি অববাহিকা। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য আর দুর্দান্ত অগ্রযাত্রার পেছনে এই অববাহিকার অপরিসীম ভূমিকা আছে।

লুইজিয়ানার বিনিময়ে ফ্রান্সকে দিতে হয় ১৫ মিলিয়ন ডলার। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অনেক টাকা হলেও এর বিনিময়ে অ্যামেরিকা যা পেল তা অমূল্য! এক ধাক্কায় যুক্তরাষ্ট্রের আকার হয়ে গেল দ্বিগুণ। আর সেই সাথে দখলে এল পৃথিবীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ জলপথ। ইতিহাসবিদ হেনরি অ্যাডামস এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন "এত কম মূল্যে এত বেশি কিছু যুক্তরাষ্ট্র আর কখনোই পায়নি"।

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহণের জন্য মিসিসিপি অববাহিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানের নদীগুলোতে সমন্বিতভাবে যত মাইল নৌপথ আছে, বাকি পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীণ নৌপথ মিলেও ততটা হবে না। মিসিসিপির প্রতিটি উপনদীর উৎসমুখই তুলনামূলকভাবে সমতলে অবস্থিত। এমনটা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। উত্তরের মিনিপোলিস থেকে শুরু হয়ে ১৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করে মেক্সিকো উপসাগরে গিয়ে পড়েছে এই নদী। সেই সাথে গোটা অববববাহিকা জুড়ে অসংখ্য উপনদী বা ট্রিবিউটারি এসে মিসিসিপির সাথে মিলেছে। নদীপথে চারদিক থেকে মিসিসিপিতে এসে পৌঁছে যাওয়া যায় নিউ অরলিন্সের সমুদ্রবন্দরে। সড়ক পথের চেয়ে নদীপথে খরচও পড়ে অনেক কম। তাই এই নদীপথ ধরে বাণিজ্য ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করল।

মার্কিনিদের তখন রমরমা অবস্থা। একদিকে প্রচুর চাষযোগ্য জমি, অন্যদিকে আকারে বড় হওয়ার ফলে পাওয়া যাচ্ছে ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত দিক থেকে সুবিধা। সেই সাথে বাণিজ্যের জন্য আটলান্টিক উপকূলের বিকল্প

বন্দরও এসে গেছে হাতে। একদিকে পশ্চিমমুখী নানা পথ ধরে পূর্ব উপকূল থেকে নতুন এলাকায় যাচ্ছে মানুষ। অন্যদিকে বহমান নদীপথ উত্তর থেকে দক্ষিণের স্বল্প জনবহুল অঞ্চলগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করছে। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে একটি একক সত্তায় রূপ নিতে শুরু করল।

অ্যামেরিকার নেতারা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে অ্যামেরিকা ভবিষ্যতে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারে। তাই তারা ক্রমাগতভাবে পশ্চিমে সীমানা বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। সেই সাথে তাদের নজর পড়ল দক্ষিণেও। পাশাপাশি ভূ-রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ মিসিসিপি নদীর নিরাপত্তাও নিশ্চিত করল তারা।

১৮১৪ সাল নাগাদ ব্রিটিশরা চলে গেল। ফ্রেঞ্চরা তো আগেই লুইজিয়ানার আশা ছেড়ে দিয়েছে। এইবার তাড়াতে হবে স্প্যানিশদের। কাজটা তেমন কঠিন ছিল না। ইউরোপে নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধ করে স্প্যানিশরা ততদিনে হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থায়। অন্যদিকে মার্কিনিরা সেমিনোল ইন্ডিয়ানদেরকে ঠেলে স্প্যানিশ অধ্যুষিত ফ্লোরিডায় পাঠাতে শুরু করে। মাদ্রিদ বুঝে গেল এদের পিছু পিছু ইউরোপীয় সেটেলাররাও স্রোতের মত ঢুকতে শুরু করবে। তাই ১৮১৯ সালে তারা বিপুল পরিমাণ ভূমিসহ ফ্লোরিডাকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিল।

লুইজিয়ানা কিনে মার্কিনিরা পেয়েছিল প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু ১৮১৯ সালের আন্তঃমহাদেশীয় চুক্তি থেকে তারা যা পেল তার মূল্যও একেবারে কম নয়। এই চুক্তিতে স্প্যানিশরা মেনে নিলো যে রকি পর্বতমালার পশ্চিমে ৪২তম অক্ষরেখার উত্তরের পুরো অঞ্চল এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর এই অক্ষরেখার দক্ষিণে থাকবে স্প্যানিশ নিয়ন্ত্রণ। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছে গেল।

বেশিরভাগ মার্কিনি সে সময় ভেবেছিল ১৮১৯ সালের সেরা প্রাপ্তি হচ্ছে ফ্লোরিডা হাতে পাওয়া। তবে তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) জন কুইন্সি অ্যাডামস তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন অন্য কথা। তিনি লিখেছিলেন- "প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছানোর একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা অধিগ্রহণ করতে পারা আমাদের ইতিহাসের একটা যুগান্তকারী অর্জন"।

স্প্যানিশ ভাষাভাষীদের নিয়ে একটা সমস্যা রয়েই গেলো। আর এই সমস্যার নাম হলো- মেক্সিকো। মেক্সিকো ১৮২১ সালে স্প্যানিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। আর এই দেশের সীমানা পড়লো নিউ অরলিন্স বন্দর থেকে মাত্র ২০০ মাইল দূরে। একুশ শতকে এসে মেক্সিকো এখন আর যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তেমন কোনো আঞ্চলিক হুমকি নয়। তবে প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ শ্রমিক আর মাদকদ্রব্য মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে। এর বাইরে দুই দেশের মধ্যে আর কোনো বিরোধ বর্তমানে নেই।

কিন্তু ১৮২১ সালে পরিস্থিতি ছিল একদম আলাদা। তখন পশ্চিমের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পূর্ব দিকে লুইজিয়ানার সীমান্তে বর্তমানের টেক্সাস পর্যন্ত ছিল মেক্সিকোর দখলে। সে-সময় যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ৯৬ লাখ, আর মেক্সিকোর ৬২ লাখ। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী শক্তিশালী ব্রিটিশদের পরাজিত করেছিল ঠিকই, তবে ব্রিটিশরা এসেছিল ৩০০০ মাইল দূর থেকে। তাদের রসদ নিয়ে আসতে হতো বিশাল মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। কিন্তু মেক্সিকো তো একদম প্রতিবেশী, তাদের তো আর এতসব সমস্যা ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্র এসময় একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করল। দেশের নাগরিক এবং নতুন আসা অভিবাসীদেরকে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত অঞ্চলে বসতি গড়তে উৎসাহ দিতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্রে তখন স্রোতের মত নতুন অভিবাসী আসছে। তারা ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে। বর্তমানে মেক্সিকো বলতে আমরা যে এলাকাকে বুঝি, তা স্থায়ীভাবে বসবাস করার পক্ষে মোটেও সুবিধাজনক নয়। এই অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট নয়; অনুর্বর ভূমি, নেই কোনো নদীপথ। সেইসাথে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না দেশটিতে। নতুন অভিবাসীদের জন্য মেক্সিকোতে জমি পাওয়ার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না বললেই চলে।

টেক্সাসে অনুপ্রবেশ অব্যাহত রইল। আর এই ফাঁকে, ১৮২৩ সালে অ্যামেরিকা জারি করল "মনরো অধ্যাদেশ" (প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর নামানুসারে)। এই অধ্যাদেশ অনুসারে পশ্চিম গোলার্ধে আর ভূমি অধিগ্রহণ

করতে পারবে না কোনো ইউরোপীয় দেশ। যদি তাদের অধিকৃত ভূমি তারা হারিয়েও ফেলে, তাও আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

১৮৩০-এর দশকের মাঝামাঝি টেক্সাসে বসতি স্থাপনকারী শ্বেতাঙ্গরা লোকসংখ্যার দিক দিয়ে মেক্সিকানদের সংকটে ফেলে দিল। স্প্যানিশ ভাষাভাষী কয়েক হাজার "মেক্সিকান ক্যাথলিকের" বিপরীতে "শ্বেতাঙ্গ প্রোটেস্ট্যান্টদের" সংখ্যা ২০,০০০ ছাড়িয়ে গেল। শুরু হলো সংঘাত। ১৮৩৫-৩৬ সালে টেক্সাসের বিদ্রোহের মাধ্যমে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় মেক্সিকানদেরকে। লড়াইটা হয়েছিল একদম হাড্ডাহাড্ডি। এই ঘটনা থেকে আমরা পাই ইতিহাসের অন্যতম আগ্রহ জাগানোর মত একটা 'যদি-কিন্তু' পরিস্থিতি। যদি মেক্সিকান সেনাবাহিনী জয়লাভ করত, তাহলে পৌঁছে যেত নিউ অরলিন্স পর্যন্ত। মিসিসিপি নদীর দক্ষিণাঞ্চল চলে আসত তাদের দখলে। ইতিহাস তখন অন্যরকম হতে পারত।

তবে সেরকম কিছু হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ আর অস্ত্রের জোরে স্বাধীনতা লাভ করে টেক্সাস। ১৮৪৫ সালে তারা ইউনিয়নে যোগ দেয়। ১৮৪৬-৪৮ সালের মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে টেক্সাসের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মেক্সিকো আবারও পরাজিত হয়। আর এই পরাজয়ের ফলে রিও গ্রান্ডে নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায় মেক্সিকোর সীমানা।

এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এসে পড়ল ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা, নেভাদা, উতাহ ও কলোরাডো। এই অঞ্চলগুলো একধরনের প্রাকৃতিক সীমান্ত হিসেবে কাজ করতে লাগল। দক্ষিণে রিও গ্রান্ডে নদী প্রবাহিত হয়েছে মরুভূমির ভেতর দিয়ে। উত্তরে আছে বিশাল সব হ্রদ এবং পাথুরে এলাকা। এসব সীমান্ত অঞ্চলে মানুষের বসবাস নেই বললেই চলে। বিশেষ করে পূর্ব প্রান্ত তো একদমই জনবিরল। পূর্ব আর পশ্চিমে রইল মহাসাগর। তবে একুশ শতকে এসে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে হিস্পানিকরা তাদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। জনমিতি যেভাবে বদলে যাচ্ছে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে হয়তো তারাই এসব অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে।

আবার ১৮৪৮ সালে ফিরে যাওয়া যাক। ইউরোপীয়রা ততদিনে চলে গেছে। মিসিসিপি অববাহিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। প্রশান্ত মহাসাগর চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। অল্প যে কয়েকটি স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাকি আছে, তাদেরকেও সহজেই দমন করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সামনে আর কোনো হুমকি নেই। এখন টাকা উপার্জনের সময়, সাগর পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করার করার সময়। তাছাড়া তিন দিকের তিন উপকূলরেখার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে।

শুরু হলো পশ্চিমের পথে অভিবাসীদের স্রোত। ১৮৪৮-৪৯ এর ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড রাশ আরো বহু মানুষকে অ্যামেরিকায় টেনে নিয়ে এসেছিল পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে। এমনিতেও তারা যেতই। কারণ আস্ত একটা মহাদেশীয় সাম্রাজ্য গঠনে ভূমিকা রাখার সুযোগ কে ছাড়তে চায়! আর যুক্তরাষ্ট্রের যতই উন্নয়ন ঘটতে লাগল, অভিবাসীদের স্রোতও তত বাড়তে থাকল। পশ্চিমে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে অভিবাসীদের উৎসাহিত করতে ১৮৬২ সালে প্রণয়ন করা হলো "হোমস্টিড অ্যাক্ট"। এই আইনে আবেদনকারীকে শর্তসাপেক্ষে ১৬০ একর করে সরকারি খাসজমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়ার নিয়ম হলো। শর্ত হচ্ছে, সামান্য ফি দিতে হবে এবং অন্তত ৫ বছর এই জমিতে চাষাবাদ করতে হবে। ইতালি, জার্মানি আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দরিদ্র জনগণ স্প্যানিশ-অধ্যুষিত ল্যাটিন অ্যামেরিকার বদলে বেছে নিল যুক্তরাষ্ট্রকে। ল্যাটিন অ্যামেরিকায় স্প্যানিশ জমিদারের ভূমিদাস হিসেবে কাজ করার বদলে নিজেই জমির মালিক হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল যুক্তরাষ্ট্র। ফলে লোকজনও এই সুযোগ লুফে নিল। বাড়তে থাকল অ্যামেরিকার অভিবাসীর সংখ্যা।

১৮৬৭ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে অ্যামেরিকা কিনে নিল অ্যামেরিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বরফাচ্ছাদিত বিশাল এক এলাকা, আলাস্কা। সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম সুয়ার্ড ছিলেন এই পরিকল্পনার কারিগর। সে-সময় এটাকে বলা হচ্ছিল "সুয়ার্ডের বোকামি"। আলাস্কার জন্য দিতে হয়েছিল মোট ৭.২ মিলিয়ন ডলার। প্রতি একরের জন্য দুই সেন্ট করে। এত টাকা দিয়ে বরফ কেনার জন্য তিনি ব্যাপকভাবে নিন্দিত হলেন। তবে ১৮৯৬ সালে সেখানে বড় আকারের সোনার খনি পাওয়ার পরে জনমত

পাল্টাতে শুরু করে। কয়েক দশক পরে সেখানে বিপুল পরিমাণ তেলের সন্ধানও মেলে।

১৮৬৯ সালে আন্তমহাদেশীর রেলপথ উদ্বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে মাত্র এক সপ্তাহে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হলো। আগে এই কাজটা করতে কয়েক মাস লেগে যেত, আর সে পথও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ।

ধনসম্পদে বলীয়ান হয়ে ওঠার সাথে সাথে নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করল যুক্তরাষ্ট্র। গোটা উনিশ শতক জুড়ে তাদের পররাষ্ট্রনীতি ছিল বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। এই সময়ে প্রতিবেশী দেশ ছাড়া আর কারো সাথে বিবাদে জড়ায়নি তারা। গভীর সাগরে শুধু তাদের বাণিজ্য জাহাজই চলতো। কিন্তু উপকূলের সুরক্ষার জন্য সাগরে নৌশক্তি মোতায়েনও জরুরি। আর এক্ষেত্রে একমাত্র বাধা ছিল স্পেন। মূলভূমি থেকে স্পেন ততদিনে সরে গেছে। কিন্তু মেক্সিকো উপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ, যেমন-কিউবা, পুয়ের্তো রিকো এবং বর্তমান ডোমিনিকান রিপাবলিকের কিছু অংশে তখনো স্প্যানিশদের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। বিশেষ করে কিউবা ছিল মার্কিন নীতিনির্ধারকদের মাথাব্যথার বড় কারণ। কিউবা দ্বীপটির অবস্থান ফ্লোরিডা থেকে সামান্য একটু দূরে। কিউবাকে দখলে রাখতে পারলে নিউ অরলিন্স বন্দরে ঢোকা বা বের হওয়ার একমাত্র পথ ফ্লোরিডা প্রণালি এবং ইউকাতান চ্যানেল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে দেশ হিসেবে স্পেনের শক্তি কমে এসেছিল। কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি তখনও কমেনি। ১৮৯৮ সালে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। এই যুদ্ধে তারা জয়ী হয় এবং স্পেনের কাছ থেকে আটলান্টিক অঞ্চলের কিউবা ও পুয়ের্তো রিকো এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুয়াম ও ফিলিপাইন দখল করে নেয়। এই অধিগ্রহণগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে কৌশলগতভাবে গুয়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্পদ। আর কিউবার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। কিউবাকে অন্য কোনো বড় শক্তি নিয়ন্ত্রণ করলে মার্কিনিদের বিপদ।

কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সংকট পুরোনো। ১৮৯৮ সালে স্পেনকে পরাজিত করে এই সংকট একবার নিরসন করা হয়। তারপর ১৯৬২ সালে দেখা দেয় "কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস"। এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রকে তাক করে কিউবাতে মিসাইল স্থাপন করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রও তো আর বসে থাকার পাত্র না। আর এর ফলে টানা তের দিন ছিল টান টান উত্তেজনা। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে সেটা নিবৃত্ত করা হয়। এখন আর কিউবার পাশে বড় কোনো দেশ দাঁড়াতে চায় না। কিউবা এখন মার্কিন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের মুখে।

এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র খুব দ্রুত আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। ১৮৯৮ সালে তারা কিউবার দখল নিল, ফ্লোরিডা প্রণালি করায়ত্ব করল এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের একটা বড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। একই বছর প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও অধিগ্রহণ করে ফেলল তারা। আর এর ফলে তাদের পশ্চিম উপকূলও সুরক্ষিত হয়ে গেল। ১৯০৩ সালে একটি ইজারা-চুক্তির মাধ্যমে পানামা খালের একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে গেল অ্যামেরিকা। বাণিজ্য এবার ফুলেফেঁপে উঠতে লাগল।

গোটা পৃথিবীকে নিজেদের শক্তিমত্তা জানান দেওয়ার উপযুক্ত সময় এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট সবসময় নরম গলায় কথা বলতেন। কিন্তু তিনি বেশ রূঢ়ভাবেই গোটা পৃথিবীকে মার্কিন শক্তির নমুনা দেখিয়ে দিলেন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন আটলান্টিক নৌবহরের ১৬টি যুদ্ধজাহাজ রওনা হলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সবগুলো জাহাজের খোল সাদা রঙের। সাদা হচ্ছে নৌবাহিনীর শান্তিকালীন প্রতীকী রঙ। এই কারণে এই বহরের নামকরণ করা হয় "গ্রেট হোয়াইট ফ্লিট"। পরবর্তী ১৪ মাসে এই নৌবহর সারা বিশ্বের ২০টি বন্দরে নোঙর করে। এর মধ্যে ছিল-ব্রাজিল, চিলি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, চীন, ইটালি এবং মিশরের বন্দর। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাপানের বন্দর। জাপানকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, প্রয়োজন পড়লে মার্কিন আটলান্টিক নৌবহরকে প্রশান্ত মহাসাগরেও মোতায়েন করা হতে পারে। নৌবহরের এই সমুদ্রযাত্রার

মাধ্যমে বিশ্বের সকল শক্তিধর দেশকে মার্কিন শক্তিমত্তা সম্পর্কে জানান দেওয়া হলো।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের বিদায়ী ভাষণকে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রেসিডেন্টই বিশেষভাবে স্মরণে রাখেন। তিনি কিছু দেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদি শত্রুতায় জড়াতে মানা করেন। কিছু দেশের সাথে শক্ত বন্ধনের নির্দেশনা দেন। এমনকি কোনো কোনো দেশের সাথে স্থায়ী মিত্রতায় আবদ্ধ না হতেও পরামর্শ দেন। এই নীতি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভালোভাবেই মেনে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে বলা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণকে। এটুকু বাদ দিলে ১৯৪১ সালের আগপর্যন্ত তারা কারো সাথে স্থায়ী সংঘাত বা মিত্রতায় জড়ায়নি।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সব বদলে দিল। জাপানের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিকে লাগাম পরাতে ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে জাপানের অর্থনীতি প্রায় পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দশা হয়। তাই জাপান ছিল মরিয়া। এর জবাবে জাপান ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার সামরিক ঘাঁটিতে (বন্দরে) ব্যাপক হামলা চালায়। যুক্তরাষ্ট্র এর জবাব দিল প্রবল পরাক্রমে। এতদিন ধরে গড়ে তোলা বিশাল শক্তিমত্তা গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিল তারা। এই প্রভাব বজায় রাখতে চেয়ে, এবারে তারা নিজেদের সামরিক শক্তিকে আর ফিরিয়ে নিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর সবগুলো সাগরপথে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করলো তারা।

সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ বলতে কেউই ছিল না। ইউরোপ তখন ক্লান্ত। তাদের শহর এবং গ্রামগুলোর মত তাদের অর্থনীতিও তখন যুদ্ধবিদ্ধস্ত। জাপান তো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। চীন ব্যস্ত নিজের অভ্যন্তরীণ বিবাদ থামাতে; কারণ চীনে তখন ক্ষমতা দখল নিয়ে চলছে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জাতীয়তাবাদী দলের লড়াই। আর রাশিয়া তো পুঁজিবাদের খেলাতেই নেই। মার্কিনিদের আর ঠেকায় কে!

ব্রিটিশরা এক শতাব্দী আগেই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের নৌশক্তির সামর্থ্য বাড়াতে গেলে দেশের বাইরে নানা জায়গায় ঘাঁটি নির্মাণ করতে হবে। তারা কিছু নির্মাণও করে ফেলেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে এসে তারা

পরিণত হয় ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মার্কিনিরা চকচকে চোখে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো দেখে বললো "বাহ, চমৎকার তো! এখন থেকে এগুলো আমাদের"। অবশ্য বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্যও দিয়েছিল তারা। ১৯৪০ এর শরৎকালে ব্রিটিশরা হন্যে হয়ে যুদ্ধজাহাজ খুঁজছিল। মার্কিনিদের হাতে অতিরিক্ত ৫০টি যুদ্ধজাহাজ ছিল। তারা এই সুযোগে একটি চুক্তি করে ফেলল ব্রিটিশদের সাথে। চুক্তিটির নাম "ঘাঁটির বিনিময়ে যুদ্ধজাহাজ"। বৃটেনের কাছে তখন বৈশ্বিক পরাশক্তি হওয়ার চাইতে জরুরি বিষয় ছিল যুদ্ধে টিকে থাকাটা। পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত তাদের প্রায় সকল নৌ-ঘাঁটি তারা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়।

একটা শক্ত অবকাঠামো ছাড়া উন্নত রাষ্ট্র হওয়া যায় না। রাষ্ট্র গড়তে লাগে বন্দর, রানওয়ে, তেলের ডিপো, ডকইয়ার্ড; লাগে বিশেষ বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণের এলাকা। জাপানের পতনের পর পূর্বদিকে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এইসব অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করল যুক্তরাষ্ট্র। প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থিত গুয়াম তো আগে থেকেই তাদের দখলে ছিল। এবারে পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত জাপানি দ্বীপ ওকিনাওয়াতেও ঘাঁটি তৈরি করল অ্যামেরিকা।

সমুদ্রের পাশাপাশি ভূমির দিকেও সতর্ক নজর রাখল মার্কিনিরা। মার্শাল প্ল্যান অনুযায়ী ১৯৪৮-৫১ সালে ইউরোপ পুনর্গঠনের যাবতীয় খরচ যুক্তরাষ্ট্র বহন করছিল। এই কারণে তারা নিশ্চিত হতে চাইল, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন কোনোভাবেই এই পরিকল্পনায় বাগড়া দিয়ে আটলান্টিক উপকূলে চলে না আসতে পারে। তারা জার্মানিতে ঘাঁটি বানিয়ে উত্তর ইউরোপীয় সমভূমিতে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল।

১৯৪৯ সালে ন্যাটো গঠিত হয়। ইউরোপ আর উত্তর অ্যামেরিকার সামরিক জোট হিসেবে এই সংগঠনটি গড়তে মূল ভূমিকা রাখে ওয়াশিংটন। আর এর মাধ্যমে ইউরোপের সম্মিলিত সামরিক শক্তির নেতৃত্বও তাদের হাতে চলে আসে। ন্যাটোর বেসামরিক প্রধান একজন ইউরোপীয়ই হয়ে থাকে। এই বছর একজন বেলজিয়ান হলে পরের বছর একজন ব্রিটিশ। কিন্তু সামরিক প্রধানের

পদে সবসময় একজন মার্কিনি থাকবে, এটাই অলিখিত নিয়ম। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই ন্যাটোর প্রধান সামরিক শক্তি।

চুক্তিতে যাই লেখা থাকুক না কেন, ন্যাটোর সামরিক প্রধান ওয়াশিংটনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এমনকি ওয়াশিংটনের সম্মতি ছাড়া ন্যাটোভুক্ত কোনো দেশ নিজস্ব নৌ-নীতিও বাস্তবায়ন করতে পারে না। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ খাল নিয়ে সংকটের সময় বিষয়টা স্পষ্ট হয়। সেসময় ওয়াশিংটনের চাপে সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য। আর এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব প্রায় পুরোটাই খোয়াতে হয়। ন্যাটোর চার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য- আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ব্রিটেন এবং ইতালি তাদের সকল ঘাঁটি ইচ্ছামতো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে।

উত্তর আটলান্টিক এবং ভূমধ্যসাগরের পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরেও বর্তমানে মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের সাথে জোট বাঁধার ফলে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে আসে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাঞ্চল। আর প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চল তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে ১৯৫০-৫৩ সালের কোরিয়ান যুদ্ধের পর।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি ম্যাপ। আমরা সরচরাচর যে ম্যাপটি দেখি সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের সিয়াটল থেকে পূর্ব দিকে শৈবাল সাগর পর্যন্ত দেখানো হয়। অন্য ম্যাপটিতে দেখানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভ। এই ম্যাপে তাদের সকল ঘাঁটি, বন্দর এবং রানওয়ে চিহ্নিত আছে। কিন্তু এগুলো তো প্রকাশ্য, এর বাইরে আরো কিছু বিষয় আছে যা সাধারণের বোধের অগম্য। যেমন- কোন অঞ্চলে কী ঘটলে কোন কোন দেশকে মিত্র বা কোন দেশকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাওয়া যাবে। বিশ্বের প্রতিটি শক্তিশালী দেশই জানে, তারা যদি কোথাও ঝামেলা পাকায়, যুক্তরাষ্ট্র চাইলেই সেখানে নাক গলাতে পারে। কারণ, একমাত্র অ্যামেরিকাই সত্যিকারের পরাশক্তি। ১৯৬০ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মার্কিনিদের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা লেগেছে। তাই, বহির্বিশ্বের ঝামেলার মধ্যে খুবই সতর্কতার সাথে পা ফেলে তারা এখন। কিন্তু তাদের মূল বিদেশনীতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

বর্তমানে মাত্র তিনটি অঞ্চল মার্কিনিদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে সক্ষম। এগুলো হলো, একত্রিত ইউরোপ, রাশিয়া এবং চীন। সময়ের সাথে সাথে তিনটি অঞ্চলই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। তবে এর মধ্যে দুইটি অঞ্চল এখনই তাদের সামর্থ্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। এর চাইতে সামনের দিকে যাওয়ার আর তেমন কোনো সম্ভাবনা তাদের নেই। এই দুইটি অঞ্চল হলো ইউরোপ আর রাশিয়া।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে একজোট হয়ে অভিন্ন বৈদেশিক নীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিল ইউরোপ। কিন্তু সেই স্বপ্ন ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। ফলে নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্টের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাদের। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দায় ইউরোপ অনেকটাই ন্যুব্জ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে তাদের আগ্রাসনের ক্ষুধা। নতুন এলাকা জয় করার ইচ্ছা নেই, সামর্থ্যও গেছে কমে।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত মার্কিনিদের জন্য প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ ছিল রাশিয়া। কিন্তু অর্থনৈতিক দুর্বলতা রাশিয়ানরা কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা আর যত্রতত্র সেই শক্তির প্রয়োগ দেশটির অর্থনীতিকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছিল। গুলাগের মত শ্রমিক ক্যাম্পের ভয় দেখিয়ে বা কৃষিতে ভর্তুকি দিয়েও দেশের জনগণের সমর্থন কখনো আদায় করতে পারেনি কমিউনিস্টরা। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর সামরিক শক্তিও সীমিত হয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পুতিনের রাশিয়া ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও যুক্তরাষ্ট্রের চোখে তা হুমকির বদলে উপদ্রব হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছিলেন "রাশিয়া এখন বড়জোর একটি আঞ্চলিক শক্তি"। কিছুটা অত্যুক্তি মনে হলেও, একেবারে ভুল যে বলেছেন তা বলা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে রাশিয়ার ভৌগোলিক বন্দিত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো এখনো বলবৎ রয়েছে। বৈশ্বিক সমুদ্রপথে যাওয়ার মত উষ্ণ পানির বন্দর এখনো নেই তাদের কাছে। বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগর হয়ে, অথবা কৃষ্ণ

সাগর ও ভূমধ্যসাগর হয়ে আটলান্টিকে পৌঁছানোর মতো সামরিক সক্ষমতাও তাদের নেই।

২০১৪ সালের ইউক্রেনে সরকার বদলের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রেরও ভূমিকা ছিল। মার্কিনিরা সবখানে গণতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইউক্রেনে ক্ষমতা বদলের পেছনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনকে রাশিয়ার প্রভাব বলয় থেকে বের করে আনা এবং পুতিনকে দুর্বল করে ফেলা।

গত দশকে অ্যামেরিকা ব্যস্ত ছিল ইরাক এবং আফগানিস্তান নিয়ে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আশপাশের অঞ্চল কবজা করে নিয়েছে রাশিয়া। কাজাখস্তানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। দখল করে নিয়েছে জর্জিয়ার কিছু অঞ্চল। খানিকটা দেরিতে হলেও যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে রাশিয়ার আগ্রাসনে লাগাম পরাতে চেষ্টা করছে।

ইউরোপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তার অন্ত নেই। ন্যাটোর ব্যাপারে তারা খুবই আন্তরিক। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে ইউরোপে তারা অনেকসময় সরাসরিও হস্তক্ষেপ করে। রাশিয়াকে তারা এখন শুধু ইউরোপকেন্দ্রিক সমস্যা হিসেবে ধরে। তারপরেও রাশিয়ার ব্যাপারে তাদের আলাদা নজর আছে।

আর বাকি রইল চীন। পরাশক্তি হিসেবে চীনের উত্থান ঘটছে। অনেক বিশ্লেষক বলে থাকেন, একুশ শতকের মাঝামাঝি গিয়ে পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে তারা। চীনের এই উত্থানের ব্যাপারে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এত দ্রুত তারা অ্যামেরিকাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না। আরো এক শতাব্দী লেগে যেতে পারে।

অর্থনৈতিকভাবে চীন প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। ফলে তারা অনেক জায়গায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। শীর্ষপর্যায়ের অন্যতম দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠাও করে ফেলেছে। কিন্তু সামরিক এবং কৌশলগত বিষয়ে তারা এখনো অনেক পিছিয়ে। অ্যামেরিকা এই ব্যবধানটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে যাবে। তবে, তারাও জানে যে পরাশক্তি হিসেবে চীন একদিন তাদের খুব কাছাকাছি চলে আসবে।

ঘাঁটি তৈরির খরচ অনেক। ঘাঁটি মানে তো শুধু কংক্রিটের ভবন নয় যে মশলা মিশিয়ে ঢেলে দিলেই মিটে যাবে। চাহিদা মতো জায়গায় ঘাঁটি তৈরি করতে চাইলে ঘাঁটি বসানোর অনুমতিও লাগে। এর আগে "ঘাঁটির বিনিময়ে যুদ্ধজাহাজ" চুক্তি থেকে আমরা দেখেছি যে যুক্তরাষ্ট্র শুধু পরোপকারের খাতিরে কোনো সরকারকে সহায়তা করে না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তার বিনিময়ে ঘঁটি বসানোর অনুমোদন কিনে নিতে হয়। এর বাইরেও আরো অনেক রকমের কৌশল আছে।

উদাহরণ হিসেব মধ্যপ্রাচ্যের কথা বলা যায়। সিরিয়াকে শত্রুরাষ্ট্র হিসেবে দেখে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে জোর গলায় এর প্রতিবাদ জানাতে ছুটে আসে। কিন্তু বাহরাইনে যখন রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলে, তখন সে ব্যাপারে তাদের আওয়াজ শোনা যায় না। কারণ, বাহরাইনের সরকার অ্যামেরিকার পঞ্চম নৌবহরকে সে-দেশে ঘাঁটি গাড়তে দিয়েছে। আবার বার্মাকে সহায়তার বিনিময়ে তারা দেশটিকে চীনের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে বার্মার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এখনো দৌড়ে পিছিয়ে আছে। কারণ দেশটি যখন বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ শুরু করে, তখন সবার আগে চীন এগিয়ে এসেছিল।

আবার জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। এই দেশগুলো তাদের বৃহৎ প্রতিবেশী চীনের আগ্রাসী নীতি সম্পর্কে ইতোমধ্যেই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এই কারণে তারা নিজেরাই ওয়াশিংটনের সাথে খাতির রাখতে আগ্রহী। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে, এইসব বিরোধের চেয়ে নিজেদের একতাবদ্ধ হওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে তাদের কাছে। নাহলে চীন ধীরে ধীরে সবাইকে গ্রাস করে নেবে।

তবে চীনের প্রতি মার্কিনিদের এই বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারটা এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই আছে। বিষয়টি বেশ কৌতূহল-উদ্দীপক। অনেকে মনে করেন, এর ফলে ইউরোপ থেকে তাদের মনোযোগ সরে যাচ্ছে। কিন্তু একদিকে মনোযোগ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে অপরদিক থেকে মনোযোগ সরে যাবে। এটা অনেকটা দুই পায়ের মধ্যে ভরের ভারসাম্য রাখার মতো।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি প্রণেতাদের মধ্যে অনেকেই বলেন একুশ শতকের ইতিহাসে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূমিকাই হবে সব থেকে জোরালো। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষই এই অঞ্চলে বসবাস করে। তার ওপর আছে উদীয়মান শক্তি- ভারত। ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট অর্থনৈতিক উৎপাদনের অর্ধেকই ভারতসহ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসবে বলে ধারণা করা হয়। এই কারণে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা ক্রমেই পূর্ব এশিয়াতে সময় এবং অর্থের বিনিয়োগ বাড়াতে দেখব। কারণ, এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব এবং উদ্দেশ্য বলবৎ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কথা। সেখানে ইউএস মেরিনের একটি ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে।

বন্ধু দেশগুলোর ওপর সত্যিকারের প্রভাব বিস্তারের জন্য মাঝেমধ্যে সামরিক শক্তিও দেখাতে হয়। তাদের দেখাতে হয় যে- বিপদের সময় অ্যামেরিকা পাশে থাকবে। ধরা যাক, চীন হঠাৎ করে একটা জাপানি ডেস্ট্রয়ারের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল এবং সামনে আরো আক্রমণের পরিকল্পনা করতে থাকল। তখন বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। তারা তখন হয়তো সতর্ক করে দেওয়ার জন্য চাইনিজ যুদ্ধজাহাজের দিকে গোলা ছুড়তে পারে। উত্তর কোরিয়া যখন দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে গোলা ছোড়ে, দক্ষিণ কোরিয়া পাল্টা গোলা ছুড়ে জবাব দেয়। যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে সরাসরি নাক গলায় না, তারা শুধু সামরিক উপস্থিতি জানান দেয়। তবে, পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠলে তারা সতর্ক করার জন্য গোলা ছুড়বে, তারপর লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে। এর ফলে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠবে। আর তখন তা বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে এগোবে।

ওয়াশিংটন এই অঞ্চলকে দেখাতে চায় যে- নিজের ভালোর জন্য এই অঞ্চলের সবার উচিত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে থাকা। আর চীন চায় এর উল্টোটা। ফলে, সংঘাত এগিয়ে এলে দুই পক্ষই প্রতিক্রিয়া দেখাবে। কারণ, যে পক্ষ পিছিয়ে যাবে সে পক্ষই মিত্রদের আস্থা হারাবে। সেই সাথে প্রতিপক্ষও আরো সাহসী হয়ে উঠবে। ফলে দেখা যাবে বর্তমানের মিত্ররা দল বদলে ফেলছে।

আক্রমণ বা হুমকির মুখে নত না হওয়াটা অনেক সংস্কৃতিরই বৈশিষ্ট্য। পিছিয়ে আসাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয় অনেক ক্ষেত্রেই। এটা শুধু পূর্ব এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, মানব চরিত্রই এমন। তবে এই দুই অঞ্চলের সংস্কৃতিতে এই বিষয়টাকে আলাদাভাবে মহিমান্বিত করা হয়। অন্যান্য দেশের মতো মার্কিন বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞরাও তা ভালো করেই জানেন। ইংরেজি ভাষায় এই নিয়ে চমৎকার একটা প্রবাদবাক্যও আছে- "তাদেরকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়লে তারা এক মাইল নিয়ে নেবে"। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট আরো সরাসরিভাবে বলেছেন, "ভদ্রভাবে কথা বলো, তবে বড় একটা লাঠি হাতে রেখো"।

যুদ্ধ যদি হয়, তবে এই শতকের সব থেকে মারাত্মক লড়াই হবে যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাকি দেশগুলোর মধ্যে। হার না মেনে এবং পরস্পরের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি ঘৃণার জন্ম না দিয়ে কে যে কীভাবে সংকট সামাল দেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

কিউবান মিসাইল সংকটকে এই ধরনের পরিস্থিতির একটা সার্থক উদাহরণ বলা যায়। অ্যামেরিকা সেই সংকটে নিজেদেরকে জয়ী বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু রাশিয়া যেমন কিউবা থেকে নিজেদের মিসাইল সরিয়ে নিয়েছিল, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রকেও তুরস্ক থেকে তাদের মস্কো-অভিমুখী জুপিটার মিসাইল সরিয়ে নিতে হয়েছিল। এটা ছিল এক ধরনের আপস। এখানে উভয় পক্ষই নিজেকে বিজয়ী দাবি করতে পারে।

একুশ শতকের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এর থেকেও বড় বড় আপস করতে হতে পারে। প্রাথমিকভাবে আপস হয়তো চীনই করছে। তারা এই এলাকায় একটি বিমান প্রতিরক্ষা সনাক্তকরণ এলাকা গঠন করেছে। এই এলাকায় যুদ্ধবিমান ওড়াতে হলে আগে থেকে চীনকে জানাতে হবে। কিন্তু অ্যামেরিকা এসবের থোড়াই কেয়ার করে। চীনকে অগ্রাহ্য করে প্রায়ই তারা এই এলাকায় যুদ্ধবিমান ওড়ায়। কিন্তু, এই এলাকাটিকে নিজের বলে দাবি করাটা চীনের একটা কূটনৈতিক সাফল্য। আবার যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধ অমান্য করাটাকেও সাফল্যই বলতে হবে। তবে এটা দীর্ঘমেয়াদি একটা খেলা।

বিষয়টা অনেকটা লুকোচুরি খেলার মত। দক্ষিণ চীন সাগরের স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে চীন যেসকল কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করছে, তার সবগুলোতেই রানওয়ে আছে। ২০১৬ সালে তারা প্রথমবারের মতো এখানকার একটি রানওয়েতে বিমান অবতরণ করায়। ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইন এর জোরালো প্রতিবাদ জানায়। কারণ, এই দুইটি দেশই ওই অঞ্চলকে নিজেদের বলে দাবি করে। যুক্তরাষ্টের ভাষ্যেও একে আঞ্চলিক সংহতি বিনষ্টকারী পদক্ষেপ হিসেবে বলা হয়। ওয়াশিংটন বর্তমানে এই এলাকায় চীনের নির্মাণকাজ এবং বিমান অবতরণের দিকে সতর্ক নজর রাখছে। তারা নিজেদের ইচ্ছামত মাঝেমধ্যে এসবের প্রতিবাদ জানাচ্ছে বা এই এলাকায় নিজেদের নৌ এবং বিমান টহল বৃদ্ধি করছে। কারণ একদিকে মিত্রদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে অ্যামেরিকা তাদের পাশে আছে এবং এই এলাকায় সকলের চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষায় তারা বদ্ধপরিকর। আবার চীনের সাথে সামরিক সংঘাতে জড়ানোর মতো বাড়াবাড়ি যেন না হয়ে যায়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।

জাপানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি হচ্ছে, তারা যে চীনের বিরুদ্ধে একজোট সে ব্যাপারে জাপানকে নিশ্চিন্ত রাখা। সেইসাথে ওকিনাওয়া দ্বীপে নিজেদের ঘাঁটি বজায় রাখা। জাপানের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে তারা। আবার জাপানের নৌবাহিনী যেন বেশি শক্তিশালী হয়ে না হয়ে উঠতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখবে। কারণ, তাহলে তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

এই অঞ্চলের সবগুলো দেশই কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেই একটা জিগ'স পাজলের অংশ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। এই তিনটি দেশই মালাক্কা প্রণালির পাশে অবস্থিত। মালাক্কা খুবই সরু একটি প্রণালি। সব থেকে সরু অংশে এর প্রস্থ মাত্র ১.৭ মাইল। তেলতৃষ্ণায় আক্রান্ত চীনসহ পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলোর জন্য এই প্রণালি ধরে প্রতিদিন আসে ১২ মিলিয়ন ব্যারেল তেল। যতদিন এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ মিত্র হিসেবে আছে ততদিন এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।

আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে, চীনের নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই। তারা দেশে দেশে কমিউনিজম ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী নয়। কোল্ড ওয়ার চলাকালে বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতে রাশিয়া যেমন আগ্রাসী ভূমিকায় নেমেছিল, তেমন কোনো আগ্রহ চীনের নেই। তাছাড়া চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের কেউই সংঘাত চায় না। যে সকল সাগরপথ ধরে চীনের পণ্য বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা হয়, সেসব সাগরে মার্কিন আধিপত্য নিয়েও চীনের কোনো সমস্যা নেই। চীনের একমাত্র মাথাব্যথা হচ্ছে এই আধিপত্য যেন সীমা পার করে তাদের খুব কাছাকাছি না চলে আসে।

এই দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবেই। মাঝেমধ্যেই জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে চীনের জনগণের একতা বজায় রাখতে হবে। দুই পক্ষই মূলত আপসকামী মনোভাব দেখাচ্ছে। তবে, তাদের মধ্যে যদি ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হয় বা কেউ একজন বেশিই বাড়াবাড়ি করে বসে, তখনই হবে বিপদ।

বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার উপযুক্ত উপাদানও আছে। যেমন, তাইওয়ানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি আছে। চীন যদি তাইওয়ানে আক্রমণ করে বসে, তাহলে অ্যামেরিকা চীনের বিরুদ্ধে এখানে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় অথবা তাইওয়ান স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে, সেক্ষেত্রে চীন আক্রমণ করতে পারে। তখন যুদ্ধ এড়ানো মুশকিল। তবে আপাতত তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বিদেশি তেল ও গ্যাসের প্রতি চীনের চাহিদা ও নির্ভরশীলতা যতই বাড়ছে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা ততই কমে আসছে। এই বিষয়টা ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে চলেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কের ধরন আমূল বদলে যেতে পারে। আর তার প্রভাব পড়তে পারে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কের ওপরেও।

তেল ও গ্যাসে ক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্র। নিজেদের উপকূলীয় অঞ্চল এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নতুন নতুন উপায়ে তেল ও গ্যাস উত্তোলন করছে তারা। ২০২০-এর দশকের মধ্যে তারা জীবাশ্ম জ্বালানিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং পাশাপাশি বাইরের দেশগুলোতে

রপ্তানিও করতে সক্ষম হবে। ফলে গালফ অঞ্চল থেকে জ্বালানির প্রবাহ নিশ্চিত করা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। কৌশলগত কারণে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ যদিও একেবারে স্তিমিত হবে না কখনো। তবে আগের মতো এতটা গুরুত্বও তারা দেবে না মধ্যপ্রাচ্যকে।

আর যুক্তরাষ্ট্র যদি মনোযোগ সরিয়ে নেয়, গালফ অঞ্চলের দেশগুলো তখন নতুন মিত্র খুঁজবে। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থী হচ্ছে ইরান এবং চীন। তবে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনিদের মত অবস্থান তৈরি করতে চাইলে গভীর সাগরের নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে হবে চীনকে। সেইসাথে অন্য এলাকায় নৌবহর মোতায়েন করার জন্যও প্রস্তুতও থাকতে হবে তাদের।

যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহর বাহরাইনের বন্দর থেকে সরবে বলে মনে হচ্ছে না। বাহরাইনের ঘাঁটি তারা এত সহজে ছাড়বে না। কিন্তু এই জাহাজগুলো সেখানে থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মার্কিন কংগ্রেস বা নাগরিকরা প্রশ্ন তুলতে পারে যে কোনো দিন। সৌদি আরব, কুয়েত বা কাতারের জ্বালানি যেহেতু আর দরকার হচ্ছে না, এই এলাকার ঘাঁটিতে বিনিয়োগের যথার্থতা প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই পারে। শুধু ইরানের জুজু দেখিয়ে এসব প্রশ্ন থামানো যাবে বলে মনে হয় না।

অ্যামেরিকা চায় না ইরান খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠুক। তাদের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক কার্যক্রমে এই ভাবনাটাও জড়িত। একই সাথে তারা ইরানের সাথে একটা ‘চূড়ান্ত দরকষাকষি’ চুক্তিতেও আসতে চায়। এই চুক্তি কার্যকর হলে ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের তিন দশক ধরে চলে আসা শত্রুতার সমাধান হয়ে যাবে। গত কয়েক দশক ধরে অস্ত্রধারী ইসলামপন্থী জঙ্গিগোষ্ঠী নিয়ে বেশ সংকটে আছে আরব দেশগুলো। এই সংকট দীর্ঘ সময় ধরেই চলবে। এত দ্রুত এটা শেষ হওয়ার কথা নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র এখন আরব অঞ্চলে জেফারসনীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি থেকে সরে এসেছে। সরাসরি সামরিক সম্পৃক্ততা এড়িয়ে তারা কৌশলগতভাবে এই অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করতে চাইছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক এখনো বেশ ঘনিষ্ঠ। তবে সময়ের সাথে সাথে যেভাবে জনমিতিগত পরিবর্তন আসছে, সম্পর্কের এই উষ্ণতা

বেশিদিন আর নাও থাকতে পারে। অ্যামেরিকায় বর্তমানে প্রচুর হিস্পানিক এবং পূর্ব এশীয় অভিবাসী আছে। ভবিষ্যতে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ল্যাটিন অ্যামেরিকা এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপ্রয়োজনীয় একটি এলাকার ছোট্ট এক কোণে থাকা ইসরায়েল নামের ছোট্ট এক দেশ নিয়ে তারা আদৌ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না।

ল্যাটিন অ্যামেরিকার ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন চাইবে পানামা খালকে নিজেদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে। চীন চাইছে নিকারাগুয়ায় এরকম আরেকটা খাল বানাতে। এই সম্ভাব্য খালের অগ্রগতির ওপরেও নজর রাখবে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া ব্রাজিল কোনোভাবে ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে কি'না, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখবে তারা। ল্যাটিন অ্যামেরিকার ওপর প্রভাব নিয়ে চীনের সাথে তাদের জোর প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে। তবে কিউবার ব্যাপারে ওয়াশিংটন কোনো ছাড় দেবে না। ওয়াশিংটন চাইবে কাস্ত্রো-পরবর্তী কিউবা পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক। ফ্লোরিডা আর কিউবার অবস্থান কাছাকাছি। এছাড়াও কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক সম্পর্ক এখানে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কিউবার ব্যাপারে চীন আগ্রহী না হওয়ায় সেদিক থেকেও কোনো বিবাদের সম্ভবনা নেই। ২০১৬ সালের বসন্তে প্রেসিডেন্ট ওবামার ঐতিহাসিক কিউবা সফর ছিল এই প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। ১৯২৮ সালে কেলভিন কুলিজের পরে ওবামাই কিউবা সফরকারী প্রথম ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো সে সময় অনেক চেঁচামেচি করেছেন। কিউবার রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলোতেও তখন কাস্ত্রোর এসব নেতিবাচক মতামত ছাপা হয়। তবে, এসব ছাপার উদ্দেশ্য যে শুধু ওই বৃদ্ধ নেতাকে খুশি রাখার চেষ্টা, তা সকলেই টের পেয়েছে তখন। সামষ্টিকভাবে মার্কিনমুখীতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে এবং কিউবায় নতুন যুগও শুরু হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এবং ক্রমবর্ধমান কিউবান-অ্যামেরিকানের সংখ্যা আগামী দশকগুলোতে এই দুই দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার করে তুলবে।

আফ্রিকার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি অন্যান্য বড় দেশগুলোর মতোই। তারাও এই অঞ্চলের অভাবনীয় প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের দখল চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে

চীনই বেশি এগিয়ে আছে এই মুহূর্তে। উত্তর আফ্রিকার ইসলামপন্থী জিহাদিদের ক্ষেত্রে অ্যামেরিকা সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না। তারা এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের নীতিই অবলম্বন করবে। তারা এসব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে সতর্ক দৃষ্টিতে, তবে তা নজরদারি বিমান থেকে।

অন্য দেশকে পুনর্গঠন করা নিয়ে মার্কিনিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আপাতত শেষ। ইরাক আর আফগানিস্তানকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু এই দেশগুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির মনস্তত্ত্ব এবং সামর্থ্যকে খুব ছোট করে দেখেছিল তারা। নিজের দেশের নিরাপদ পরিস্থিতি এবং জাতিগত একতার কারণে তারা ভেবেছিল যৌক্তিক গণতান্ত্রিক যুক্তি দিয়েই সব বদলে দেওয়া সম্ভব। তারা ভেবেছিল সমঝোতা, কঠোর পরিশ্রম আর গণতন্ত্রের নীতি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যেও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। কিন্তু ইরাকে ছিল প্রচুর বিভাজন। সুন্নি, শিয়া, কুর্দি, আরব, মুসলিম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরের প্রতি যে ভীতি আর হিংসার সংস্কৃতি বিদ্যমান, তা দূর করা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা ধরে নিয়েছিল, সকলেই এক হতে চায়, শুধু সুযোগের অভাবে হতে পারছে না। তারা বুঝেনি যে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে এসব জাতিগোষ্ঠী বরং একে অপর থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় বলে ভাবে। এমনটাই হয়ে এসেছে যুগে যুগে, দেশে দেশে। দীর্ঘদিন আড়ালে থাকা বিভেদ আর বিভাজনের এই দুঃখজনক বাস্তবতা মার্কিন হস্তক্ষেপের কারণে সবার সামনে উন্মোচিত হলো শুধু।

অনেক ইউরোপীয় কূটনীতিবিদ মার্কিন নীতিনির্ধারকদেরকে নির্বোধ বলে মনে করেন। এটা পুরোপুরি সত্য নয়। তবে এটা ঠিক যে তাদের মধ্যে “করে ফেলা সম্ভব” বা “মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব” জাতীয় একটা মনোভাব আছে। তারা সবকিছুই নিজেদের মতো করে সমাধান করে ফেলতে চান। কিন্তু সবসময় এই পদ্ধতিতে কাজ করা অসম্ভব।

গত ত্রিশ বছর ধরে বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সেই দিন আর নেই, অথবা দ্রুতই যুক্তরাষ্ট্রের পতন হতে যাচ্ছে। এই ভাবনা আগেও যেমন ভুল ছিল, বর্তমানেও তেমনই ভুল। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল দেশটি এখন জ্বালানিশক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চলেছে। দেশটি অর্থনীতির দিক দিয়ে এখনো অপ্রতিরোধ্য। সামরিক

গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতে ন্যাটোভুক্ত সকল দেশের সম্মিলিত সামরিক বাজটের চাইতেও বেশি খরচ করছে তারা। ইউরোপে বা জাপানে যেভাবে ক্রমেই বৃদ্ধের অনুপাত বেড়ে চলছে, যুক্তরাষ্ট্রে একেবারেই তা নয়। ২০১৩ সালের এক জরিপে দেখা গেছে বিশ্বের মোট অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ২৫ শতাংশেরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রকেই বেছে নিতে চায়। একই বছর সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের করা সেরা ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ১৭টিই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের।

প্রুসিয়ান রাষ্ট্রনায়ক অটো ফন বিস্‌মার্ক এক শতাব্দীরও বেশি আগে বলে গিয়েছিলেন, "ঈশ্বর মাতাল, শিশু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়েছেন"। কথাটি এখনো সত্যই আছে।

অধ্যায় চার

প শ্চি ম ই উ রো প



"এই অঞ্চলের সর্বত্র শুধু অতীতের গন্ধ। স্মৃতির মৌতাতে সুরভিত আস্ত এক মহাদেশ"

- মিরান্ডা রিচমন্ড মৌলিয়ট,

এ ফিফটি ইয়ার সাইলেন্স: লাভ, ওয়ার অ্যান্ড এই রুইনড হাউজ ইন ফ্রান্স



পশ্চিম ইউরোপ

বিষয়টা মানবজাতির জন্য ভালো হোক বা মন্দ হোক, আধুনিক বিশ্বের উত্থান ঘটেছে ইউরোপ থেকেই। বিশাল ইউরেশিয়া অঞ্চলের একদম পশ্চিমের অংশটাই হলো ইউরোপ। এনলাইটেনমেন্ট যুগের শুরু হয়েছিল এই ইউরোপ থেকে। এনলাইটেনমেন্ট ছিল মূলত একটা বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। আর এই এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের প্রভাবেই একটা সময় ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে সেই শিল্প বিপ্লবের অবদান। আর এই সবকিছুর জন্য দায়ী ইউরোপের অবস্থান। এটাও বলা যেতে পারে যে, পুরো পৃথিবীতে ইউরোপের এত প্রভাবের পেছনে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান একটা বড় ভূমিকা রেখেছে।

উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভেসে আসা তাজা বাতাস ইউরোপের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এখানে একদম উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার মাটিও খুব উর্বর। ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলে সারা বছর। জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হয়েছে সেই অনুপাতে। এই অঞ্চলে সারা বছরই কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে। এমনকি গ্রীষ্মকালেও কর্মপরিবেশ বিঘ্নিত হয় না। শীতকাল এখানে আসে আশীর্বাদ হয়ে। খুব বেশি ঠাণ্ডা না থাকার কারণে কাজ করতে সমস্যা হয় না। আবার যতটুকু ঠাণ্ডা থাকে, তা ফসলের রোগবালাইকে দূরে রাখে।

প্রচুর ফসল উৎপাদনের ফলে অনেকখানি উদ্বৃত্ত থেকে যায়। আর এই উদ্বৃত্ত ফসল বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি করে। একটা সময় বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরি হওয়া বাণিজ্যকুঠির সমৃদ্ধি থেকেই সেসব অঞ্চলে শহর গড়ে উঠেছিল। আর সমৃদ্ধি থাকলে মানুষ শুধু খাদ্য উৎপাদনের বাইরেও আরো নানাকিছু চিন্তা করার অবকাশ পায়। নতুন নতুন ভাবনা বা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে পারে। তা ইউরোপীয়রা করেও দেখিয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপে কোনো মরুভূমি নেই। বরফাচ্ছাদিত অঞ্চল আছে শুধু উত্তর প্রান্তে। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও এখানে খুব কমই হয়ে থাকে। এখানের নদীগুলো দীর্ঘ, চলাচলের উপযোগী এবং ব্যবসার জন্য সহায়ক। এই নদীগুলোর সাথে সংযোগ আছে অনেকগুলো সাগর এবং মহাসাগরের। শুধু তাই নয়, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলে আছে অনেক প্রাকৃতিক বন্দরও।

এই লেখাটি পড়ার সময় আপনি যদি আল্পস পর্বতমালায় তুষারবন্দি অবস্থায় থাকেন, অথবা দানিউব অঞ্চলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন, তাহলে ইউরোপের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে আপনার কাছে আশীর্বাদ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু বিশ্বের অনেক অঞ্চলের সাথে তুলনায় গেলে ইউরোপকে প্রকৃতির আশীর্বাদ ছাড়া ভিন্ন কিছু বলা যায় না। এসব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইউরোপে গড়ে উঠেছিল সভ্যতা, গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক যুগের শিল্পোন্নত নগর-রাষ্ট্র। আর এর ফলে প্রথমবারের মত যুদ্ধকেন্দ্রিক শিল্পখাতও গড়ে ওঠে এই ইউরোপেই।

সামগ্রিকভাবে ইউরোপের দিকে তাকালে দেখা যাবে অসংখ্য পর্বত, নদী এবং উপত্যকা। আর এই কারণেই সেখানে এত এত জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপের একটা বড় পার্থক্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভাষা এবং সংস্কৃতি ছিল মাত্র একটি। আর এই সংস্কৃতি আগ্রাসীভাবে দ্রুতগতিতে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ফলেই বিশাল এক দেশ তৈরি হয়েছে। অপরদিকে ইউরোপ গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিকভাবে, হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে। এখানে রয়েছে নানারকম বৈচিত্র্যময় ভাষা এবং সংস্কৃতি। তাই বর্তমান সময়ের ইউরোপও নানান ভাষাগত ও ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত।

উদাহরণ হিসেবে স্পেন ও পর্তুগাল সংলগ্ন আইবেরিয়ান উপদ্বীপের কথা বলা যায়। এই উপদ্বীপে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস। উত্তরে অবস্থিত পিরেনিজ পর্বতমালার বাধা ডিঙিয়ে তাদের পক্ষে কখনো ফ্রান্সে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার বছরের পরিক্রমায় তারা একত্রিত হয়ে স্পেন ও পর্তুগালের মত রাষ্ট্র তৈরি করেছে। আবার স্পেনও পুরোপুরি একতাবদ্ধ দেশ নয়। কাতালানরা ক্রমশই স্বাধীনতার দাবিতে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছে। ফ্রান্স দেশটিও

গঠিত হয়েছে এরকমই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার ফলে। এই দেশের সীমান্তে পিরেনিজ ছাড়াও আছে আল্পস পর্বতমালা, রাইন নদী এবং আটলান্টিক মহাসাগর।

ইউরোপের প্রধান নদীগুলো একে অপরের সাথে মিলিত হয়নি। শুধু সাভা নদী বেলগ্রেডে এসে দানিউবের সাথে মিলেছে। ইউরোপে এতগুলো দেশ থাকার পেছনে এটি একটি অন্যতম কারণ। নদীগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত না থাকায় প্রতিটি নদীই কোনো না কোনো জায়গায় এসে সীমানা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্যেকটি নদীর প্রভাবে গড়ে উঠেছে আলাদা আলাদা অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। ফলে প্রতিটি নদীর তীরেই অন্তত একটি হলেও বড় শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কালক্রমে এই শহরগুলোই রাজধানীতে পরিণত হয়েছে।

ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী দানিউব-এর (১৭৮০ মাইল দীর্ঘ) কথা বলা যায় উদাহরণ হিসেবে। এর উৎপত্তিস্থল জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট। নদীটি ক্রমাগত দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরের গিয়ে মিশেছে। দানিউব অববাহিকা প্রভাব ফেলেছে ১৮টি দেশের ওপর। সেই সাথে বেশ কয়েকটি দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সীমান্ত হিসেবেও কাজ করছে। যেমন- হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া, সার্বিয়া ও রোমানিয়া, এবং রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া। ২০০০ বছর আগে এই নদীটি ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম সীমানা-নির্দেশক। এই কারণে দানিউব নদী মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যপথে পরিণত হয়। আর এর কল্যাণেই গড়ে ওঠে ভিয়েনা, ব্রাটিস্লাভা, বুদাপেস্ট এবং বেলগ্রেডের শহরাঞ্চল, যার প্রত্যেকটিই বর্তমানে রাজধানী শহর।

একটা সময় বড় দুইটি সাম্রাজ্যের মধ্যেকার প্রাকৃতিক সীমানা হিসেবে ছিল এই দানিউব। এই দুইটি সাম্রাজ্য হলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান এবং অটোমান। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য দুইটি ছোট হয়ে আসতে থাকে এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে নতুন নতুন জাতি-রাষ্ট্র। দানিউব অঞ্চল, বিশেষ করে এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যাবে, এখানে কেন এতগুলো ছোট ছোট দেশ। অথচ উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি অঞ্চলের দেশগুলো কিন্তু বেশ বড় বড়।



চিত্র: দানিউব অববাহিকা অঞ্চল দেখে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সুবিধা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সমতলভূমি ওপরে পরস্পর-সংযুক্ত নদীগুলো প্রাকৃতিক সীমানা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। সেই সাথে সহজে চলাচলযোগ্য পরিবহণ-ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করে সমৃদ্ধ বাণিজ্য-সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

কয়েক শতাব্দী ধরেই উত্তর ইউরোপের দেশগুলো দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলোর চাইতে ধন-সম্পদে এগিয়ে আছে। দক্ষিণের তুলনায় উত্তরে শিল্পায়ন হয়েছে অনেক আগে। ফলে অর্থনৈতিক সাফল্যে উত্তর ইউরোপ এগিয়ে গেছে। উত্তরের দেশগুলোই মূলত ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র। সহজ যোগাযোগব্যবস্থা থাকায় তাদের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কে কখনো ঘাটতি হয়নি। ধনী দেশগুলো পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে গেলে সমৃদ্ধিও স্থায়ী হয়। অপরদিকে দক্ষিণের দেশ স্পেনের কথাই ধরা যাক। পিরেনিজ পর্বতমালা পার হয়ে ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা কথা স্পেনের জন্য খুবই কঠিন কাজ। ফলে বাণিজ্যের জন্য তাদের ভরসা ছিল এক পর্তুগাল অথবা জিব্রাল্টার প্রণালির অপর পারের উত্তর আফ্রিকা।

এ তো গেল ভূ-প্রকৃতিগত সমস্যার কথা। দক্ষিণ ইউরোপের পিছিয়ে থাকা নিয়ে একটা আজব তত্ত্বও আছে। অনেকে মনে করেন, রক্ষণশীল ক্যাথলিকদের আধিপত্য থাকায় দক্ষিণ ইউরোপ পিছিয়ে পড়েছে। অপরদিকে আধুনিকমনস্ক প্রোটেস্ট্যান্টদের কর্ম-সংস্কৃতি নাকি উত্তর ইউরোপকে পৌঁছে দিয়েছে অনন্য উচ্চতায়। আমি যতবারই বাভারিয়া অঞ্চলের মিউনিখ শহরে যাই ততবারই এই তত্ত্ব নিয়ে ভাবি। বিএমডাব্লিউ, অ্যালিয়েঞ্জ এবং সিমেন্সের চোখ ধাঁধানো সদর দপ্তরগুলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবারই এই তত্ত্বের অসারতা টের পাই। জার্মানির জনগণের ৩৪ শতাংশই ক্যাথলিক। আর বাভারিয়া অঞ্চল তো পুরোপুরিই ক্যাথলিক অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু ব্যবসায় তাদের উন্নতির পথে ধর্মীয় বাতাবরণ কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি।

উত্তর ও দক্ষিণের এই বিপরীত পরিস্থিতির পেছনে অপর একটি ভৌগোলিক পরিস্থিতিও বেশ খানিকটা দায়ী। দক্ষিণ ইউরোপে চাষাবাদের উপযোগী উপকূলীয় সমভূমির পরিমাণ অনেক কম। তাছাড়া খরা এবং নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয় বেশি। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় উত্তর ইউরোপের তুলনায় বেশি হলেও পৃথিবীর অন্য অংশের থেকে অবশ্য কম।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে উত্তর ইউরোপের সমভূমি ফ্রান্স থেকে রাশিয়ার উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই সমভূমির উত্তর সীমানায় আছে উত্তর সাগর এবং বাল্টিক সাগর । এই সমভূমিতে ব্যাপক পরিমাণে ফসল ফলে। এছাড়াও যোগাযোগের জন্য এই অঞ্চলে রয়েছে চমৎকার জলপথ। ফলে ফসল ও অন্যান্য পণ্য সহজেই পরিবহণ করা যায়।

এই সমভূমি অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স সব থেকে সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানে আছে। ফ্রান্স হলো ইউরোপের একমাত্র দেশ যার প্রভাব উত্তর এবং দক্ষিণ দুই অঞ্চলেই বিস্তৃত। পশ্চিম ইউরোপে এই দেশটির হাতেই সব থেকে বেশি উর্বর ভূমি আছে। এই দেশের নদীগুলোও পরস্পর-সংযুক্ত। এর মধ্যে সিন নদী পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। রোন নদী দক্ষিণে গিয়ে পড়েছে ভূমধ্যসাগরে। এসমস্ত বিষয়ের পাশাপাশি তুলনামুলক সমতল ভূখণ্ড থাকার কারণে তারা বিশেষ সুবিধা

পেয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়ার কাজটা এখানে ছিল সহজতর। শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার এই কাজটা শুরু করেছিলেন নেপোলিয়ন।

ইউরোপের দক্ষিণ এবং পশ্চিমের অনেক দেশই শুধু অবস্থানগত কারণে ইউরোপীয় ক্ষমতার মাপকাঠিতে দ্বিতীয় সারিতে পড়ে আছে। উদাহরণ হিসেবে ইতালির কথা বলা যায়। ইতালির দক্ষিণাঞ্চল সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাপকাঠিতে ইতালির উত্তরাঞ্চলের চাইতে অনেক পিছিয়ে আছে। অথচ সেই ১৮৭১ সাল থেকেই ইতালি একটি একীভূত রাষ্ট্র। সময়ের সাথে সাথে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য কমার বদলে বরং আরো বেড়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই বিভাজন ক্রমেই আরো প্রকট হচ্ছে। ভারী শিল্প, পর্যটন খাত এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র সবই উত্তরে থাকায় সেখানকার জীবন যাপনের মানও উন্নত। ফলে আজকাল নতুন কিছু রাজনৈতিক দল তৈরি হচ্ছে, যারা চায় দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে আনা হোক। এমনকি দক্ষিণাঞ্চলকে এই রাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়ার জন্য জনমত গঠনেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

স্পেনেও এমন সমস্যা আছে। নিজেদের দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা অতীতেও ভুগেছে এবং এখনো ভুগছে। স্পেনের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি উর্বর নয়। দেশটির নদীগুলোও ছোট ছোট। তার ওপর অনেক নদী গিয়ে ঢুকেছে দেশটির মাঝখানে থাকা পার্বত্য অঞ্চলে ঘেরা মেসেতা সেন্ট্রাল মালভূমিতে। ফলে স্পেনের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কখনোই খুব ভালো ছিল না। পশ্চিম ইউরোপের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পিরেনিজ পর্বতমালা। আর দক্ষিণে গেলে ভূমধ্যসাগরের অপর প্রান্ত রয়েছে আফ্রিকার দেশগুলো; এই দেশগুলো অনগ্রসর। ফলে স্পেন সেভাবে কখনোই বাণিজ্য সুবিধা পায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশটি অনেকটা একা হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা ফ্রাংকোর স্বৈরশাসনের কারণে তারা রাজনৈতিকভাবে বাকি ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফ্রাংকো মারা যান ১৯৭৫ সালে। নব্য গণতান্ত্রিক স্পেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৯০-এর দশক থেকে স্পেনের দ্রুত প্রবৃদ্ধি হতে থাকে। তারা সমৃদ্ধির দিক দিয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু

তারপরও দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে তাদের মুক্তি মেলেনি। একদিকে ছিল অতিরিক্ত ব্যয়, অপরদিকে অর্থনীতির ওপর ছিল না জোরালো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। এসব কারণে ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময় স্পেন তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে। সে সময়ে গ্রিসকেও একই রকম সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে।

গ্রিসের প্রায় পুরোটা উপকূলীয় এলাকা জুড়ে আছে একদম খাড়া পার্বত্য অঞ্চল। দেশটিতে উপকূলীয় সমভূমির পরিমাণও কম। তাই উপকূলীয় অঞ্চলে খুব বেশি ফসল হয় না। দেশের ভেতরের দিকেও প্রচুর জায়গা জুড়ে রয়েছে খাড়া পার্বত্য ভূমি। আরেকটি বড় সমস্যা হলো গ্রিসের নদীগুলো চলাচলের অনুপযোগী। অল্প কিছু উর্বর উপত্যকা আছে তাদের। এই সামান্য এলাকায় যা চাষাবাদ হয়, তা যথেষ্ট নয়। রপ্তানির জন্য যথেষ্ট ফসল তারা উৎপাদন করতে পারে না। আর এই কারণে গ্রিসে হাতে গোনা কয়েকটির বেশি উন্নত শহর গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি উচ্চশিক্ষিত বা দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলা। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের ভৌগোলিক অবস্থানও সুবিধাজনক নয়। এথেন্সের অবস্থান উপদ্বীপের এক প্রান্তে। ফলে ইউরোপের বাকি অংশ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এথেন্স। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ইজিয়ান সাগরের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল দেশটি। কিন্তু এই সাগরের ওপারে আছে বৃহৎ শত্রুরাষ্ট্র তুরস্ক। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের শুরুতে গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছে। সামরিক এবং প্রতিরক্ষা খাতে গ্রিসকে প্রচুর খরচ করতে হয়। অথচ এই খরচ যোগানোর সামর্থ্য তাদের অর্থনীতির একেবারেই নেই।

গ্রিসের মূলভূমি পার্বত্য অঞ্চল দ্বারা সুরক্ষিত। কিন্তু সমস্যা হলো, গ্রিসের সীমানার মধ্যে আছে প্রায় ১৪০০ দ্বীপ। ইজিয়ান সাগরের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে থাকা পাথরগুলোকে হিসেবে নিলে সংখ্যাটা ৬০০০ ছাড়িয়ে যাবে। এর মধ্যে প্রায় ২০০ দ্বীপে জনবসতি আছে। এই জায়গাগুলো শুধু পাহারা দিয়ে রাখতেই যথেষ্ট পরিমাণ নৌশক্তির প্রয়োজন। তার ওপর যদি আবার এসব দ্বীপকে দখল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে নৌবাহিনীর শক্তি ক্রমাগত না বাড়িয়ে উপায় নেই। এই কারণে গ্রিসকে সামরিক খাতে প্রচুর খরচ করতে

হয়। তাদের দুর্বল অর্থনীতির জন্য এটা একটা বিশাল বোঝা। কোল্ড ওয়ার চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যধ্যসাগর থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে গ্রিসকে সামরিক সহায়তা দিত যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার সাথে সাথে এসব সহায়তাও বন্ধ হয়ে যায়। গ্রিসকে কিন্তু এই খরচ এখনো বহন করে যেতে হচ্ছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ ইউরোপের মধ্যে এই ঐতিহাসিক বিভেদের প্রভাব এখনো চলমান। বিশেষ করে ২০০৮ সালে ইউরোপজুড়ে আঘাত হানা অর্থনৈতিক ধ্বস এবং ইউরো অঞ্চলজুড়ে চলতে থাকা মতাদর্শগত বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভেদ আরো প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ২০১২ সালে ইউরোপের দুর্বল দেশগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কারা সাহায্য দেবে আর কারা নেবে তা অনেক হিসেব কষে বের করা হয়। আর এই সময় ইউরো অঞ্চলের ভৌগোলিক বিভাজনও প্রকাশ্যে এসে পড়ে। দাতাদের বেশিরভাগই ছিল উত্তরের দেশ, অপরদিকে গ্রহীতা ছিল মূলত দক্ষিণের দেশগুলো। একটা সময় এসে এই প্রক্রিয়ার বিরোধীতা করতে শুরু করে উত্তর ইউরোপের দেশগুলোর জনগণ। গ্রিসের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য দেশটির আয়-ব্যয় নিয়ে সে সময় অনেক হিসাব কষা হয়। জার্মানির জনগণ ভাবল, ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে তারা যে বিপুল অংকের ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশ যাচ্ছে গ্রিসে। ওদিকে গ্রিসের জনগণ ৫৫ বছর বয়সেই অবসরে চলে যায়। তারা প্রশ্ন তুললো, তাদের রক্ত পানি করা টাকা গ্রিসে কেন যাবে। তাদেরকে জবাব দেওয়া হলো - "বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, সুখে-দুঃখে পাশে থাকার জন্য।" কিন্তু এই উত্তরটা তাদের মোটেও পছন্দ হলো না।

জার্মানির জনগণ এই প্রক্রিয়াটিতে আরো স্বচ্ছতা এবং কঠোরতা দাবি করল। জার্মান রাজনীতিবিদ উলফগ্যাং শেউবল মন্তব্য করলেন, "গ্রিসের বর্তমান করুণ পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে দেশটির সব রাজনৈতিক দল অবগত কি না, তা আমি নিশ্চিত নই।" গ্রিসের প্রেসিডেন্ট কারোলোস পাপুলিয়াস একসময় নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি এর জবাব দিলেন তীব্রভাবে। তিনি বললেন, "মিস্টার উলফগ্যাংয়ের বক্তব্য

অগ্রহণযোগ্য। তিনি আমাদের দেশকে অপমান করার কে? ডাচ বা ফিনিশরাই বা প্রশ্ন করার কী যোগ্যতা রাখে?" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গও তুললেন তিনি। বললেন, "আমরা সবসময় আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছি। এজন্য আমরা গর্বিত। শুধু নিজেদের দেশের না, আমরা ইউরোপের স্বাধীনতাও রক্ষা করেছি"। গ্রিক মিডিয়ায় শুরু হলো তোলপাড়। তারা জার্মান জাতি এবং তাদের ইতিহাস নিয়ে ব্যঙ্গ করতে লাগল। খবরের কাগজে জার্মান চ্যান্সেলর মার্কেলের ছবির ওপর হিটলারের গোঁফ সেঁটে দেওয়া হলো।

গ্রিসের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা না রাখতে পারলেও কথা বলতে ছাড়ল না গ্রিসের করদাতারা। তারা বললো, "আমাদের নিয়ে এত কিছু বলার অধিকার তো জার্মানদের নেই। ইউরোর মাধ্যমে তারাই তো সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে।" নিজদের আয়-ব্যয়ের ওপর উত্তরের দেশগুলোর এত বেশি খবরদারিকে মোটেও ভালোভাবে নেয়নি দক্ষিণের দেশগুলো। এটাকে তারা নিজেদের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি মনে করছিল।

ইউরোপীয় পরিবারের সুদৃশ্য ইমারতে চিড় ধরতে শুরু করল। পশ্চিম ইউরোপের উপকণ্ঠে থাকা গ্রিস যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই অর্থনৈতিক মন্দার কারণে। পূর্ব ইউরোপেও ফের দ্বন্দ্ব তৈরি হতে শুরু করল। সত্তর বছর ধরে ইউরোপে কোনো যুদ্ধ হয়নি। এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা এই শতকেও বজায় রাখতে গেলে প্রয়োজন পারস্পরিক বিশ্বাস আর ভালোবাসা। সেদিকটায় বোধহয় কিছুটা খামতি দেখা দিতে লাগল।

ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মগুলো শান্তিকে স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে ভেবেই বেড়ে উঠেছে। বর্তমান প্রজন্মের ইউরোপীয়রা এর বাইরে ভাবতেই পারে না। যুদ্ধকে তারা মনে করে দূর অতীতের ব্যাপার। তারা ভাবে যুদ্ধ শুধু ইউরোপের সীমানায় হতে পারে, তাদের গায়ে এর আঁচ এসে লাগার কোনো কারণ নেই। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ট্রমা কাটিয়ে সত্তর বছর ধরে বজায় থাকা শান্তি, এরপর সোভিয়েত পতন- সব মিলিয়ে পশ্চিম ইউরোপকে একটি সংঘাতমুক্ত এলাকাই ভাবতে শুরু করেছিল সবাই।

শান্তিপূর্ণ পশ্চিম ইউরোপের ধারণা নেহায়েত আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। ভবিষ্যতেও এই অবস্থা বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু শান্তির এই

বাতাবরণের নিচে ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বিশেষ করে সোভিয়েত বনাম ইউরোপ বিবাদ সহজেই যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে পোল্যান্ডের কথা বলা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে পোল্যান্ড অন্যতম শক্তিশালী এবং বৃহৎ একটি দেশ। ৩.৮ কোটি জনসংখ্যার এই দেশটি বর্তমানে সংঘাত থেকে মুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আছে। অর্থনৈতিকভাবেও বর্তমানে তারা শক্তিশালী। সোভিয়েত লৌহ যবনিকার আড়াল থেকে থেকে বেরিয়ে আসার পরে তাদের অর্থনীতি দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে। তবে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভৌগোলিক ইতিহাসের কারণে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভবিষ্যতকে নিরাপদে রাখতে চাইলে অতীতের কথা মাথায় রাখতেই হবে।

পোল্যান্ডের উত্তরের বাল্টিক উপকূল এবং দক্ষিণে কার্পেথিয়ান পর্বতমালার ঠিক মাঝখানে উত্তর ইউরোপীয় সমভূমির সব থেকে সরু অংশ পড়েছে। রাশিয়ার সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এটা তাদের জন্য একটা সুবিধাজনক জায়গা। এই জায়গায় সেনা মোতায়েন করলে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় হয়। কেউ রাশিয়াকে আক্রমণ করতে আসলে এখানে সহজেই তাদেরকে আটকে দেওয়া যাবে।

পোলিশরা এই অঞ্চল নিয়ে বারবার বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। বহুবার এই অঞ্চল দিয়ে ভিনদেশীয় সেনাবাহিনী পূর্ব বা পশ্চিম দিকে গেছে। আপনি যদি "দ্য টাইমস অ্যাটলাস অব ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি" বইটির পাতা ওল্টাতে থাকেন, তাহলে ১০০০ সালের ম্যাপে প্রথমবারের মতো পোল্যান্ডকে দেখতে পাবেন। এরপরে পাতা দ্রুত উল্টাতে থাকলে দেখবেন- পোল্যান্ডের আকার বারবার বদলেছে, কখনো তারা হারিয়েই গেছে, আবার কখনো হুট করে আবির্ভূত হয়েছে দৃশ্যপটে। এতসব রদবদলের পরে ২০ শতকের শেষদিকে বর্তমান পোল্যান্ডে রূপ নিয়েছে।

জার্মানি এবং রাশিয়া- প্রতিবেশী এই দেশ দুইটি নিয়ে পোলিশদের অতীত অভিজ্ঞতা খুব বেশি ভালো না। এছাড়াও দেশ দুইটির ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেও ওয়ারশ কোনোভাবেই তাদেরকে মিত্র হিসেবে ভাবতে পারে না। জার্মানির ব্যাপারে পোল্যান্ডের নীতি অনেকটা ফ্রান্সের মতোই। তারা চায়

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর ন্যাটোর মধ্যে আটকে থাকুক জার্মানি। এদিকে বর্তমান ইউক্রেন সংকটকে ঘিরে রাশিয়াকে নিয়ে তাদের নিকট অতীতের ভীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পোল্যান্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ভূখণ্ডে রাশিয়ার আগ্রাসন বাড়তে-কমতে দেখেছে। রাশিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন আগ্রাসন কমে আসতে থাকে, সে সময় পোল্যান্ডের সামনে একটাই পথ খোলা ছিল। তারা বৃটেনের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নয়ন করার প্রয়াস নেয়।

অবশ্য এই ব্রিটেন ১৯৩৯ সালে পোলিশদের সাথে এক ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে-সময় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে পোল্যান্ডের একটি চুক্তি ছিল। তারা কথা দিয়েছিল, জার্মানি যদি পোল্যান্ডে আক্রমণ করে তারা পোল্যান্ডের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তারা সে কথা রাখেনি। জার্মানরা যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে তখন ব্রিটেন এবং ফ্রান্স চুপচাপ ম্যাজিনো লাইনের পেছনে বসে থাকল। ফলে জার্মানি পোল্যান্ডকে দখল করে নেয়। ১৯৮৯ সালে স্বাধীন হওয়ার পর প্রধান মিত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নেয় পোল্যান্ড। তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে যুক্তরাজ্যের সাথেই তাদের সম্পর্কটা বেশি উষ্ণ।

রাশিয়ার কথা মাথায় রেখেই যুক্তরাষ্ট্র আর পোল্যান্ড পরস্পরের সাথে এতটা ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখে। ১৯৯৯ সালে ন্যাটোতে যোগ দেয় পোল্যান্ড। এর ফলে মস্কোর আরো ৪০০ মাইল কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয় সামরিক জোটটি। এই সময়ের মধ্যে সাবেক ওয়ারশ-প্যাক্টভুক্ত অনেক দেশই ন্যাটো জোটভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৯৯ সালে ন্যাটো রাশিয়ার চোখের সামনে তাদের মিত্র সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। ১৯৯০-এর দশকে আসলে রাশিয়ার তেমন কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। সেইসময় নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত ছিল তারা। কিন্তু বরিস ইয়েলৎসিনের আমল শেষ হওয়ার পর পুতিন এসে রাশিয়ার হাল ধরলে তারা আবার আগ্রাসী হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৭০ সালে হেনরি কিসিঞ্জার একটি বিখ্যাত প্রশ্ন করেছিলেন, “ইউরোপের সাথে কথা বলতে চাইলে কাকে ফোন করতে হবে?” পোলিশরা এই প্রশ্নটাকে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নিয়েছে, “রাশিয়া যদি আমাদের

আক্রমণ করে তাহলে কাকে ডাকব? ব্রাসেলস, না কি ওয়াশিংটন?" তারা এখন উত্তরটি জেনে গেছে।

বলকান দেশগুলোও এখন আর কোনো বৃহৎ সাম্রাজ্যের অংশ নয়। এই অঞ্চলের পুরোটাই পার্বত্যভূমি। এই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সেভাবে কখনোই যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারেনি। একতা তৈরি না হওয়ার ফলে এই অঞ্চলে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট অনেকগুলো রাষ্ট্র। একসময় তারা চেয়েছিল একত্রে একটা বড় দেশ হিসেবে থাকতে। সেই দেশের নাম ছিল 'ইউনিয়ন অফ সাউদার্ন স্লাভস', যাকে আমরা ইয়ুগোস্লাভিয়া (যুগোস্লাভিয়া) নামে জানি। কিন্তু ইয়ুগোস্লাভিয়া ভেঙে গেছে অনেক আগেই। ১৯৯০ এর যুদ্ধের পর সাবেক ইয়ুগোস্লাভ দেশগুলো পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়। শুধু সার্বিয়াই এখনো রাশিয়ার মুখাপেক্ষী। কারণ এই দেশটিতে স্লাভিক জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ইস্টার্ন অর্থোডক্স ধর্ম সব থেকে প্রভাবশালী। রাশিয়া এখনো ১৯৯৯ সালের ঘটনা ভোলেনি। পশ্চিমারা সে-সময় সার্বিয়া আক্রমণ করে কসোভোকে আলাদা করে ফেলেছিল। রাশিয়া ভাষাগত, জাতিগত এবং ধর্মীয় নৈকট্য দেখিয়ে এখনো চেষ্টা করছে সার্বিয়াকে হাতের মুঠোয় রাখার। সেই সাথে জ্বালানি চুক্তির সুবিধাও তারা দিচ্ছে সার্বিয়াকে।

এই অঞ্চলটা এখন অর্থনৈতিক আর কুটনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে বলা যায়। বিসমার্ক অনেক আগে বলে গেছেন, "বলকান অঞ্চলে একটা ছোট্ট বোকামিই বিশাল যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে"। প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চল নিয়ে বর্তমানে উঠেপড়ে লেগেছে ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তুরস্ক আর রাশিয়া। আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া আর রোমানিয়া ঠিক করেছে তারা ন্যাটোর সাথেই থাকবে। আলবেনিয়া ছাড়া অন্য দেশগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত। স্লোভেনিয়াও আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে।

আঞ্চলিক উৎকণ্ঠা একদম উত্তরের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলেও ছড়িয়ে গেছে। এখানকার দেশগুলোর মধ্যে ডেনমার্ক আগেই ন্যাটোর সদস্য ছিল। সুইডেন প্রায় দুই শতাব্দী ধরে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু ২০১৩ সালে আচমকা এক রাতে সুইডেনের আকাশে বোম্বিং-এর মহড়া দিতে শুরু করে রাশিয়ান যুদ্ধবিমান। সুইডেনের প্রতিরক্ষা বাহিনী তখন ছিল নীরব

দর্শকের ভূমিকায়। এমনকি কোনো যুদ্ধবিমানও উড়ায়নি তারা। সে-সময় ডেনমার্কের বিমান রাশিয়ান বিমানকে ধাওয়া দিয়ে ফেরত পাঠায়। এতকিছুর পরেও সুইডেনের অধিকাংশ নাগরিক ছিল ন্যাটোর সদস্যপদের বিরোধী। রাশিয়াও হুমকি দিয়ে রেখেছিল, সুইডেন বা ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দিলে তারা প্রতিক্রিয়া দেখাতে 'বাধ্য' হবে। রাশিয়ার এই ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী আচরণের কারণে সম্প্রতি ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন উভয় দেশই ন্যাটোয় যোগ দিয়েছে। এভাবে বাফার রাষ্ট্রের সংখ্যা কমে আসার ফলেই সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেনে চূড়ান্ত রাশিয়ান আগ্রাসন শুরু হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোর অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোর একজোট হয়ে এই রাজনৈতিক জটিলতা মোকাবেলা করা প্রয়োজন। তবে জার্মানি এবং ফ্রান্সের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় না থাকলে এই ঐক্য সম্ভব নয়। ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে প্রাকৃতিক সীমানা, জলবায়ু এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফ্রান্স সবসময়ই বিশেষ সুবিধা পেয়ে এসেছে। ফ্রান্স প্রায় সব দিক থেকেই প্রাকৃতিকভবে সুরক্ষিত। শুধু একটা অংশ ছিল কিছুটা অরক্ষিত। সেটা হলো: উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমতল এই অংশটি এখন জার্মানির অন্তর্ভূক্ত। জার্মানি একক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে এই অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্সকে তেমন ভাবতে হয়নি। রাশিয়া থেকে ফ্রান্স অনেকটাই দূরে। মঙ্গোল বাহিনীও কখনো ফ্রান্সে এসে পৌঁছাতে পারেনি। আর ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মাঝখানে আছে ইংলিশ চ্যানেল। ফলে পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করে ফ্রান্স দখল করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বরং ফ্রান্সই ছিল ইউরোপের সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র। নেপোলিয়নের সময়ে ফ্রান্স এমনকি মস্কো পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়।

এরপর জার্মানরা একত্রিত হলো। অনেকদিন ধরেই তারা এই চেষ্টা করে যাচ্ছিল। জার্মানি দেশটার সৃষ্টি প্রক্রিয়া কয়েক শতাব্দী ধরেই চলছিল। দশম শতকে ক্যাথলিক রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় তৎকালীন ফ্রাঙ্কিয়ার পূর্বাংশ। এই অঞ্চলকে অনেকসময় জার্মানি নামে ডাকা হতো। কারণ এই অঞ্চলে তখন ছিল ৫০০টির মত ক্ষুদ্রকায় "জার্মানিক রাজ্য"। ১৮০৫ সালে সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ফরাসি শাসক নেপোলিয়ন। এর পরিপ্রেক্ষিতে

১৮০৬ সালে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ১৮১৪ সাল নাগাদ নেপোলিয়নের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ন পরবর্তী ইউরোপের নতুন রূপরেখা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে সে বছরই ভিয়েনা কংগ্রেস নামে এক আলোচনা সভা শুরু করেন ইউরোপীয় নেতারা। ১৮১৫ সালে এই কংগ্রেসে জার্মান অঞ্চলের ৩৯টি ক্ষুদ্র রাজ্যকে একজোট করে 'জার্মান কনফেডারেশন' গঠন করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে গঠিত হয় 'নর্থ জার্মান কনফেডারেশন'। ১৮৭০-১৮৭১ সালে জার্মান রাজ্য প্রুশিয়ার সাথে ফ্রান্সের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয় এবং জার্মানরা প্যারিস দখল করে নেয়। এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭১ সালে আমরা পাই অখণ্ড জার্মানিকে, যার নামকরণ করা হয় প্রুশিয়ান সাম্রাজ্য। এভাবে ফ্রান্স পেয়ে গেল একটি শক্তিশালী প্রতিবেশীকে। আর এই নতুন প্রতিবেশী আয়তনে ফ্রান্সের চাইতেও বড়। দুই দেশের জনসংখ্যাও প্রায় সমান। আবার শিল্প, প্রযুক্তি ও সমৃদ্ধির বিচারে তারা ফ্রান্সের চাইতেও এগিয়ে।

১৮৭১ সালে প্যারিসের উপকণ্ঠে, ভার্সেইয়ের প্রাসাদে জার্মানির একত্র হওয়ার ঘোষণা আসে। ফ্রান্সের নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতম এলাকা ছিল উত্তর ইউরোপের সমভূমি। জার্মানরা এই অঞ্চল দিয়েই ফ্রান্সে প্রবেশ করে এবং এই অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এই অঞ্চল দিয়ে ফ্রান্সে আক্রমণের ঘটনা পরবর্তী ৭০ বছরে আরো দুইবার ঘটে। পূর্ব দিক থেকে আসা আক্রমণ ঠেকাতে ফ্রান্স তার নীতিতে বদল আনে। যুদ্ধের বদলে তারা বেছে নেয় কূটনৈতিক পদক্ষেপ।

ফ্রান্সের চেয়ে অবশ্য জার্মানির সামনে ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। তাদের পশ্চিমে ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী ফ্রান্স আর পূর্ব দিকে বিশাল রাশিয়া। এই দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি দিয়ে যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। এই দুই দেশের একযোগে আক্রমণ করা নিয়ে জার্মানি সব থেকে বেশি উদ্বেগে থাকত। এরকম কখনোই ঘটেনি, কিন্তু এই সম্ভাব্যতা নিয়ে উদ্বেগ থেকেই জার্মানি কয়েক দফায় ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ফ্রান্স জার্মানিকে ভয় পেত, জার্মানিও ভয় পেত ফ্রান্সকে। ১৯০৭ সালে ফ্রান্স যখন রাশিয়া আর বৃটেনের সাথে মিত্রতা-চুক্তি করলো, জার্মানি তখন আরো

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ নৌবাহিনী যে কোনো সময় উত্তর সাগর অবরোধ করে জার্মানির জন্য আটলান্টিকে ঢোকার পথ বন্ধ করে দিতে পারত। এইসব ভয় আর উদ্বেগ থেকেই জার্মানি দুইবার ফ্রান্স আক্রমণ করে।

জার্মানির এই ক্রমাগত উদ্বেগ ইউরোপের জন্য ভালো ফল বয়ে আনেনি। ভৌগোলিক সমস্যার কারণে জার্মানির অত্যাধিক আক্রমণাত্মক হওয়ার এই প্রবণতাকে ইতিহাসে "দ্যা জার্মান কোশ্চেন" বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পর এর জবাব খোঁজার প্রয়োজন বোধ করে ইউরোপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও আগের এক শতাব্দী জুড়ে ইউরোপে একের পর এক যুদ্ধ হয়েছে। এই সমস্যার সমাধানে নিজেদের ভূমিতে বাইরের এক পরাশক্তির অবস্থান নিশ্চিত করলো ইউরোপ। পরাশক্তিটির নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই ন্যাটো গঠিত হয় এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনী ইউরোপকে দিল নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। যুদ্ধে যুদ্ধে বিপর্যস্ত ইউরোপের এমন একজন মিত্রই দরকার ছিল। তারা ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে বিশ্বাস, আশাবাদ আর ভ্রাতৃত্বের কথা শোনাল, বুঝাল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি এবং ফ্রান্সকে পরস্পরের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা। এমনভাবে বেঁধে রাখা, যেন কোনোভাবে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের পর ইউরোপের গোটা চিত্রই বদলে গেল। এর ফলে বিশাল একটা ভৌগোলিক অঞ্চল তৈরি হলো, যাকে এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি বলা যায়।

এই মৈত্রীর সুবিধা সবচেয়ে ভালোভাবে নিয়েছে জার্মানরা। যে ভৌগোলিক পরিস্থিতি নিয়ে তাদের এতকালের উদ্বেগ ছিল, তা এখন তাদের জন্য সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তারা ছিল একদমই বিধ্বস্ত একটি দেশ। সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইউরোপের সেরা উৎপাদনশীল দেশে পরিণত হয়েছে জার্মানি। কোনো পণ্যের গায়ে "মেইড ইন জার্মানি" লেখা থাকলে সেটার মান নিয়ে আর সংশয় থাকে না। ইউরোপের সমতল ধরে জার্মানি আগে পাঠাত সৈন্য, আর এখন তারা

তাদের পণ্য পাঠাতে শুরু করল। এই উচ্চমানসম্পন্ন পণ্যগুলো রাইন ও এলব নদী হয়ে এবং আন্তর্জাতিক মহাসড়ক ধরে ইউরোপের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সবখানে গেল। ছড়িয়ে পড়তে লাগল পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

১৯৫১ সালে যার শুরু ছিল কয়লা আর ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রিক ছয়টি দেশের কমিউনিটি হিসেবে, সময়ের সাথে সাথে তা পরিণত হলো ২৮টি দেশ নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নে। তবে প্রথম অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কাটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের গায়ে বেশ জোরেসোরেই লেগেছিল। তাদের মজবুত বন্ধন যেন কিছুটা ঢিলে হয়ে যায় এতে। ভূ-রাজনীতি বিষয়ক লেখক রবার্ট ক্যাপলান একে বলেছেন "ভূগোলের প্রতিশোধ"।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮টি দেশের মধ্যে ১৯টি দেশ ১৯৯৬ সালে নিজেদের জন্য একটি অভিন্ন মুদ্রা চালু করার প্রস্তাব দেয়। মুদ্রার নাম হবে ইউরো। যুক্তরাজ্য আর ডেনমার্ক ছাড়া সব দেশই এই প্রস্তাবে রাজি হয়। কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড পুরণ করতে পারার পরিপ্রেক্ষিতে বাকি ৭টি দেশও এই মুদ্রাব্যবস্থায় যুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা এখন পরিষ্কার যে, ১৯৯৯ সালে যখন ইউরো প্রবর্তিত হয়, অনেক দেশই তখন এই অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বন্ধুত্বের সূত্র ধরে সেই সময়ে অনেক দেশই চোখ-কান বন্ধ করেই ইউরোকে বেছে নিয়েছিল। এই দেশগুলোর কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল, যেমন- বেকারত্ব, দেনা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি। মূল সমস্যা হলো, অনেকেই এসব সমস্যা গোপন করে যায়। যেমন, গ্রিস নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখায়। তারা ইউরোর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেনি। ইউরো গ্রহণ করা গ্রীসের অর্থনীতির জন্য ছিল খুবই লাভজনক। বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়গুলো বুঝেছিলেন। কিন্তু ইউরোকে যেহেতু স্রেফ একটি মুদ্রা নয়, বরং সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তাই বাকিরা ব্যাপারটি দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন।

ইউরোর মাধ্যমে সংযুক্ত দেশগুলো পরস্পরের সুখে-দুঃখে একসাথে থাকবে বলে কথা দিয়েছিল। গ্রিক প্রবাদে একে বলা হয় "স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতায় একসাথে থাকা"। কিন্তু ২০০৮ সালে যখন প্রবল অর্থনৈতিক মন্দা এল, তখন আর এই ফাঁকফোকরগুলো এড়িয়ে যাবার উপায় রইল না। অর্থনৈতিকভাবে

শক্তিশালী দেশগুলো তখন দুর্বল দেশগুলোকে সাহায্য করতে বাধ্য হলো। আর এর ফলে তাদের নিজেদের দেশে তৈরি হলো এক ধরনের অভ্যন্তরীণ তিক্ততা। এসব নিয়ে দেশগুলোর মধ্যে এখন পারস্পরিক দোষারোপ চলছে।

ইউরো সংকট এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ইউরোপীয় পরিবারে দেখা দিয়েছে অশান্তির ফাটল। উত্তর ইউরোপ এবং দক্ষিণ ইউরোপের মধ্যেকার চলে আসা বিভাজন আরো প্রকট হচ্ছে। একত্র হয়ে থাকার স্বপ্ন ফিকে হয়ে তো আসছেই, ভেঙে পড়ারও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যেই ব্রিটেন ২০২০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এই একতা যদি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, তাহলে জার্মানদের নিয়ে পুরনো সেই ভীতি আবারও ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে।

সত্তর বছর সুখে-শান্তিতে থাকার পর এমন কথা বললে আতঙ্কপ্রবণতা মনে হতে পারে। শান্তি এবং গণতন্ত্র রক্ষার্থে গত সত্তর বছরে জার্মানিই সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ইউরোপের বিগত সাতশো বছরে পারস্পরিক যুদ্ধের ইতিহাসের দিকে তাকালে "জার্মান প্রশ্ন"কে চাপা দেওয়ার কোনো উপায় নেই।

এমনিতে ভদ্র সভ্য ইউরোপীয় হয়ে থাকার ব্যাপারে জার্মানি বদ্ধপরিকর। কিন্তু তারা জানে, ইউরোপীয়দের এই একতা যদি ভেঙে যায়, তাহলে জার্মানদের নিয়ে বাকিদের ভীতি আবার ফিরে আসবে। তার ওপরে এই মুহূর্তে তারা ইউরোপের সবচেয়ে ধনী এবং জনবহুল দেশ। দেশটির জনসংখ্যা ৮.২ কোটি। দেশটি পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি এবং তৃতীয় বৃহত্তম পণ্য রপ্তানিকারক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভেঙে গেলে সবাই যদি সুরক্ষানীতি তৈরি করে, তবে ইউরোপে তাদের বাজার হারাতে হবে।

জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে জার্মানির বয়স মাত্র ১৫০ বছর হলেও ইউরোপের জন্য বর্তমানে তারা অপরিহার্য শক্তি। অর্থনৈতিক সক্ষমতায় ইউরোপে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইউরোপীয় ইউনিয়নে তাদের এতটাই প্রভাব, তারা নরম গলায় কথা বললেও গোটা মহাদেশ তাদের কথা শুনতে বাধ্য হয়। তবে, বৈশ্বিক কূটনীতির বিষয়ে তাদের তেমন উচ্চবাচ্য করতে বা প্রভাব খাটাতে দেখা যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত স্মৃতি থেকে জার্মানি এখনো বের হয়ে আসতে পারেনি। সোভিয়েত-ভীতির কারণে বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে জার্মানিকে আবারও সামরিকায়ন করতে বাধ্য হয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপ। তবে জার্মানি প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে এই সামরিকায়নে বাধ্য হয়। তারা সামরিক শক্তি ব্যবহারের একদমই পক্ষপাতী নয়। কসোভো আর আফগানিস্তানের সংকটের সময় তারা দায়সারাভাবে সামরিক শক্তি পাঠায়। লিবিয়ার প্রসঙ্গে তো জার্মানি একদমই নিশ্চুপ ছিল। একমাত্র ইউক্রেনের ক্ষেত্রেই কৌশলগত কারণে তাদেরকে কিছুটা সরব থাকতে দেখা গেছে। আর এতেই বুঝা যায়, জার্মানির নজর আসলে কোন দিকে।

২০১৪ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে জার্মানির প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। রাশিয়ার ক্রিমিয়া অধিগ্রহণের ইস্যুতেও তাদেরকে সরব দেখা গেছে। তবে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে তারা চুপ থেকেছে। কারণ, রাশিয়া থেকে আসা গ্যাস পাইপলাইনের ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের সাথে জার্মানি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। তবে দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এই বন্ধন আলগা হয়ে যেতে পারে। জার্মানির ভৌগোলিক অবস্থান তাদেরকে এক পা পূর্ব দিকে দিয়ে রাখতে বাধ্য করে। প্রয়োজনের তাগিদে মস্কোর সাথে সম্পর্ক ঝালাই করে নিতে পারে তারা।

আটলান্টিকের অনেকখানি গভীরে বসে যুক্তরাজ্য বাকি ইউরোপকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। কখনো তারা হন্তদন্ত হয়ে মহাদেশীয় বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে চলে আসে। আবার কখনো একদম চুপচাপ এবং বিচ্ছিন্ন থাকে। তারা চায়, ইউরোপে তাদের চেয়ে বড় কোনো শক্তির উত্থান যেন কখনো হতে না পারে। যুগে যুগে এটাই ছিল তাদের নীতি। এই নীতি অনুযায়ীই তারা এজিনকোর্ট, ওয়াটারলু এবং বালাক্লাভার রণাঙ্গনে লড়েছে।

ভৌগোলিকভাবে ব্রিটেন যথেষ্ট ভালো অবস্থায় আছে। তাদের ভূমি বেশ উর্বর। তাদের নদীগুলোও নৌ পরিবহনের জন্য উপযোগী। পাশেই আছে সাগর এবং প্রচুর জলজ সম্পদ। ইউরোপের মূলভূমি কাছাকাছি থাকায় এই মহাদেশের দেশগুলোর সাথে ব্যবসা করার সব পথ তাদের জন্য খোলা। আবার

দ্বীপদেশ হওয়াটা প্রতিরক্ষার জন্য খুবই সুবিধাজনক। প্রতিবেশী দেশগুলো যখন যুদ্ধ এবং বিপ্লবে বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে, সে সময় তারা নিজের ভৌগোলিক অবস্থানকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

দুই বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদেরও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতক বা তার পূর্ববর্তী সময়ের যুদ্ধে ইউরোপের মূলভূমিতে যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে, ব্রিটেনের ক্ষতি তার ধারেকাছেও আসে না। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক দেশ অন্য দেশের ওপর হামলা চালিয়েছে। বারবার বদলে গেছে বিভিন্ন দেশের সীমানা। ব্রিটেন সে সময় নিজেদের দ্বীপে চুপচাপ বসে থেকেছে। এই ধরনের কোনো স্মৃতি বাকিদের মতো তাদেরকে ভোগায় না।

কয়েক শতাব্দী ধরে যুক্তরাজ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর চেয়ে বেশি সুরক্ষিত থেকেছে। এই কারণেই হয়তো পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মতো এই দেশে কখনো স্বৈরশাসক আসেনি। ঐতিহাসিকভাবেই তারা গণতন্ত্রের পক্ষে। ১২১৫ সালের ম্যাগনা কার্টা চুক্তি অথবা ১২৫৮ সালের অক্সফোর্ডের বিধান তাদেরকে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অথচ আটলান্টিকের অপর পাড়ের দেশগুলোতে গণতন্ত্র আসতে লেগে যায় আরো কয়েক শতাব্দী।

যুক্তরাজ্যের শক্তিমত্তার পেছনে একটা খুব সহজ তত্ত্ব প্রচলিত আছে। যদিও এই তত্ত্ব নিয়ে অনেক সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক আছে; তত্ত্বটি প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। তা হলো- ব্রিটিশ দ্বীপের চারপাশে সাগর এবং ভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণ গাছ থাকার কারণে তারা শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। আর এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়েছে। এই অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের ফলেই সেদেশে শিল্প বিপ্লব এসেছে। আর এর ফলেই বিশ্বজুড়ে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটেন ইউরোপের বৃহত্তম দ্বীপ হলেও, দেশ হিসেবে বৃহত্তম নয়। অথচ অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত তারা যেভাবে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তবে, বিংশ শতক থেকেই তাদের সে প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে শুরু করেছে।

দেশটির অবস্থান দেশটিকে বেশকিছু কৌশলগত সুবিধা দিয়ে আসছে। এর মধ্যে একটা হলো GIUK গ্যাপ (গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য) -এর

কারণে পাওয়া বিশেষ সুবিধা। ইউরোপের উত্তর প্রান্তের সাগরগুলো থেকে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ঢোকার সব থেকে সুবিধাজনক পথ এটি। হরমুজ বা মালাক্কা প্রণালির মতো বাণিজ্যিক গুরুত্ব না থাকলেও এর নিজস্ব গুরুত্ব আছে। এই অঞ্চলটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। আর এই সংকীর্ণ জায়গা উত্তর আটলান্টিকে যুক্তরাজ্যকে বরাবরই সুবিধাজনক অবস্থানে রেখেছে। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস বা ফ্রান্সের মত উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলোর নৌবাহিনীকে হয় গিউক গ্যাপ দিয়ে উত্তর আটলান্টিকে আসতে হবে, অথবা ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে আটলান্টিকে যেতে হবে। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল আরো বেশি সংকীর্ণ। ডোভার প্রণালিতে জায়গাটা মাত্র ২০ মাইল চওড়া। ফলে প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা খুব সহজ। রাশিয়ান যুদ্ধজাহাজকে আর্কটিক থেকে আটলান্টিকে ঢুকতে হলে গিউক গ্যাপ ছাড়া গতি নেই।

যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনী যখন আরো শক্তিশালী ছিল, তখন সুবিধাটা তাদের আরো বেশি কাজে লাগত। তবে এখনো যে কাজে লাগে না, তা নয়। বিশেষ করে যুদ্ধ বাঁধলে তারা এই অঞ্চলগত সুবিধাটা কাজে লাগাতে পারবে। এই কারণেই ২০১৪ সালের গণভোটে যখন স্কটল্যান্ডের স্বাধীন হওয়ার জোর সম্ভাবনা দেখা দেয়, লন্ডন তখন রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। উত্তর আটলান্টিক এবং আর্কটিক অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালে বড় আকারের কৌশলগত ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাদের।

আগের মতো শক্তিমত্তা না থাকলেও, অতীতের গৌরব এখনো রয়ে গেছে ব্রিটিশদের মনে। ব্রিটিশ জনগণ এখনো মনে করে বিশ্বের কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটলে সেখানে ব্রিটেনের কিছু একটা বলা উচিত। ইউরোপের অংশ হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে তারা। এই বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সমাধানে আসা যায়নি।

৪০ বছর ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত থাকার পরে ব্রিটিশরা ভাবল এর অংশ হয়ে থাকা না থাকা নিয়ে গণভোটের আয়োজন করতে হবে। মূলত দুইটি বিষয় তাদেরকে ইইউ থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতে বাধ্য করেছে। বিষয় দুইটি হচ্ছে- সার্বভৌমত্ব এবং অভিবাসী সংকট। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিভিন্ন সময় নানারকম আইন জারি করেছে। সদস্যচুক্তির শর্ত হিসেবে

ব্রিটেনকেও সে সব আইন মানতে বাধ্য হতে হয়েছে। যেমন- ব্রিটেনের আইনে অভিযুক্ত নয়, এমন কোনো বিদেশিকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া যাবে না, কারণ এই ব্যাপারে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কমিশনের নিষেধাজ্ঞা আছে। এই ধরনের অনেক আইনকেই ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের একাংশ তাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত হিসেবে দেখেন। পাশাপাশি, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আসা অভিবাসী ও শরণার্থীর স্রোত বাড়ার সাথে সাথে ব্রিটেনে ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী মনোভাব বেড়ে চলেছে। এই অভিবাসীদের বড় অংশ ব্রিটেনে ঢুকতে চায়। আর ইইউভুক্ত যেসব দেশে তারা এসে ঢোকে তারাও এই অভিবাসীদেরকে ব্রিটেনেই পাঠাতে চায় বলে ধারণা করা হয়। এসব কারণে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রায় আসে। আর ২০20 সালে সে প্রস্থান বা ব্রেক্সিট (Brexit) কার্যকর হয়।

অর্থনৈতিক মন্দার সময় বরাবরই বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হয় অভিবাসীদের। ইউরোপে চলমান সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের সময়েও তার ব্যত্যয় হয়নি। গোটা ইউরোপ মহাদেশজুড়ে এই বিদ্বেষ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আর এই কারণেই ডানপন্থী রাজনীতির উত্থান ঘটেছে ইউরোপজুড়ে। সব দেশের প্রায় সকল ডানপন্থী দলই উগ্রভাবে একক ইউরোপীয় সত্ত্বার বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। আর এর ফলে দুর্বল হয়ে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বন্ধন।

এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ২০১৬ সালের গোড়ার দিকে। এই সময় থেকে সুইডেন গত ৫০ বছরে প্রথমবারের মতো ডেনমার্ক থেকে আগত ভ্রমণকারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা শুরু করে। উত্তর ইউরোপে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা শরনার্থীর ঢল এবং ২০১৫ সালের নভেম্বরে প্যারিসে ইসলামিক স্টেটের হামলার প্রতিক্রিয়াতেই এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৬টি দেশের মধ্যে সীমান্তবিহীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার যে ধারণা ছিল তা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে একে একে অনেক দেশই নিজেদের সীমান্তে আবারও কড়াকড়ি আরোপ করতে শুরু করেছে। সুইডেনের দেখাদেখি ডেনমার্কও জার্মানি থেকে আগতদের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। এর ফলে ভ্রমণের খরচ ও ঝামেলা

দুইই বেড়ে যাচ্ছে। আর এই গোটা বিষয়টা একক ইউরোপের ধারণার ওপরে সার্বিক আঘাত হয়ে এসেছে।

ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে। জনমিতির পুর্বাভাস অনুযায়ী ইউরোপে ক্রমেই বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে এবং তরুণের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে কমে যাচ্ছে করদাতার পরিমাণ। এসব পূর্বাভাসে অভিবাসীদের নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের বিদ্বেষ কমেনি। নিজেদের পরিচিত জগৎ হারিয়ে ফেলার শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এসব স্থানীয় জনসাধারণ। আর জনমিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে জাতিরাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতিতেও পরিবর্তন আসছে। মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক নীতিতে বদল আসছে। যেমন, ইরাক যুদ্ধ বা ইজরাইল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ নিয়ে কিছু করার আগে ইউরোপের অনেক সরকারকেই মাথায় রাখতে হচ্ছে নিজ দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনুভূতির কথা।

ইউরোপের সামাজিক রীতিনীতিতেও বদলে যাওয়া এই জনমিতির প্রভাব পড়ছে। ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার শহরাঞ্চলে মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে নারী অধিকার, হিজাব, ব্লাসফেমি আইন ও বাক স্বাধীনতাসহ নানা বিষয়ে বিতর্ক। ভলতেয়ার বাক স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি তোমার মতের বিরোধী হতে পারি, কিন্তু জীবন দিয়ে হলেও তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখব।" কিন্তু বর্তমান সময়ে এই বক্তব্য পাল্টে যাওয়াটাই নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের মত প্রকাশের জন্যই উল্টো জীবন দিতে হচ্ছে। ধর্মের অবমাননা নিষিদ্ধ করার পক্ষে জনমত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একটা সময় উদারপন্থীরা সর্বতোভাবে ভলতেয়ারকে সমর্থন দিয়ে গেলেও বর্তমানে তারা ক্রমেই আপেক্ষিকতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। ২০১৫ সালে ব্যঙ্গধর্মী ফরাসি পত্রিকা শার্লি এবদোর কর্মীরা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার পরে এই নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। তবে, উদারপন্থীদের একাংশ সেই নিন্দা জানিয়েছেন এভাবে- "আমিও এর নিন্দা জানাই, কিন্তু ব্যাঙ্গগুলোও বড্ড বাড়াবাড়ি ছিল"। আধুনিক যুগের ইউরোপে এই ধরনের বক্তব্য আগে কখনো শোনা যায়নি। বর্তমানে এসবই ইউরোপের সাংস্কৃতিক যুদ্ধের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয়েই প্রতিনিয়ত নানারকম সাংগঠনিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এই সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু সমাধান না হলে তারা জোট হিসেবে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। তখন হয়তো আবার সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রে পূর্ণ ইউরোপকে দেখতে পাবো আমরা। সবগুলো রাষ্ট্রই তখন নতুন করে নানারকম জোট বাঁধতে শুরু করবে। জার্মানরা আবারও রাশিয়ান এবং ফরাসিদের ঘেরাওয়ে আটকে পড়ার ভয় পেতে শুরু করবে। ফরাসিরা আবার তাদের বৃহৎ প্রতিবেশী জার্মানির ভয়ে অস্থির হয়ে থাকবে। আমরা আবার ফিরে যাব বিংশ শতকের গোড়ার পরিস্থিতিতে।

ফরাসিদের জন্য এই ঘটনা হবে বিকট দুঃস্বপ্ন। তারা ভালোয় ভালোয় জার্মানিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের খাঁচায় আটকাতে পেরেছিল। তারা ভেবেছিল জার্মানির নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে। কিন্তু বার্লিন দেওয়ালের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই জার্মানি যখন একীভূত হলো তখনই পাশার দান উলটে গেল। দুই ইঞ্জিনের গাড়িতে চেপে তরতরিয়ে চলতে থাকল জার্মানি। দেখা গেলো যে জার্মানরাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন চালাচ্ছে আর ফ্রান্স যাত্রী হয়ে বসে আছে। এর ফলে ফ্রান্সের ঘাড়ে এমন একটা সমস্যা এসে পড়ল, যা তারা এখনো সমাধান করে উঠতে পারেনি। ইউরোপীয় ইউনিয়নে জার্মানিই বর্তমানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল মালিক। আর জার্মানির সিদ্ধান্ত চুপচাপ ফ্রান্সকে মেনে নিতে হয়। কারণ তা না হলে ইউরোপের একতা বাধাপ্রাপ্ত হবে। আবার জার্মানির নেতৃত্ব মেনে নিলে তাদের নিজেদের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

ফ্রান্স এককভাবেই পররাষ্ট্রনীতি তৈরির সামর্থ্য রাখে। তারা পারমাণবিক হামলা প্রতিরোধে সক্ষম। দেশের বাইরে তাদের ঘাঁটি এবং উপনিবেশ দুই-ই আছে। সামরিক বাহিনীর সহায়ক হিসেবে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারও আছে তাদের হাতে। তারপরেও তারা জার্মানিকে সমঝে চলে কারণ পূর্ব দিকে জার্মানি থাকায় এদিকটা সুরক্ষিত থাকে। আর এই সুযোগে তারা ইউরোপের বাইরে নাক গলাতে পারে।

জার্মানি এবং ফ্রান্স দুই দেশই একযোগে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। তারা একে অপরকে স্বাভাবিকভাবেই মিত্র হিসেবেই

দেখে। কিন্তু জার্মানি তাদের প্ল্যান বি-তে আরেকটা দেশকে রেখেছে। সেই দেশ হচ্ছে রাশিয়া।

কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার পর থেকে ক্রমেই সামরিক খাতের বাজেট কমিয়ে আনছে ইউরোপের দেশগুলো। তাদের সশস্ত্র বাহিনীও ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ২০০৮ সালের রাশিয়া-জর্জিয়া যুদ্ধ তাদের জন্য বেশ বড় ধাক্কা হয়ে এসেছিল। আর ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া অধিগ্রহণের ঘটনা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছে ইউরোপের সেই পুরনো দিনের কথা, যখন ক্রমাগত যুদ্ধ লেগেই থাকত।

এরই মধ্যে রাশিয়া নিয়মিতভাবে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বিমান বাহিনীর সক্ষমতা প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। দক্ষিণ ওসেটিয়া, আবখাজিয়া, ট্রান্সনিস্ট্রিয়া আর পূর্ব ইউক্রেন অঞ্চলে নিজেদের দখলও মজবুত করছে তারা। বাল্টিক অঞ্চলের জাতিগত রাশিয়ানদের সাথেও সুসম্পর্ক রেখে চলছে। এই রাশিয়ানদের কারণে ঐসব অঞ্চলের ওপর তারা ভবিষ্যতে অধিকার ফলানোর সুযোগ পাবে। বাল্টিক সাগরে তাদের ছিটমহল কালিনিনগ্রাদ তো আছেই!

প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো যায় কি না এই নিয়ে গভীরভাবে ভাবছে ইউরোপের দেশগুলো। কিন্তু এই খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হলে যে টাকা দরকার, তা তো তাদের হাতে নেই। কৌশলগত দিক নিয়ে বিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে দেয়াল থেকে ম্যাপগুলো নামিয়ে ধূলো ঝাড়া হচ্ছে। কারণ সমরকৌশলবিদ থেকে কূটনীতিবিদ, সবাই জানেন যে শার্লেমান, নেপোলিয়ন, হিটলার বা সোভিয়েতের হুমকি হয়তো এখন আর নেই, কিন্তু কার্পেথিয়ান পর্বতমালা, বাল্টিক সাগর আর উত্তর সাগর এখনো সেই আগের জায়গাতেই রয়ে গেছে।

ইতিহাসবিদ রবার্ট কাগান তার "প্যারাডাইস অ্যান্ড পাওয়ার" বইটিতে বলেছেন- "পশ্চিম ইউরোপের মানুষজন ইদানিং হয়তো স্বর্গেই বাস করেন। কিন্তু, বাকি বিশ্বের সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ে নামলে তখন স্বর্গের নিয়মে আর সবকিছু চলবে না"। ইউরো সংকট একসময় কেটে যাবে এবং আবার সবাই তাদের স্বর্গে ফিরবে। তখন মনে হবে, আর হয়তো পিছনের দিনগুলো ফেরত আসবে না। কিন্তু, ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই, কয়েক দশকেই কী

আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। আর ভূগোল আমাদেরকে শেখায়, যদি মানবজাতি ভৌগোলিক বাধা ডিঙানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা না চালিয়ে যায়, তারা ভূগোলের ফাঁদেই আটকা পড়ে থাকবে।

১৯৯৮ সালে জার্মানির চ্যান্সেলরশিপ ছেড়ে দেওয়ার সময় হেলমুট কোহল বলেছিলেন যে তিনিই হলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী হওয়া শেষ জার্মান নেতা। তিনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন সবাইকে। জার্মানির সর্বাধিক বিক্রীত পত্রিকা বিল্ড-এ একটি কলামে তিনি লিখেছিলেন, "বর্তমানের নেতারা অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে এত বেশি চিন্তিত যে এ নিয়ে তারা ইউরোপীয় ঐক্যতে ফাটল ধরাতেও দ্বিধা করবেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে গেলে তাঁরা বুঝতেন এই ঐক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। গত ৬৫ বছর ধরে নানারকম সমস্যা এবং সংকট থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ একটা সময় উপহার পেয়েছে ইউরোপ। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই শান্তি বজায় রাখাটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

অধ্যায় পাঁচ

আ ফ্রি কা



"একটা কিছু না করা পর্যন্ত তা অসম্ভবই মনে হয়"-নেলসন ম্যান্ডেলা



আফ্রিকা

আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল চমৎকার। দারুণ কিছু সৈকত আছে সেখানে। কিন্তু বন্দর তৈরির জন্য প্রাকৃতিক সুবিধা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে ন্যাচারাল হারবার বলা হয়, তা নেই। আফ্রিকাতে রয়েছে চমৎকার সব নদী। কিন্তু পরিবহণের জন্য এই নদীগুলো একদমই অকার্যকর। কারণ বেশিরভাগ নদীতেই কয়েক মাইল পরপর পাওয়া যাবে জলপ্রপাত। আফ্রিকার সমস্যার বিশাল তালিকা থেকে এ হচ্ছে দুইটি মাত্র নমুনা। প্রযুক্তিগত দিক থেকে বা রাজনৈতিকভাবে উত্তর অ্যামেরিকা অথবা পশ্চিম ইউরোপের মতো আফ্রিকা এতটা সফল নয় কেন- এই প্রশ্নের উত্তর আছে এখানেই। একেবারেই সাফল্য পায়নি এমন অনেক জায়গা আছে এই বিশ্বে। কিন্তু কোনো অঞ্চলই আফ্রিকার মতো এতটা অসফল নয়। অথচ আজ থেকে ২,০০,০০০ বছর আগে হোমো সেপিয়েন্সদের উদ্ভব ঘটেছিল এই আফ্রিকা থেকেই। এর বহু পরে তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই হিসাবে আফ্রিকারই সব থেকে বেশি সফল হওয়ার কথা ছিল। স্পষ্টবাদী হিসেবে পরিচিত লেখক জ্যারেড ডায়মন্ড ২০০৫ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটি আর্টিকেলে লিখেছিলেন "কোনো দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম অবস্থানে থাকা দৌড়বিদদের কাছ থেকে আমরা যা চাই, আফ্রিকার অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।" আফ্রিকা দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে মূলত বিচ্ছিন্ন মহাদেশ হওয়ার কারণে। সাহারা মরুভূমি, ভারত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আফ্রিকার মানুষকে। প্রায় পুরো মহাদেশটাই বলতে গেলে ইউরেশিয়া ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। ইউরেশিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে শিল্প ও প্রযুক্তির অগ্রগতি থেকে দূরে রয়ে গেছে তারা। নতুন নতুন ভাবনা এবং আবিষ্কার পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেছে, পশ্চিম থেকে পূর্বে গেছে, কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণে আসেনি।

বিশাল আফ্রিকার ভেতরে আছে নানারকম অঞ্চল। আর প্রতিটি অঞ্চলের আছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি অঞ্চলের জলবায়ু, ভাষা এবং সংস্কৃতি আলাদা। কিন্তু একটা বিষয়েই সবার মিল আছে- তারা একে অপরের থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন, তেমনি তারা সবাই বাইরের পৃথিবী থেকেও বিচ্ছিন্ন। বর্তমান সময়ে এসে হয়তো এই বিচ্ছিন্নতা কমেছে, কিন্তু মূল পরিস্থিতি একই রয়ে গেছে। আফ্রিকার ভুগোল সম্পর্কে আফ্রিকার বাইরের মানুষের ধারণাও পরিষ্কার নয়। খুব কম মানুষই আফ্রিকার বিশালতা সম্পর্কে অবগত। বাজারে সচরাচর যেসব ম্যাপ পাওয়া যায়, সেগুলো দেখে আফ্রিকা সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। এই সব ম্যাপে পৃথিবীর মত একটা গোলককে সমতল অবস্থায় দেখানো হয়। ফলে মূল আকারের বিকৃতি ঘটে। ম্যাপে আফ্রিকার আকার যতটুকু দেখা যায় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় এই মহাদেশটি। আর এই কারণেই প্রথমবারের মতো "উত্তমাশা অন্তরীপ" ঘুরে অপরদিকে পৌঁছাতে পারাটাকে এতবড় সাফল্য হিসেবে ধরা হয়। আর এখানেই বিশ্ববাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্বটা বুঝা যায়। একটা সময় পর্যন্ত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষে পৌঁছানো ছিল গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। কিন্তু সুয়েজ খালের কারণে এখন আর তার প্রয়োজন পড়ে না। এই খাল পশ্চিম ইউরোপ থেকে ভারতে যাওয়ার সাগরপথ প্রায় ৬০০০ মাইল কমিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবীর মানচিত্র দেখলে মনে হবে, আলাস্কাকে ক্যালিফোর্নিয়ার সাথে জুড়ে দিয়ে তারপর যুক্তরাষ্ট্রকে যদি একটু ঘুরিয়ে বসানো হয়, তাহলে কোনোমতে আফ্রিকার মধ্যে এঁটে যেতে পারে। কিন্তু, এটা প্রচলিত ম্যাপের একটা বিভ্রান্তি। আফ্রিকা আসলে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে তিনগুণ বড়। আবার ম্যাপটা একটু দেখুন। গ্রিনল্যান্ড আর আফ্রিকাকে প্রায় একই আকারের মনে হচ্ছে, তাই না? আসলে আফ্রিকা গ্রিনল্যান্ডের চেয়ে চারগুণ বড়। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিনল্যান্ড, ভারত, চীন, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যকে আফ্রিকার মধ্যে ভরে ফেলার পরেও সেখানে পূর্ব ইউরোপের জন্য খানিকটা জায়গা রয়েই যাবে।

বিশাল এই আফ্রিকার জটিল ভূ-প্রকৃতিকে বুঝার বেশ কয়েকটি উপায় আছে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হলো এর ওপরের এক তৃতীয়াংশ এবং নিচের দুই তৃতীয়াংশকে আলাদা করে দেখা। ওপরের এক-তৃতীয়াংশ

শুরু হয়েছে ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে। এই অঞ্চলে আছে উত্তর আফ্রিকার আরবি ভাষাভাষী দেশগুলো। এই উপকূলীয় অঞ্চলের ঠিক নিচে সাহারা মরুভূমি। বিশ্বের বৃহত্তম এই মরুভূমি আকারে প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমান। সাহারার নিচেই হলো সাহেল অঞ্চল। এই আধা শুষ্ক, পাথুরে, বালুময় এলাকার প্রশস্ততম অংশ চওড়ায় প্রায় ৩০০০ মাইল। আটলান্টিক উপকূলের গাম্বিয়া থেকে শুরু করে নাইজার, চাঁদ এবং ইরিত্রিয়া হয়ে লোহিত সাগর উপকূল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। সাহেল শব্দটার উৎপত্তি আরবি থেকে। এর অর্থ- উপকূল। আর এই এলাকার লোকেরা তাদের নিজেদের অঞ্চলকে বিশাল বালুসমুদ্র সাহারার উপকূল হিসেবেই ভাবে। এই অঞ্চলকে আরেক ধরনের উপকূল হিসেবেও ভাবা যায়। এই অঞ্চলের পর থেকে ইসলামের প্রভাব তেমন নেই বললেই চলে। সাহেল অঞ্চল থেকে উত্তরে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত দেশগুলোতে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর সাহেল অঞ্চলের দক্ষিণের দেশগুলোতে ধর্মের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।

সাহেলের দক্ষিণ থেকে শুরু হচ্ছে আফ্রিকার বাকি দুই-তৃতীয়াংশ। এসব এলাকার প্রায় সবকিছুই বৈচিত্র্যময়। মরুভূমির রুক্ষ মাটি ক্রমেই কোমল হয়ে এসেছে। এই এলাকায় চোখে পড়ে প্রচুর গাছপালা। কঙ্গো আর সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের দিকে গেলে পাওয়া যাবে ঘন জঙ্গল। পূর্ব উপকূলের দিকে উগান্ডা এবং তানজানিয়াতে আছে বিশাল বিশাল হ্রদ। আর পশ্চিম উপকূলে অ্যাঙ্গোলা এবং নামিবিয়ায় গেলে আবার মরুভূমির দেখা মিলবে । এখান থেকে আফ্রিকার একদম দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে যেতে থাকলে আবার অনেকটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মতো আবহাওয়া পাওয়া যাবে। ততক্ষণে অবশ্য একদম উত্তরের ভূমধ্যসাগরীয় দেশ তিউনিসিয়ার উপকূল থেকে ৫০০০ মাইল চলে এসেছি আমরা।

আফ্রিকা থেকেই মানবজাতির সূচনা। সেই কথা মাথায় রাখলে আমরা সবাই আফ্রিকান। তবে মানবজাতির গল্প বদলাতে শুরু করলো ৮০০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ। আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ তখন যাযাবর জীবন ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গিয়ে থিতু হলো। শুরু করল চাষাবাদ। গড়ে তুলল গ্রাম এবং শহর।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে এই কাজটা করা সহজ ছিল না। কারণ সেখানে চাষ করার মতো বুনো শস্য ছিল না, ছিল না পোষ মানানোর মতো পশুও। এই অঞ্চলের ভূমির বেশিরভাগ জুড়েই ছিল জঙ্গল, জলাভূমি, মরুভূমি অথবা খাড়া মালভূমি। এর কোনোটাই ধান বা গম উৎপাদনের জন্য অথবা ভেড়া চড়ানোর জন্য উপযুক্ত নয়। এই অঞ্চলের পশুরা চিরস্বাধীন। গণ্ডার, অ্যান্টিলোপ আর জিরাফকে কখনোই ভারবাহী প্রাণীতে পরিণত করা যায়নি। জ্যারেড ডায়মন্ড এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "খামারে পালিত জিরাফের মাংস খেয়ে পরিপুষ্ট আফ্রিকান সেনাবাহিনী যদি বিশাল গণ্ডারের ওপর সওয়ার হয়ে ইউরোপে ঢুকতে পারত, তাহলে সেখানকার ভেড়ার মাংস খাওয়া ঘোড়সওয়ার সেনারা খড়োকুটোর মতো উড়ে যেত। ইতিহাস তখন ভিন্নভাবে লেখা হতো।" অথচ একটা সময়ের পরে মানবজাতির আদি নিবাস এই আফ্রিকার তেমন কোনো অগ্রগতি আর হয়নি বললেই চলে। বরং পরবর্তী সময়ে এখানে জন্ম নিয়েছিল মারাত্মক কিছু সমস্যা। ম্যালেরিয়া এবং পীত জ্বরের মতো ভয়ানক কিছু অসুখ ছড়িয়ে পড়েছিল এই অঞ্চলে। আফ্রিকার প্রচণ্ড তাপের কারণে এই অসুখগুলোতে একবার পড়লে আর সেরে ওঠা যেত না সহজে। রোগ-ব্যাধির বিস্তারের পাশাপাশি ক্রমেই জনসংখ্যা বেড়ে চলা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কিছু না থাকার ফলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এশিয়া এবং দক্ষিণ অ্যামেরিকাও এইসব অসুখে জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু এসব রোগের ভয়ংকর রূপ সাব-সাহারান আফ্রিকার মতো আর কোথাও দেখা যায়নি। যেমন, এইচআইভির প্রকোপও এই অঞ্চলেই সব থেকে বেশি। তাছাড়া মশা ও সেতসি মাছির দুর্দমনীয় প্রকোপে বিভিন্ন ধরনের অসুখ এবং ভাইরাস এখানে দ্রুত ছড়ায়।

আফ্রিকার নদীগুলোও অগ্রগতির জন্য বাধা। বেশিরভাগ নদীই উঁচু এলাকা থেকে থেকে শুরু হয়ে সাঁই করে নিচে নেমে গেছে। ফলে পণ্য পরিবহন এবং বাণিজ্যের জন্য এই নদীগুলো একদমই উপযোগী না। ১৬০০ মাইল লম্বা জাম্বেজি নদীর কথাই বলা যায় এই প্রসঙ্গে। আফ্রিকার চতুর্থ দীর্ঘ এই নদীটির কল্যাণে তৈরি হওয়া ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত পর্যটকদের জন্য চমৎকার জায়গা। কিন্তু এই নদী মোটেও পরিবহনবান্ধব না। জাম্বেজি নদী ৪৯০০ ফিট উঁচু থেকে শুরু হয়ে ছয়টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোজাম্বিকের কাছে ভারত

মহাসাগরে পড়েছে। এই নদীর কিছু অংশে ছোট নৌকা দিয়ে যাতায়াত করা যায়। তবে, সেই অংশগুলো আবার পরস্পর-সংযুক্ত নয়। ফলে পণ্য পরিবহণের কোনো সুযোগ নেই।

নদী সংযোগ বিষয়ক এই সমস্যা আফ্রিকা জুড়েই রয়েছে। ইউরোপে দানিউব এবং রাইন অববাহিকায় পরস্পর-সংযুক্ত জলপথ থাকায় বাণিজ্য বিস্তারে সুবিধা হয়েছে। কিন্তু আফ্রিকার সেই সুবিধা না থাকার কারণে এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ ও বাণিজ্যসম্পর্ক তৈরি হয়নি। আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার পেছনে এটা একটা বড় কারণ। নাইজার, কঙ্গো, জাম্বেজি, নীলনদের মত আফ্রিকার বড় নদীগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত না হওয়ার পেছনে প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষেরও দায় আছে। এখানে ভাষার বৈচিত্র্য ব্যাপক। রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র বিশাল অঞ্চল হলেও ভাষাগত বৈচিত্র্য সেভাবে নেই বললেই চলে। যোগাযোগ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তারা একটা ভাষাই মূলত ব্যবহার করে থাকে। অপরদিকে সুবিশাল আফ্রিকায় আছে হাজার হাজার ভাষা। নির্দিষ্ট কোনো ভাষা বা সংস্কৃতিই এখানে এককভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি। ইউরোপেও ভাষার যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। তবে ইউরোপ আয়তনে অনেক ছোট হওয়ায় এখানে একটা "লিংগুয়া ফ্রাংকা" বা সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ভূপ্রকৃতিও ইউরোপকে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এখন সময় বদলেছে। আফ্রিকার অনেক দেশই প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এই মহাদেশের বিশাল একটা অংশকে বাকি পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত হতে পার হতে হয় সাহারা মরুভূমি, ভারত মহাসাগর বা আটলান্টিক মহাসাগর। উদ্ভাবনী চিন্তা এবং প্রযুক্তি এই কারণে হাজার হাজার বছর ধরে সাব-সাহারান আফ্রিকায় আসতে পারেনি। এসবকিছু সত্ত্বেও ষষ্ঠ শতাব্দীর পর আফ্রিকাতে সাম্রাজ্য এবং কিছু নগরকেন্দ্রিক রাজ্য গড়ে উঠেছিল। যেমন মালি সাম্রাজ্য (ত্রয়োদশ থেকে ষষ্ঠদশ শতক) বা নগর-রাষ্ট্র গ্রেট জিম্বাবুয়ে (একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক)। গ্রেট জিম্বাবুয়ের অবস্থান ছিল জাম্বেজি এবং লিমপোপো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তবে এই সাম্রাজ্যগুলোও

শেষপর্যন্ত আলাদাই থেকে গেছে। আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেনি। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশজুড়ে সেসময় অসংখ্য সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল। বেশ উন্নতমানের ছিল এসব সংস্কৃতি ও তাদের জীবনাচরণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক বাধার কারণে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। আফ্রিকার বাইরের দেশগুলো যখন এই অঞ্চলে এসে পৌঁছায়, তখনো এখানে লিপি, কাগজ, বারুদ, এমনকি চাকার ব্যবহারও শুরু হয়নি।

প্রায় ২০০০ বছর আগে উটের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে বণিকরা সাহারা অঞ্চলে বাণিজ্য করে আসছে। তারা মূলত এসেছিল এই অঞ্চলে মজুদ বিপুল পরিমাণ লবণ নিয়ে ব্যবসা করতে। তবে আরবরা আসার পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকার দক্ষিণে অভিযান শুরু হয়নি। নবম শতকে সাহারা অতিক্রম করে তারা। একাদশ শতকে তারা পৌঁছে যায় আরো দক্ষিণে, যেখানে অবস্থিত বর্তমান নাইজেরিয়া। আরবরা পূর্ব উপকূলেও পৌঁছে যায়। জাঞ্জিবার আর দারুস সালাম অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই অঞ্চলটি এখন তানজানিয়া নামে পরিচিত।

অবশেষে পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয়রাও চলে এল পশ্চিম উপকূলে। তারা এই অঞ্চলে খুব বেশি প্রাকৃতিক বন্দর খুঁজে পায়নি। ইউরোপ এবং উত্তর অ্যামেরিকার উপকূলীয় অঞ্চল আঁকাবাঁকা খাঁজযুক্ত হওয়ায় গভীর প্রাকৃতিক বন্দর তৈরি হয়েছে এই দুই মহাদেশে। অপরদিকে আফ্রিকার সমুদ্রতট প্রায় সোজাসাপ্টা। আফ্রিকায় পৌঁছানোর বহুদিন পর পর্যন্তও ভূমিতে ১০০ মাইলের বেশি গভীরে যেতে পারেনি ইউরোপীয়রা। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য কাজটা এতটা সহজ ছিল না। নদীতে চলাচল করার ঝামেলা ছিল, সেই সাথে কঠিন জলবায়ু এবং অসুখ বিসুখের কারণে আর ভেতরে যেতে পারেনি ইউরোপিয়ানরা।

আরব এবং ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এলেও সেগুলো তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আফ্রিকা থেকে তারা নিয়ে যেত অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষ। বাইরের পৃথিবীর বণিকরা আসার অনেক আগে থেকেই আফ্রিকায় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। সাহেল অঞ্চলে হাজার হাজার দাসকে পণ্য পরিবহনের কাজে ব্যবহার করত স্থানীয় বণিকরা। পণ্য বলতে

ছিল মূলত লবণ। আরবরা এসে নতুনভাবে দাসপ্রথা চালু করল। তারা বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠীর নেতাদের কাছ থেকে দাস কিনতে লাগল। এইসব গোষ্ঠীর নেতারা উপকূলীয় এলাকায় আরবদের হাতে দাসদের পৌঁছে দিত। অটোমান সাম্রাজ্যের শীর্ষ সময়ে (পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতক) আফ্রিকা থেকে লাখ লাখ দাস পাঠানো হয় ইস্তাম্বুল, দামেস্ক ও কায়রোসহ বাকি আরব বিশ্বে। তাদের বেশিরভাগই ছিল সুদান অঞ্চলের। আরব এবং তুর্কদের দেখাদেখি ইউরোপীয়রাও দাস ব্যবসা শুরু করে। দাসদের প্রতি তাদের আচরণ ছিল আরো ভয়াবহ এবং নিষ্ঠুর। জাহাজের পর জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হলো আফ্রিকান দাস। ইউরোপীয়রা এক্ষেত্রে কোনো ধরনের মানবিকতা বা নীতির তোয়াক্কা করেনি।

তারা আরো একটা দুষ্কর্ম করে বসে। লন্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস এবং লিসবনে বসে আফ্রিকার ম্যাপের ওপর কাল্পনিক রেখা টেনে নতুন নতুন দেশ তৈরি করতে থাকে তারা। দেশগুলোর নামও তারাই দেয়, যেমন- মিডল কঙ্গো, আপার ভোল্টা ইত্যাদি। ইউরোপীয় বণিক বা অভিযাত্রীরা আফ্রিকা অঞ্চলে কতখানি এগিয়েছে অথবা কতটুকু অধিগ্রহণ করেছে, তা বুঝানোর জন্যই মূলত এই লাইনগুলো টানা হয়। এসব অঞ্চলের অধিবাসী বা ভাষা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামানো হয়নি। স্থানীয় অধিবাসীরা এসব দেশ চায় কিনা, তা আদৌ জানতে চাওয়া হয়নি। ইউরোপীয়দের ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুসারে টানা এই রেখাগুলোর জন্য এখনো আফ্রিকানদের ভুগতে হচ্ছে। ইউরোপীয়দের নির্ধারণ করে দেওয়া রাজনৈতিক ভূগোলে বন্দি হয়ে আছে তারা। এসব দেশের মধ্যে থাকা নানারকম প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকে বাধা পাচ্ছে উন্নয়ন। তবে এতকিছুর পরেও আফ্রিকার অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এখন আধুনিক ঘরবাড়ি তৈরি করছে। অনেকক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে দারুণ সচল এবং পরস্পর সংযুক্ত অর্থনীতি।

বর্তমানে আফ্রিকায় দেশ আছে মোট ৫৬টি। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম গতি পায়। ইউরোপীয়দের দেওয়া নামগুলোও তারা বদলাতে শুরু করে কিছু ক্ষেত্রে। যেমন, রোডেশিয়া এখন জিম্বাবুয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু সীমানাগুলোতে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি।

ইউরোপীয়রা বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তা না করে যেসব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, তা এখনো বলবৎ আছে। ফলে পুরোনো সেই বিভাজন এখনো রয়ে গেছে। আফ্রিকা এখনো ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক শাসনের ফল বয়ে বেড়াচ্ছে।

সুদান, সোমালিয়া, কেনিয়া, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, নাইজেরিয়া বা মালিতে যে জাতিগত সংঘাত চলছে তা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক কার্যক্রমেরই ফলাফল। আফ্রিকান জনমিতির বাস্তবতা মাথায় না রেখে নিজেদের সুবিধামত রাজনৈতিক ম্যাপ তৈরি করেছিল ইউরোপীয়রা। তার পরিণতি তো এমনই হওয়ার কথা ছিল। তবে এটাও ঠিক যে আফ্রিকায় বরাবরই জাতিগত বিভাজন ছিল। ইউরোপীয়রা পা ফেলারও অনেক আগে থেকেই জুলু আর খোসাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। কিন্তু ইউরোপীয়রা জাতিরাষ্ট্রের নামে যে আরোপিত সমাধান দিয়ে চেয়েছিল, তা সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আলাদা আলাদা জাতিকে ধরে এক জাতি বানিয়ে দিয়েছিল। এর ফল পাওয়া শুরু হলো বিদেশিদের তাড়িয়ে দেওয়ার পরে। তুলনামূলক সংখ্যাগুরু কোনো কোনো জাতি চাইল নিজেরাই সব দখল করে বাকিদের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে। ফলে, শুরু হলো সন্ত্রাস ও দাঙ্গা-ফ্যাসাদ।

উদাহরণ হিসেবে লিবিয়ার কথা বলা যায়। লিবিয়া তুলনামূলকভাবে নতুন একটি দেশ, মাত্র কয়েক দশক আগে তৈরি করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই লিবিয়া আগের মতো তিনভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর পশ্চিম অংশের নাম গ্রিক আমলে ছিল ত্রিপোলিতানিয়া। ত্রিপোলিতানিয়া অর্থ- তিনটি শহর। গ্রিক আমলের তিনটি শহর পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে ত্রিপোলি নাম ধারণ করে। পূর্ব দিকে বেনগাজি শহরকে কেন্দ্র করে চাদ-এর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া অংশটিকে গ্রিক এবং রোমান যুগে বলা হতো সাইরেনাইকা। এই দুই অংশের নিচের দিকে দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নাম ফেজান।

ত্রিপোলিতানিয়ার যাবতীয় পরিকল্পনা মূলত উত্তর আর উত্তর-পশ্চিমকে কেন্দ্র করেই তৈরি করা হতো। দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলোর সাথে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ভালো ছিল। সাইরেনাইকা আগে মিসর আর আরবদের সাথে ব্যবসা করত। এমনকি, বেনগাজি উপকূলে সাগরের স্রোতও পূর্বমূখী।

ফলে পূর্বদিকে আরব অঞ্চলের প্রতি ঝুঁকে থাকাই স্বাভাবিক। আর ফেজান অঞ্চলটি ছিল মূলত যাযাবরদের। দুই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের থেকে তারা বেশ আলাদা।

এই বিভাজনকে পুঁজি করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অঞ্চল শাসন করেছে গ্রিক, রোমান এবং তুর্কিরা। স্থানীয়রাও নিজেদেরকে এরকম বিভক্তই ভেবে এসেছে সবসময়। ইউরোপীয়রা কয়েক দশক ধরে যে অবিভক্ত লিবিয়ার কথা বলে, তা খুব একটা বাস্তবসম্মত না। মানুষের মধ্যে এই বিভাজন থাকায় দ্বন্দ্ব এখানে অবশ্যম্ভাবী। ইতোমধ্যেই পূর্ব দিকে একটি ইসলামি গোষ্ঠী পৃথক সাইরেনাইকা আমিরাতের দাবি তুলেছে। তাদের এই সংগ্রাম হয়তো সফল হবে না। কিন্তু, ম্যাপের মধ্যে রেখা টেনে দেশ তৈরি করাটা যে ইউরোপীয়দের অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত ছিল তা এখন স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে।

ইউরোপীয়দের এই মিথ্যা রেখা টানার সবচেয়ে বড় দায় বহন করে চলেছে আফ্রিকার একদম মাঝখানের দেশটি, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো। এই দেশটিকে একটা বিশাল কৃষ্ণগহ্বরও বলা যায়। এই অঞ্চলকে উপজীব্য করেই জোসেফ কনরাড লিখেছেন তার বিখ্যাত উপন্যাস "হার্ট অব ডার্কনেস"। যুদ্ধের অন্ধকারে এই অঞ্চলটিই সবচেয়ে বেশি ডুবে আছে। আরোপিত সীমানা দিয়ে দুর্বল এবং অকার্যকর রাষ্ট্র তৈরির এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হতে পারে না। নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত এই দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ চলে গেছে বহিরাগতদের কাছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো নাম হলেও এখানে গণতন্ত্রের কোনো বালাই নেই, এমনকি এটি কোনো প্রজাতন্ত্রও নয়!

শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশগুলো ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোকে "উন্নয়নশীল দেশ" বলে থাকে। এই গালভরা 'উন্নয়নশীল' আখ্যায় হারিয়ে গেছে তাদের বর্তমান সমস্যাগুলো। তারা মোটেও উন্নয়ন করতে পারছে না, উন্নয়ন ঘটানোর কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। প্রযুক্তি আর শিল্পোন্নয়নের এই গতিশীল সময়ে তারা পৃথিবী থেকে যোজন যোজন দূরে রয়ে গেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোকে এভাবে কৃত্রিম ম্যাপের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়াটা ছিল ঘোরতর ভুল একটা সিদ্ধান্ত। এখন এই দেশটি অকার্যকর রাষ্ট্রে

পরিণত হয়েছে। এখানে যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে সে সম্পর্কে বাইরের দেশগুলো খুব কমই জানে। ১৯৯০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে যুদ্ধের কারণে মারা গেছে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ। আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এটি। জনসংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি। এর আয়তন জার্মানি, স্পেন ও ফ্রান্সের মিলিত আয়তনের চেয়েও বেশি। আমাজনের পর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রেইনফরেস্ট হচ্ছে কঙ্গোর রেইনফরেস্ট। এখানে আছে প্রায় ২০০ জাতিগোষ্ঠী। বান্টু গোষ্ঠী এদের মধ্যে বৃহত্তম। দেশটিতে প্রচলিত আছে শত শত ভাষা। ফ্রেঞ্চ ভাষাও এখানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যোগাযোগের ব্যবধান কমাতে সবাই এই ভাষারই দ্বারস্থ হয়। ১৯০৮ সাল থেকে ৬০ সাল পর্যন্ত ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো ছিল বেলজিয়ামের উপনিবেশ। তখন থেকেই এখানে ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রচলন। এরও আগে বেলজিয়ান রাজা লিওপোল্ড এই অঞ্চলকে নিজের সম্পত্তি মনে করতেন। এখান থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করে নিজের পকেট ভারি করতেন তিনি। বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্ঠুরতার সামনে ব্রিটিশ বা ফরাসিদের ঔপনিবেশিকতাও ম্লান হয়ে যাবে। একদিকে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর চরম অত্যাচার চালিয়েছে, অপরদিকে স্থানীয়দের জন্য তেমন কোনো অবকাঠামোও নির্মাণ করেনি। ১৯৬০ সালে বেলজিয়ানরা চলে যায়, আর ফেলে যায় একটা অস্থির জনপদকে।

বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। সে-সময় পৃথিবীজুড়ে চলছিল কোল্ড ওয়ার। কোল্ড ওয়ারের কুশীলবরা তাদের নিজেদের সুবিধামতো কৌশল নির্ধারণ করে এই অঞ্চলের যুদ্ধকে আরো বাড়িয়ে দেয়। রাজধানী কিনসাসার সরকার অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহীপক্ষকে সমর্থন দেয়। এর ফলে তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নজর পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র সে-সময় অ্যাঙ্গোলার সোভিয়েত সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে কলকাঠি নাড়তে ব্যস্ত। দুই পক্ষই তখন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করেছে এই অঞ্চলে।

কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার পর জায়ারে'র ওপর (তখন এই নামেই পরিচিত ছিল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো) থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে পরাশক্তিগুলো। দেশটি তখন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভর করে সাময়িকভাবে

টিকে ছিল। আফ্রিকার একদম পূর্ব অংশে উত্তরের লোহিত সাগর উপকূল থেকে শুরু করে লম্বা হয়ে দক্ষিণে প্রায় ৪৫০০ মাইল পর্যন্ত চলে গেছে গ্রেট রিফট ভ্যালি। এই দীর্ঘ নিম্নভূমি তৈরি হয়েছে আফ্রিকান টেকটোনিক প্লেটে ফাটলের ফলে। দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে ঢুকে কঙ্গোর পুরো পূর্ব সীমান্ত জুড়ে এই নিম্নভূমি। আর এই অঞ্চলে পাওয়া যায় কোবাল্ট, কপার, হীরা, সোনা, রুপা, দস্তা, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ এবং আরো অনেক মূল্যবান খনিজ পদার্থ। বিশেষ করে কাটাঙ্গা প্রদেশ এইসব সম্পদে পরিপূর্ণ। কিং লিওপোল্ডের আমলে এই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে রাবার আহরিত হতো। সে সময়ে অটোমোবাইল বা গাড়ির যুগের প্রবল সূচনা হয়েছে। জায়ারের রাবার দিয়ে সেসব গাড়ির টায়ারের চাহিদা মেটানো হতো। বর্তমান সময়ে এসে চীন তাদের মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশই চীনের কাছে। কিন্তু, এত এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের জনগণের অধিকাংশই বাস করে দারিদ্রসীমার নিচে। ২০১৪ সালের মানব-উন্নয়ন সূচকে ১৮৭টি দেশের মধ্যে ১৮৬তম স্থানে ছিল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো। এই তালিকার নিচের দিকের ১৮টি দেশের সবগুলোই আফ্রিকার।

সম্পদশালী এই দেশটির বুকে কামড় বসাতে চায় সব পরাশক্তিই। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা না থাকার কারণে তারা বহির্বিশ্বের এই 'কামড়'কে প্রতিহত করতে পারছে না। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর সীমান্ত ঘেঁষে আছে নয়টি দেশ। তাদের দক্ষিণে আছে অ্যাঙ্গোলা। উত্তরে রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক। পূর্ব দিকে রয়েছে উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, তানজানিয়া এবং জাম্বিয়া। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পেছনে কিছু না কিছু ভূমিকা আছে এই নয়টি দেশের প্রতিটির। কঙ্গোর যুদ্ধকে তাই বলা হয় "আফ্রিকার বিশ্বযুদ্ধ"। এই দ্বন্দ্ব কয়েক দশকের পুরনো হলেও, ১৯৯৪ সালে পূর্ব দিকের ছোট্ট দেশ রুয়ান্ডায় সংঘঠিত গণহত্যার পরে এই অঞ্চলে শুরু হয় বিপর্যয়।

১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় তুতসি জাতিগোষ্ঠীর ওপর হুতু জাতিগোষ্ঠীর একাংশের চালানো হত্যাযজ্ঞ পৃথিবীর ইতিহাসেরই এক কালো দাগ। তুতসিদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তারা পরে হুতু জনগোষ্ঠীর অপর একটা অংশের সাথে

মিলে হুতু-অধ্যুষিত একটি সরকার গঠন করে। বিদ্রোহী হুতু মিলিশিয়ারা তখন সীমান্তের ওপারে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে চলে যায় এবং সীমান্ত অঞ্চলে নিয়মিতভাবে হামলা চালাতে থাকে। দেশটির নাম তখন কঙ্গো রিপাবলিক। দেশটির সামরিক বাহিনীর হুতু অংশ এই হুতু মিলিশিয়ায় যোগ দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার তুতসিদের হত্যা করতে থাকে। এর জবাবে রুয়ান্ডা ও উগান্ডার সামরিক বাহিনী জোট বেধে কঙ্গো আক্রমণ করে। এই দুই দেশের সমর্থনে লজিস্টিকস ও রসদ সরবরাহ করে বুরুন্ডি ও ইরিত্রিয়া। এছাড়াও তাদের সাথে যুক্ত হয় সম্মিলত পক্ষের মিলিশিয়া। সবাই মিলে কঙ্গো রিপাবলিক দখল করে সরকার উৎখাত করে দেয়। তারা দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদের দখলও ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। যেমন, রুয়ান্ডা পুরো কোল্টান উত্তোলন দখল করে নেয় এবং সাথে সাথে রপ্তানি শুরু করে। মাইক্রোচিপ তৈরির জন্য এই ধাতব মৌলটি প্রয়োজন হয়। ফলে খুবই মূলবান ধাতব খনিজ এই কোল্টান।

তবে উৎখাত হওয়া কঙ্গো সরকার লড়াই জারি রাখে। তাদের সমর্থন যোগায় অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে। বিশাল এই দেশটা তখন বিশাল এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রায় তিনবছর টানা যুদ্ধ চলে। অন্তত ২০টি আলাদা পক্ষ এখানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে সরাসরি মৃত্যু হয় প্রায় এক লাখ লোকের। যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অভাব, অপুষ্টি ও রোগে ভুগে মারা যায় ৬০ লাখের বেশি মানুষ। জাতিসংঘের তথ্যমতে এর মধ্যে অর্ধেকই ছিল ৫ বছরের কমবয়সী শিশু। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুদ্ধ কিছুটা কমে এসেছে। তবে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে আছে। এই দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দেশটিতে মোতায়েন করা হয়েছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের সব থেকে বড় বাহিনী। জাতিসংঘের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বজায় না রাখলে আবারও সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হতে পারে।

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর ভাঙা টুকরোগুলোকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে বিশেষ লাভ হবে না। দেশটি কখনোই সেভাবে একতাবদ্ধ ছিল না। দেশটিকে এখন আর একসাথে রাখা সম্ভবও নয়। আলাদা আলাদা

অংশগুলোকে পৃথক রেখে পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। ইউরোপীয় কলোনিয়াল শাসন এখানে যেন মুরগি ছাড়াই ডিমের জন্ম দিয়েছে! এই ডিমের খোসা আদৌ আছে কিনা তাও বুঝার চেষ্টা করা হয়নি। ডিম এখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে। দেশ সৃষ্টির এরকম নানা অযৌক্তিক ও অবাস্তব পদ্ধতি ব্যবহার করে আফ্রিকা মহাদেশজুড়ে দেশ সাজানো হয়েছে। ফলে প্রতিটি কোণে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে।

বুরুন্ডিকে আরেকটি উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বর্তমানের তানজানিয়াসহ এই দেশটি ছিল আফ্রিকায় জার্মানির দখলকৃত অংশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে দেশটিকে ভাগাভাগি করে নেয় বিজয়ী পক্ষের যুক্তরাজ্য ও বেলজিয়াম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দেশটি বেলজিয়ামের উপনেবেশ ছিল। বুরুন্ডির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ হুতু জাতিভুক্ত। বাকি ১৫ শতাংশ তুতসি। বেলজিয়ানরা দেশ চালাত তুতসি জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের দিয়ে। ফলে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক বাহিনীতে তুতসিরাই সব দখল করে ছিল। ফলে স্বাধীন বুরুন্ডির শুরু থেকেই হুতু-তুতসি দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ সালে শুরু হয় হুতু-তুতসি যুদ্ধ। পরের এক যুগ ধরে চলমান এই গৃহযুদ্ধে মারা যায় ৩ লাখের বেশি মানুষ। এমনকি এই ২০১৫/১৬ সালেও হুতু প্রেসিডেন্ট পিয়েরে এনকুরুনজিজার তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে হুতু-তুতসি দ্বন্দ্বে একদফা দাঙ্গায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল বুরুন্ডি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামাও এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি। তিনি একবাক্যে এনকুরুনের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বলেন। এই সিদ্ধান্তকে আফ্রিকার উন্নয়নের পক্ষে হানিকর হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, যদি কোনো শাসক তাকে ছাড়া দেশ একত্রিত থাকবে না বলে ভাবতে থাকেন, এর অর্থ দেশ একত্রিত রাখতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এই বক্তব্যের মধ্যে একদিকে আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা প্রকাশ পায়। আবার সেই সাথে বুঝা যায়, অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার চাইতেও বড় সমস্যা হয়ে উঠেছেন আধুনিক সময়ের স্থানীয় নেতারাই।

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ একইসাথে আফ্রিকার আশীর্বাদ এবং অভিশাপ। অশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকাকে আশীর্বাদ তো বলতেই হবে। কিন্তু, এই প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে বাইরে থেকে মানুষ এসে তা স্থানীয়দের জন্য অভিশাপে পরিণত করেছে। তবে একদম সাম্প্রতিক সময়ে এসে এই জাতিরাষ্ট্রগুলো নিজেদের সম্পদের ওপর নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করছে। বাইরের দেশগুলো এখন আর কেড়ে নিয়ে যেতে পারছে না। তাদেরকে এখন এসব সম্পদ পেতে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। কিন্তু এসবের ফলে দেশের মানুষের জীবনে আহামরি কিছু পরিবর্তন আসেনি।

প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও আফ্রিকায় আছে বড় বড় বেশ কয়েকটা নদী। নদীগুলো পরিবহন আর বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক না হলেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী। এই বিষয়টাও সংঘাত সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ৪১০০ মাইল দীর্ঘ, পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদের সরাসরি প্রভাব আছে আফ্রিকার ১০টি দেশে। দেশগুলো হলো বুরুন্ডি, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, সুদান, উগান্ডা এবং মিশর। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস বলেছিলেন, "মিশরই নীলনদ, আর নীলনদই মিশর"। এই কথাটি এখনো সত্য। নদীটির মিশরীয় অংশ ৭০০ মাইল দীর্ঘ, পুরোটাই পরিবহণের উপযুক্ত। মিশরের জন্য সব থেকে বড় হুমকিও এই নদীটিই। নীলনদের সরবরাহব্যবস্থা ব্যাহত হলে, মিশরই আর থাকবে না। দেশটির প্রায় সাড়ে আট কোটি জনসংখ্যার সকলেই নীলনদের ধারে বসবাস করে।

মিশর যেসময় জাতিরাষ্ট্র হয়ে ওঠে, ইউরোপীয়রা তখনো বাস করছে মাটির কুঁড়েঘরে। কিন্তু মিশর কখনোই নিজের অঞ্চলের বাইরে মিশরের রাজত্ব বিস্তার করেনি। কারণ এর তিন দিকে ছিল মরুভূমি। তবে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বড় শক্তি হয়ে ওঠার সুযোগ তাদের ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে একটাই সমস্যা ছিল তাদের। মিশরে গাছ তেমন নেই বললেই চলে। প্রচুর গাছ না থাকলে নৌযান বানানোর জন্য পর্যাপ্ত কাঠ পাওয়া যায় না, ফলে শক্তিশালী নৌবাহিনীও তৈরি হয় না। অবশ্য নৌবাহিনী মিশরের একরকম ছিল। তারা লেবানন থেকে সিডার কাঠ এনে জাহাজ বানাত। কিন্তু এতে খরচ হতো প্রচুর। গভীর সমুদ্রের নীল জলে চষে বেড়ানোর মতো শক্তিশালী নৌবাহিনী তাদের কখনোই ছিল না।

বর্তমানের আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মিশরীয় সামরিক বাহিনীই সবচেয়ে শক্তিশালী। এর জন্য অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ধন্যবাদ প্রাপ্য। কিন্তু মিশর আগের মতোই মরুভূমি আর সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে এবং ইসরায়েলের সাথে তাদের সমঝোতা করে যেতে হচ্ছে।

মিশরের সমস্যা বেশ কয়েকটি। ৮৪ মিলিয়ন মানুষের মুখে রোজ খাবার তুলে দেওয়া, সেই সাথে ইসলামপন্থী দলগুলোর বিদ্রোহ দমন করা (বিশেষ করে সিনাই অঞ্চলে) এবং সুয়েজ খালকে পাহারা দিয়ে রাখা। পৃথিবীর পরিবহনকৃত পণ্যের প্রায় ৮ শতাংশ প্রতিদিন সুয়েজ খাল দিয়ে যায়। পৃথিবীর বহনকৃত তেলের প্রায় ২.৫ শতাংশ যায় এই খাল হয়ে। এই খালটি বন্ধ হয়ে গেলে ইউরোপে জাহাজ পৌঁছাতে বাড়তি ১৫ দিন লাগবে। আর যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে লাগবে আরো ১০ দিন। ফলে পণ্য পরিবহনের খরচ বিপুলভাবে বেড়ে যাবে।

ইসরায়েলের সাথে এই পর্যন্ত মোট ৫ বার যুদ্ধ হয়েছে মিশরের। তবে পরবর্তী যুদ্ধটা হতে চলেছে ইথিওপিয়ার সাথে, নীলনদ নিয়ে। আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীনতম এই দুই দেশের সামরিক বাহিনীও আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। পানির দখল নিয়ে তারা যে কোনো সময় যুদ্ধে নামতে পারে। নীলনদের দুইটি ভাগ আছে, নীল আর সাদা। ভিক্টোরিয়া লেক থেকে উৎপত্তি হয়েছে সাদা নীলনদের। আর নীল নীলনদ ইথিওপিয়া থেকে নেমে এসে সুদানের রাজধানী খার্তুমের কাছে সাদা নীলনদের সাথে মিলিত হয়ে নীলনদ হিসেবে নুবিয়ান মরুভূমির মধ্যে দিয়ে মিশরে প্রবাহিত হয়েছে। এখান থেকে শুরু করে বেশিরভাগ পানি নীল নীলনদ থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসে। ইথিওপিয়া অনেক উঁচুতে অবস্থিত হওয়ায় দেশটিকে অনেকে আফ্রিকার "জলস্তম্ভ" বলে থাকেন। ইথিওপিয়ার উচ্চভূমিতে ঝরা বৃষ্টির ফলে নেমে আসা ঢলকে ২০টিরও বেশি বাঁধের মাধ্যমে নীল নীলনদে পাঠানো হয়।

আদ্দিস আবাবা ২০১১ সালে নীলনদের ওপর একটা বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের চুক্তি করে চীনের সাথে। প্রকল্পটা সুদানের সীমানার কাছে। এই প্রকল্পের নাম গ্র্যান্ড রেনেসাঁ ড্যাম। ২০২০ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয় এবং ২০২২ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। এই বাঁধের মাধ্যমে

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, আর মিশরের দিকে পানিপ্রবাহ বজায় থাকবে বলেই সবাই জানে। কিন্তু এই বাঁধকে ঘিরে আরো একটি তাত্ত্বিক বিষয় আছে। এই বাঁধটিতে প্রায় একবছরের প্রবাহের সমপরিমাণ পানি জমা করে রাখা হয়েছে। বাঁধটির কারণে মিশরের দিকে পানির প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হবে। বাঁধটির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নীল নীলনদের জল ইথিওপিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তারা নিজের প্রয়োজনে এই জল ব্যবহার করতে পারবে। অপরদিকে মিশরের দিকে পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক কারণেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে।

একসময়ের শক্তিমান মিশরের সামরিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর সাড়ে নয় কোটি জনসংখ্যার ইথিওপিয়া ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মিশর এসব দেখছে না তা নয়। তবে যুদ্ধ এড়িয়ে পানির প্রবাহ ঠিক রাখার বিষয়ে আলোচনা করতেই তারা ব্যস্ত আপাতত। তবে, পানি নিয়ে এই যুদ্ধটা আগামী শতকের অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধগুলোর একটা বলা যায়।

পানির পর প্রতিযোগিতার আরেকটি বিষয় হচ্ছে তেল। সাব-সাহারান অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তেল উৎপাদনকারী দেশ হলো নাইজেরিয়া। কিন্তু উত্তরে বসবাসকারী নাইজেরিয়ানদের অভিযোগ, এই তেল বিক্রির টাকা সারাদেশে সুষমভাবে বন্টিত হচ্ছে না। এসব কারণে নাইজেরিয়ান ডেল্টা থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত জাতিগত এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছে। নাইজেরিয়া আফ্রিকার সব থেকে জনবহুল দেশ। মোটা জনসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। এর পাশাপাশি দেশের আকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিচারে নাইজেরিয়া পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। প্রাচীন কিছু রাজ্যকে দখলের পর একসাথে করে ব্রিটিশরা নাইজেরিয়া তৈরি করে। ১৮৯৮ সালে তারা ম্যাপের ওপর আঁকে “নাইজার নদীর ধার দিয়ে সুরক্ষিত ব্রিটিশ অঞ্চল”। এই অঞ্চলটিই পরবর্তীতে নাইজেরিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান সময়ে নাইজেরিয়া আফ্রিকার একটি শক্তিশালী দেশ হলেও অতীতে দীর্ঘসময় ধরে দেশটির মানুষ এবং সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব ছিল ব্রিটিশদের। ব্রিটিশদের তথাকথিত সভ্যতা বিস্তারের কার্যক্রম দেশটির মধ্যবর্তী এলাকা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি। এমনকি উত্তরাঞ্চলের মুসলিমরাও অবহেলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ উন্নয়ন ও অবকাঠামো শুধু দক্ষিণাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশটির বাকি অর্ধেক

এলাকায় উন্নয়নের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া লাগেনি। দেশটির আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক সম্পর্কও খুব জটিল। পরবর্তী সময়ে, তেল থেকে উপার্জিত টাকার একটা বড় অংশই ব্যয় করা হয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রভাবশালী নেতাদের খুশি করতে। উপকূল অঞ্চলের এই তেলশিল্প বর্তমানে "নাইজার ডেল্টার মুক্তির জন্য আন্দোলন" নামক একটি গোষ্ঠীর হুমকির মুখে রয়েছে। নাইজার ডেল্টার মুক্তি আন্দোলন বলা হলেও তাদের লক্ষ্যই হলো সন্ত্রাসবাদ এবং চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন। বিদেশি তেল শ্রমিকদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করাটাই তাদের মূল ব্যবসা। আর নিয়মিত এই অপহরণের কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা এই অঞ্চল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সাগরের মধ্যকার তেলের খনিগুলো এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত। তাই এই ক্ষেত্রটিতেই বর্তমানে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে।

উত্তর দিকে ইসলামপন্থী দল বোকো হারাম নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে। তারা সেখানকার জনগণের সমর্থনও পায়। তবে এসব অঞ্চল একেবারেই অবহেলিত। এই অঞ্চলের মানুষেরা বিশ্বাস করে বোকো হারাম তাদের রক্ষার জন্য কাজ করছে। বোকো হারামের যোদ্ধাদের বেশিরভাগই উত্তর-পূর্বের কানুরিস জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। তারা খুব কমই তাদের নিজস্ব অঞ্চলের বাইরে কার্যক্রম চালায়। পশ্চিমের হাউসা অঞ্চল অধিগ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। আরো দক্ষিণের সমুদ্রতীরের এলাকায় যেতে তো তারা একদমই অনাগ্রহী। উত্তরাঞ্চল বোকো হারামের নিজের মাটি। এই কারণে নাইজেরিয়ার মিলিটারি যখন তাদের পাকড়াও করতে আসে তখন স্থানীয়রা তেমন একটা সহযোগিতা করে না। সহযোগিতা না করার পেছনে ভয় যেমন একটা কারণ, দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি তাদের ক্ষোভও আরেকটা কারণ।

বোকো হারাম এখনো নাইজেরিয়ার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি। রাজধানী আবুজার প্রতিও তারা হুমকি নয়। তবে উত্তরের জনগণের জন্য তারা সৃষ্টি করেছে নতুন সব সমস্যা এবং আশঙ্কা। তাদের কার্যক্রমের কারণে দেশের বাইরে নাইজেরিয়ার সুনামও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ব্যবসা আর বিনিয়োগের জন্য এটা ভালো নয় মোটেও। তাদের অধিগ্রহণকৃত গ্রামগুলোর বেশিরভাগই মান্দারা পর্বতমালার মধ্যে। এই অঞ্চলটা ক্যামেরুনের পাশে। নাইজেরিয়ার সামরিক

বাহিনীকে এখানে আসতে হলে তাদের ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে আসতে হয়। এতদূর এসেও এই পার্বত্য এলাকায় তারা বোকো হারামকে ঘেরাও করতে পারে না। ক্যামেরুনের সরকার বোকো হারামকে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু এলাকাটাই এমন যে লুকিয়ে থাকতে বোকো হারামের কোনো সমস্যা হয় না।

এই সংকট এত সহজে দূর হবে না। আরো বহু বছর এখানে কিছুই করা সম্ভব হবে না হয়তো। এর মধ্যেই বোকো হারাম উত্তরের সাহেল অঞ্চলে জিহাদিদের সাথে জোট বাঁধার চেষ্টা করছে। অ্যামেরিকা এবং ফ্রান্স এই ব্যাপারটা অনেকদিন ধরেই দেখছে। তারা এই নিয়ে চিন্তিতও বটে। তাই এই বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য তারা সাহারা-সাহেল অঞ্চলে ড্রোন পাঠিয়ে জিহাদিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

অ্যামেরিকানরা অবশ্য আফ্রিকায় কিছু ঘাঁটিও স্থাপন করেছে। এর মধ্যে একটি জিবুতিতে। ২০০৭ সালে স্থাপিত এই ঘাঁটিটি আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক কার্যক্রমের অংশ। ফ্রেঞ্চরাও আফ্রিকার বেশ কিছু অঞ্চলে নিজেদের প্রবেশের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই অঞ্চলগুলোকে তারা বলে "ফ্রাংকোফোন আফ্রিকা"। ইসলামপন্থী জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম বেশ কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই পশ্চিমা বিশ্ব এসব নিয়ে বেশ সতর্ক। নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন এবং চাদ, প্রতিটি দেশই অ্যামেরিকা এবং ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করছে।

আরো দক্ষিণে, আটলান্টিক উপকূলের গভীরে সাব-সাহারান আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ-অ্যাঙ্গোলা। একসময় পর্তুগিজ কলোনি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া এই দেশটির প্রাকৃতিক সীমানা আছে। আফ্রিকার অন্য অনেক দেশের মতো এই দেশের সীমানা ইউরোপীয়দের আরোপিত না। এর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে গহীন বন, আর দক্ষিণে মরুভূমি। পূর্বদিকে অল্পকিছু মানুষজন বসবাস করে। কারণ এখানকার ভূমি মোটেও উর্বর নয়। দেশটির ২.২ কোটি মানুষের প্রায় সবাই বাস করে দেশের পশ্চিম প্রান্তে। এই অংশটিতে আছে প্রচুর পানি। চাষাবাদের জন্যও চমৎকার। এই অঞ্চলের উপকূলেই সঞ্চিত আছে অ্যাঙ্গোলার তেল। তেলের খনিগুলোর বেশিরভাগেরই মালিকানায় আছে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি। তবে উৎপাদিত

তেলের অর্ধেকই চলে যায় চীনে। এই কারণে সৌদি আরবের পর অ্যাঙ্গোলাই চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম অপরিশোধিত তেলের যোগানদাতায় পরিণত হয়েছে।

অ্যাঙ্গোলা দেশটিও যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত। স্বাধীনতার জন্য তাদের পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ১৯৭৫ সালে পর্তুগাল এই জায়গা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। এর পরপরই এই এলাকার জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ। জাতিদ্বন্দ্বকে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলোও নিজেদের সুবিধামতো এখানে তাদের সমর্থন যুগিয়ে যায়। রাশিয়া আর কিউবা ছিল স্যোসালিস্টদের পক্ষে, অন্যদিকে অ্যামেরিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল বিদ্রোহীদের মদদদাতা। এগুলো নামেই ছিল আদর্শের যুদ্ধ, আসলে পুরোটাই ক্ষমতা দখলের লড়াই।

MPLA (Popular Movement for the Liberation of Angola)-এর অধিকাংশ স্যোসালিস্ট কর্মীই ছিল এমবুন্ডু গোষ্ঠীর। তাদের বিরোধী পক্ষরা ছিল বাকোংগো এবং অভিমবুন্ডু গোত্রের। তারা যথাক্রমে FNLA (National Liberation Front of Angola) এবং UNITA (National Union for the Total Independence of Angola) নামের দুইটি রাজনৈতিক দলের ছদ্মাবরণে ছিল। ১৯৬০ থেকে ৭০-এর দশকে এখানে যেসব গৃহযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেগুলোর ধরন ছিল মোটামুটি একইরকম- রাশিয়া কোনো একটা পক্ষকে সমর্থন করলেই তাদের হঠাৎ মনে পড়ে যাবে যে তারা আসলে স্যোসালিস্ট। সমাজতান্ত্রিক মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের সংগ্রাম করার কথা! তখন তাদের বিরোধীপক্ষ সমাজতন্ত্র বিরোধী হয়ে যাবে। এমবুন্ডুদের কিছু ভৌগোলিক সুবিধা থাকলেও তারা সংখ্যায় পিছিয়ে। রাজধানী লুয়ান্ডা তাদের দখলেই ছিল। তেলের ক্ষেত্র এবং প্রধান নদী কুয়েঞ্জাও ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। তারা রাশিয়ার কাছ থেকে পেত অস্ত্র, আর কিউবার কাছ থেকে সৈনিক। ২০০২ সালের গৃহযুদ্ধেও তারাই জয়ী হয়। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পরে নেতারা রাতারাতি তাদের কমিউনিস্ট নীতি থেকে সরে আসেন। আফ্রিকার তৎকালীন প্রধান নেতাদের সাথে যোগ দিয়ে তারা কলোনিয়াল নীতির প্রসারেই কাজ করতে থাকেন। জনগণের স্বার্থ তাদের কাছে গৌণ হতে থাকে। লুটতরাজ করে নিজের আখের গোছাতে শুরু করেন তারা।

আর আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের দেশগুলোর নাক গলানো একবিংশ শতকেও অব্যাহত আছে। বিশেষ করে চাইনিজরা এখন আফ্রিকার অনেক বিষয়-আশয় নিয়ে একটু বেশিই ভাবছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা। এর আগে ইউরোপীয় এবং অ্যামেরিকানরা এই একই কাজ করে এসেছে এখানে। বর্তমানে চীনের তেলের এক তৃতীয়াংশই আসে আফ্রিকা থেকে। আরো আসে মূল্যবান নানা ধাতু। তাই, চীন সহজে আফ্রিকাকে ছাড়ছে না। ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় তেলের কোম্পানিগুলো এখনো আফ্রিকাতে রয়ে গেছে। তবে চীন দ্রুতই তাদেরকে ধরে ফেলবে মনে হচ্ছে। লাইবেরিয়াতে চাইনিজরা খুঁজছে লোহা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো আর জাম্বিয়াতে খুঁজছে কপার, অন্যদিকে কোবাল্টের খোঁজ চলছে শুধু ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে। কেনিয়ায় ইতোমধ্যেই তারা মোম্বাসা বন্দরকে ঢেলে সাজাতে সহায়তা করেছে। বিখ্যাত মোম্বাসা বন্দর এখন বিশাল সব প্রকল্পের জন্য প্রস্তুত। কেনিয়ার তেলসম্পদও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মোম্বাসা এবং রাজধানী নাইরোবির মধ্যে সংযোগ ঘটাতে চীন হাতে নিয়েছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প। তারা এই প্রকল্পে গড়বে রেলপথ, রাস্তা এবং সেতু। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সড়ক এবং রেলপথ তৈরি হয়ে গেলে দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগের জন্য সময় কমে ৩৬ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টায় পরিণত হবে। যাতায়াতের খরচও কমবে ৬০ শতাংশ। নাইরোবির সাথে দক্ষিণ সুদান, উগান্ডা এবং রুয়ান্ডাকে সংযুক্ত করারও পরিকল্পনা হচ্ছে। চীনের সাহায্য নিয়ে পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষমতাধর দেশে পরিণত হতে চায় কেনিয়া।

ওদিকে তানজানিয়াও চেষ্টা করছে এই লড়াইয়ে সামিল হতে। তারা চীনের সাথে তাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করে ফেলেছে। চীনের পাশাপাশি ওমানের একটি নির্মাতা কোম্পানির সাথে চুক্তি করে তারা বাগামায়ো বন্দরটি সম্প্রসারণের কাজ করছে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে দার-এস-সালামের মূল বন্দরটির ওপর থেকে বর্তমানের অত্যাধিক চাপ কমে যাবে। আশা করা হচ্ছে বাগামোয়ো বন্দরের কাজ শেষ হলে এটা বছরে ২০ মিলিয়ন কার্গোর চাপ সামলাতে পারবে। এই বন্দরটিকে তারা আফ্রিকার সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত করতে চায়।

Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania নামে উর্বর ক্ষেত্রের সাথে বাকি তানজানিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত উন্নতমানের করে তোলা হয়েছে। আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলের পনেরোটি দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছে "Southern African Development Community"। এই দক্ষিণ আফ্রিকান মৈত্রীজোটের সাথেও তারা উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছে। তানজানিয়া এর ফলে আফ্রিকার উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যকার করিডরে পরিণত হয়েছে। ফলে ডি. আর. কঙ্গো ও জাম্বিয়ার তামার খনির সাথে ডারবান, দার-এস-সালাম বা মালাউই বন্দরের যোগাযোগ সহজতর হচ্ছে। এতকিছুর পরেও তানজানিয়ার পক্ষে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ হওয়া সম্ভব হবে না। এই লড়াইয়ে কেনিয়াই এগিয়ে থাকবে। পাঁচ দেশের পূর্ব আফ্রিকান অঞ্চলে কেনিয়ার অর্থনীতি সব থেকে শক্তিশালী। এই অঞ্চলের জিডিপির ৪০ শতাংশই কেনিয়ার। তানজানিয়ার চেয়ে কেনিয়ার চাষযোগ্য জমি কম, তবে যা আছে সেটাই তারা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করছে। তাদের শিল্প-কারখানাগুলোও বেশ ভালোভাবেই পরিচালনা করছে তারা। অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি তারা বহির্বিশ্বেও পণ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। যদি রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই কেনিয়া এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতে পারবে।

চীনের উপস্থিতি পৌঁছে গেছে নাইজার পর্যন্ত। চীনের পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দেশটির মধ্যে তেল উত্তোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। ওদিকে অ্যাঙ্গোলায় চীনের বিনিয়োগ ৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রতিবছরই এটা বেড়েই চলেছে। বেনগুয়েলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করতে চাইনিজ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (CREC) ইতোমধ্যেই ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এই পথ ডি. আর. কঙ্গোকে ৮০০ মাইল দূরে আটলান্টিক উপকূলে অ্যাঙ্গোলার লোবিতা বন্দরের সাথে সংযুক্ত করেছে। এই পথ ধরে আসে কোবাল্ট, তামা এবং ম্যাঙ্গানিজ, যার অভিশাপ এবং আশীর্বাদ দুইটিই ভোগ করছে ডি. আর. কঙ্গোর কাতাঙ্গা প্রদেশ।

লুয়ান্ডায় একটা নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের কাজ করছে চীন। চাইনিজ নির্মাণ কৌশল অনুসরণ করে রাজধানী শহরে বিশাল সব

অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব স্থানে প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ চাইনিজ শ্রমিক বসবাস করে। এই শ্রমিকদের অনেকের আবার সামরিক দক্ষতাও আছে। এ যেন আরেক মিলিটারি! নিজেদের রক্ষা করতে জানে তারা। পরিস্থিতির প্রয়োজনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আফ্রিকার স্থানীয় জনগণ বিদেশিদের প্রতি সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখায় না। কখনো তাদের আচরণ বেশ বিরূপ হয়ে ওঠে। সংঘাতের আশঙ্কা তাই সব সময়ই থেকে যায়। এজন্যই শ্রমিকদের বাছাই করার সময় সামরিক দক্ষতাসম্পন্নদের নেওয়া হয়েছে।

পণ্য তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করতে অ্যাঙ্গোলাকে চীনের প্রয়োজন। পৃথিবীর বড় বড় সব দেশই এই কাঁচামালগুলো হন্যে হয়ে খুঁজছে সবখানে। কাঁচামালের এই যোগান অব্যাহত রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করাও অতি জরুরি। প্রেসিডেন্ট এডুয়ার্দো দস সান্তোস ৩৬ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। তিনি যদি তার জন্মদিনে ১ মিলিয়ন ডলার খরচ করে মারিয়া ক্যারিকে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ করতে চান, তা তিনি এত বড় গায়িকাকে আনতেই পারেন! আর তার গোষ্ঠী এমবুন্ডুর জনগণ যদি মনে করে যে আরো ৩৬ বছর তিনি ক্ষমতায় থাকবেন, সেটা তাদের ব্যাপার। তাছাড়া, বেশিরভাগ আফ্রিকান সরকারই চাইনিজদের হস্তক্ষেপ চায়। এটা তাদের কাছে বহুল প্রার্থিত। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো মানবাধিকার সংক্রান্ত কঠিন সব শর্ত দিয়ে তাদের বিব্রত করে না বেইজিং। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ নেই। নেতারা ইচ্ছামতো তাদের লুটতরাজ চালিয়ে গেলেও কোনো বাধা দিবে না চাইনিজরা। এগুলো আইএমএফ অথবা বিশ্বব্যাংকের সমস্যা।

সুদানের উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। চীনের কাছে সব থেকে ব্যবসাবান্ধব দেশ হলো সুদান। চীন সবসময় সুদানের পক্ষে কথা বলে চলেছে। আন্তর্জাতিক আদালতে সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের নামে জারি হওয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে চীন মাথা ঘামায় না। চীন ঠিকই তাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব এই নিয়ে চীনের ব্যাপক সমালোচনা করে চলেছে। কিন্তু চীন এসবের থোড়াই কেয়ার করে! তাদের ভাষ্যে এসব আফ্রিকার নিজস্ব ব্যাপার। আফ্রিকার সাথে অতীতে ইউরোপ যা করেছে, সেই ইতিহাস ঘাঁটলে

মানবিকতা আর মূল্যবোধ সম্পর্কিত ইউরোপের এইসব বক্তৃতাকে আয়রনি মনে হতেই পারে। এটা চীনও জানে। তাই তারা এসব নিয়ে না ভেবে ব্যবসাতেই মনোযোগ দিচ্ছে।

চাইনিজরা আফ্রিকার তেল, খনিজ পদার্থ এবং ধাতু চায়। সেইসাথে আফ্রিকান বাজারকেও ধরতে চায়। দুই পক্ষের সরকারের জন্যই লাভজনক পরিস্থিতি। কিন্তু স্থানীয়দের সাথে চাইনিজ কর্মীদের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। এই কারণে বেইজিংকে স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মাথা ঘামাতেই হচ্ছে। কিছু পরিমাণ মিলিটারিও দিতে হচ্ছে সেসব এলাকায়।

আফ্রিকায় চীনের পুরোনো বন্ধু হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দুই দেশ বহু বছর ধরেই একসাথে ব্যবসা করে আসছে। রাজনীতি আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের বেশ ভালো বুঝাপড়া। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান, জোহান্সবার্গ, প্রিটোরিয়া কেপটাউন এবং পোর্ট এলিজাবেথে কয়েকশ চাইনিজ কোম্পানি কাজ করছে। আফ্রিকাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নাইজেরিয়ার পরেই দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থান। দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যা ৫৩ মিলিয়ন। সামরিক শক্তি এবং অর্থনীতিতে তারা অ্যাঙ্গোলার চেয়ে যথেষ্ট এগিয়ে আছে। আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশের চেয়েই দক্ষিণ আফ্রিকা বেশি উন্নত। আফ্রিকার একদম দক্ষিণ প্রান্তে এর অবস্থান। আফ্রিকার একদম দক্ষিণে অবস্থানের কারণে দুইটি মহাসাগরেই তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। তাদের আছে সোনা, রূপা এবং কয়লার মতো মূল্যবান খনিজ আর চাষাবাদের উপযোগী উর্বর ভূমি। দক্ষিণে অবস্থানের পাশাপাশি তাদের আরো একটা ভৌগোলিক সুবিধা আছে। এখানে উপকূলীয় অঞ্চলের সমতলভূমিগুলোর বেশিরভাগই হঠাৎ করে উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাই আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতো তাদের রোগ বালাইয়ের সমস্যা কম। মশার পক্ষে এখানে বংশ বিস্তার করা কঠিন, তাই ম্যালেরিয়াও নেই। এইজন্য ইউরোপীয়রা অন্যান্য আফ্রিকান দেশের তুলনায় এখানে অনেক দ্রুতগতিতে ভেতরে ঢুকে যেতে পেরেছে। ঔপনিবেশিক আমলে স্বল্প পরিসরে চালু করা শিল্প-কারখানাগুলো এখন অনেক বড় হয়েছে। তারা পরিণত হয়েছে আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতিতে। আফ্রিকার দক্ষিণের সাথে বহির্বিশ্বের ব্যবসা মানেই প্রিটোরিয়া, ব্লুমফন্টেইন অথবা কেপটাউন। এই অঞ্চলগুলো দক্ষিণের

ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। দক্ষিণ আফ্রিকা তার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অবস্থানগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ উন্নত করেছে। তারা ইস্ট লন্ডন, কেপটাউন, পোর্ট এলিজাবেথ এবং ডারবান থেকে উত্তরে জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, জাম্বিয়া, মালাওয়ি এবং তানজানিয়ার সাথে রেল এবং সড়ক যোগাযোগ তো স্থাপন করেছেই, এমনকি ১৮০০ মাইল দক্ষিণে ডি. আর. কঙ্গোর কাতাঙ্গা প্রদেশ এবং পূর্বদিকে ১২০০ মাইল দূরে মোজাম্বিক পর্যন্তও চলে গেছে।

অতীতে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অ্যাঙ্গোলার এমপিএলএ-কে সহায়তা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস। একসাথে যুদ্ধ করার সেই দিন এখন আর নেই। এখন সবাই নিজেদের আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে ব্যস্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার সমকক্ষ হতে হলে তাই অ্যাঙ্গোলাকে এখনো বহু পথ যেতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সামরিক লড়াইয়ে তারা পেরে উঠবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার আছে প্রশিক্ষিত বিশাল সামরিক বাহিনী। এক লক্ষের বেশি সৈনিক, ডজন ডজন ফাইটার জেট, অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার। এছাড়াও আছে সাবমেরিন এবং ফ্রিগেট। তারা নিজেরাই অস্ত্র রপ্তানিকারী দেশ।

ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ ছিল উত্তমাশা অন্তরীপকে দখলে রাখা। উত্তমাশা অন্তরীপকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলে দক্ষিণ সাগর এবং ভারত মহাসাগরে প্রবেশের সুবিধা পাওয়া যেত। বর্তমানের আধুনিক নৌবাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলরেখা থেকে অনেক গভীর সমুদ্র দিয়ে মহাসাগর পার হতে পারে। তাই বলে এই অন্তরীপের গুরুত্ব এতে কমে যায়নি। ভৌগোলিক এবং কৌশলগত কারণে উত্তমাশা অন্তরীপ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকার এ এক অমূল্য সম্পদ। উত্তমাশা অন্তরীপ বা "কেপ অফ গুড হোপ" এর কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা এখনো আফ্রিকার নিচের অংশে বড় খিলাড়ি হয়ে থাকতে পারছে।

নতুন শতাব্দীতে আফ্রিকার জন্য অপেক্ষা করছে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের ধরন দুই রকম। সম্পদের প্রলোভনে বাইরের দেশগুলো এখানে এসে প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে। তেমনই স্থানীয় দেশগুলো নিজেরাও শক্তি

বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সবার আগে সবার চেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠতে চায়। ১৫টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত Southern African Development Community (SADC)-এর নিয়ন্ত্রণ করে তারাই। বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও একটা ভালো অবস্থানে আছে তারা। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা সেখানকার সদস্য নয়, পর্যবেক্ষক। SADC এর বিরোধীপক্ষ হলো East African Community (EAC)। সেখানে আছে বুরুন্ডি, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, উগান্ডা এবং তানজানিয়া। তানজানিয়া আবার দুইটি সংস্থারই সদস্য। ইএসি'র অন্য সদস্যরা দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে তানজানিয়ার সম্পর্ক ভালো চোখে দেখে না। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্য তানজানিয়াকে কাজে লাগাচ্ছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্রিগেড আছে। তবে এই বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে কাজ করছে। কিন্তু, সেখানকার অমূল্য খনিজের ওপর রাজনৈতিক দখল ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ওখান থেকে সরতে চাইবে না। এসব নিয়ে উগান্ডার সাথে তাদের দ্বন্দ্ব চলছে। আর উগান্ডার সাথে আছে বুরুন্ডি ও রুয়ান্ডা। সবাই ডি. আর. কঙ্গোর দখল চায়।

আগের দিনের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে আফ্রিকার হাতে কোনো উপায় ছিল না। তার ওপর ছিল ইউরোপীয়দের বেধে দেওয়া সীমানাজনিত সমস্যা। এখন সব দেশেই জনসংখ্যা বাড়ছে, গড়ে উঠছে মহানগরী। প্রযুক্তিগত সুবিধা পাচ্ছে সবাই। এই সময়ে এসে বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ না রেখে আফ্রিকার উপায় নেই। ফলে তারাও আর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বাইরে নেই। এত এত সমস্যা সত্ত্বেও আফ্রিকা অনেক উন্নতি করছে। যে নদীগুলোর গঠনগত সমস্যার কারণে তারা ব্যবসায় পিছিয়ে ছিল, সেই নদীগুলোকে তারা এখন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করছে। খনিজ সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে। তবে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধা সবাই সমানভাবে পাচ্ছে না। অসম বন্টনের ফলে তৈরি হচ্ছে বৈষম্য।

এতসব কিছুর পরেও আফ্রিকার উন্নতিকে অস্বীকার করা যাবে না। দারিদ্র্যের হার কমেছে, স্বাস্থ্যখাতে উন্নতি ঘটেছে। আফ্রিকার অনেক দেশেরই মূল ভাষা ইংরেজি হওয়াটা একটা সুবিধা তাদের জন্য। ব্যবসায়িক যোগাযোগের

ক্ষেত্রে এটা তাদের কাজ লাগছে। গত দশকের অধিকাংশ সময় জুড়েই আফ্রিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত ছিল।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি শক্তি আর প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা এবং দরপতনের সাথে তাদের ভাগ্য জড়িত। তাদের বাজেট নির্ভর করে ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ১০০ ডলার থাকবে নাকি ৮০ বা ৯০ ডলারে নেমে যাবে, সেই হিসাবের ওপর। অধিকাংশ দেশের সিস্টেম সেই ১৯৭০-এর দশকের মতোই অকার্যকর রয়ে গেছে। পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবসাতেও আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল একেবারেই পিছিয়ে আছে। দুর্নীতি এখনো বড় একটা সমস্যা। সোমালিয়া, সুদান বা নাইজেরিয়ার মতো বিভিন্ন দেশে অভ্যন্তরীণ সংঘাত এখনো চলমান। দেশগুলোর মধ্যেকার বিশাল দূরত্বের সমস্যা তো আছেই! তবে প্রতি বছরই প্রচুর নতুন নতুন সড়ক এবং রেলপথ তৈরি হচ্ছে। বৈচিত্র্যময় এই দেশগুলো এখন একে অপরের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। মরুভূমি আর সাগরের বাধা পেরিয়ে এখন আকাশপথে পরিবহন সহজ হচ্ছে। ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বাধা ডিঙিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জায়গায় জায়গায় তৈরি হচ্ছে বন্দর।

১৯৬০ থেকে শুরু করে প্রতি দশকেই আশাবাদীরা বলে এসেছেন, আফ্রিকা তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে এইবার তারা সেটা বাস্তবায়ন করার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। যাবে নাই বা কেন! সাব-সাহারান অঞ্চলে এই মুহূর্তে জনসংখ্যা ১.১ বিলিয়ন। ২০৫০ সালের মধ্যে তা ২.৪ বিলিয়নে পরিণত হতে পারে। এই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলে তাদের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হবে।

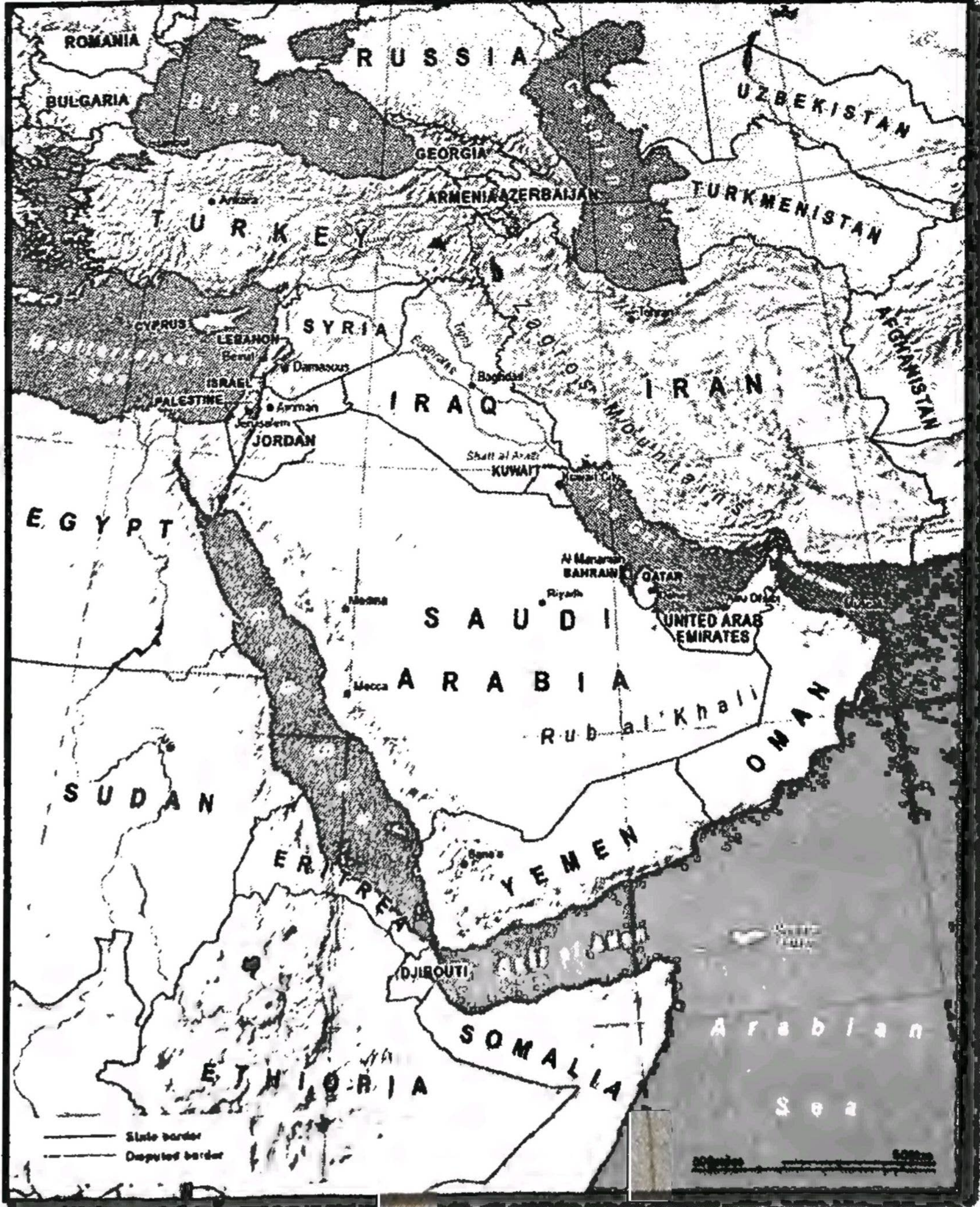
অধ্যায় ছয়

ম ধ্য প্রা চ্য



"আমরা সাইকাস-পিকোতে চুক্তিটি ভাঙতে পেরেছি"

-একজন আইসিস যোদ্ধা, ২০১৪





মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য! কোন অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থান এটা? প্রাচ্য মানে পূর্ব, কিন্তু কোন স্থানের পূর্ব? আসলে মধ্যপ্রাচ্য নামটি রেখেছে ইউরোপীয়রা। এই নামটি তাদের ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেওয়া। তারা যেভাবে পৃথিবীটা দেখে, তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। আফ্রিকাতে যেমন ইউরোপীয়রা ম্যাপের ওপর কলম দিয়ে এঁকে নিজেদের সুবিধামতো নতুন নতুন সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই আরোপিত সীমানা বদলে দেওয়ার বিপ্লব মধ্যপ্রাচ্যে এখনো চলছে। এই বিপ্লব যে খুব শান্তিপূর্ণ উপায়ে হচ্ছে তা বলা যায় না। ২০১৪ সালে স্যোসাল মিডিয়া আর ই-মেইলে ছড়িয়ে পড়া ভয়ংকর সহিংস ভিডিওগুলো থেকে এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝা যায়। বিস্ফোরণ বা শিরশ্ছেদ সবই ছিল এই বিপ্লবের অংশ। এসব ছাড়াও ইসলামিক স্টেটের একটা প্রোপাগান্ডা ভিডিও আলোচনার দাবি রাখে। ভিডিওটিতে দেখা যায় ইরাক আর সিরিয়ার সীমানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সীমানা বলতে সেখানে ছিল কেবলই বালি। তারা বুলডোজার দিয়ে সেই বালিগুলো মিশিয়ে দেয়। এরপর সেই সীমানাটি অদৃশ্য হয়ে যায়। কাগজে-কলমে অবশ্য এখনো রয়ে গেছে সেই সীমানা। ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধারা বলেছেন, "আমরা সীমানা ভেঙে দিচ্ছি, বাধা ঘুঁচিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহকে ধন্যবাদ।" আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বুঝা যাবে তাদের এই উক্তির সারবত্তা। বুঝা যাবে তাদের এই প্রত্যাশা কি সাহসের ওপর ভর করে বলা, না কি তারা আসলেই ভবিষ্যত দেখার মতো প্রজ্ঞা অর্জন করেছে।

এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও মধ্যপ্রাচ্যে এত সীমানা ছিল না। যা'ও বা ছিল তা তৈরি হয়েছিল ভৌগোলিক কারণে। দেশগুলো শুধু ভৌগোলিক অবস্থান, জাতিসত্তা বা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদাভাবে শাসিত হতো। স্থানীয়রা এখানে জাতি-রাষ্ট্র তৈরির কোনো চেষ্টাই করেনি

কখনো। ভূমধ্যসাগর থেকে ইরানের পর্বতমালা পর্যন্ত পশ্চিম থেকে পূর্বে, বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য প্রায় ১০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর থেকে দক্ষিণে, কৃষ্ণসাগর থেকে আরব সাগর ও ওমান পর্যন্ত ধরলে তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২০০০ মাইল। এই অংশে আছে বিশাল মরুভূমি, মরুদ্যান, তুষারাবৃত পর্বত, দীর্ঘ নদী, বড় বড় শহর এবং উপকূলীয় সমভূমি। সবচেয়ে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদগুলোও তাদের আছে- তেল এবং গ্যাস, যা পৃথিবীর প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের লাগবেই। এখানে আরো আছে মেসোপটেমিয়া নামক প্রাচীন উর্বর অঞ্চল। ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী এই ভূমি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তবে মধ্যপ্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বিশাল আরব মরুভূমি এবং এর শুষ্ক ভূমিগুলোর মাধ্যমে। এই মরু অঞ্চলের কেন্দ্রে আছে ইসরায়েলের কিছু অংশ, জর্দান, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত, ওমান, ইয়েমেন এবং সৌদি আরবের অধিকাংশ এলাকা।

এর মধ্যে একটা মরুভূমির নাম রাব আল খালি বা শূন্যস্থান। বিশাল এই মরুভূমি আয়তনে প্রায় ফ্রান্সের সমান। রাব আল খালি'র মত একটানা এত বিশাল মরুভূমি বিশ্বের আর কোথাও নেই। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বেশিরভাগ মানুষই বসবাস করে মরুভূমির কিনারার দিকে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের আগে তারা জাতি-রাষ্ট্রের কথা ভাবেইনি। আনুষ্ঠানিক কোনো সীমান্তেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় গিয়ে একই গোত্রের আরেকজন লোকের সাথে দেখা করতে হলে সিলছাপ্পড়ওলা দলিল-দস্তাবেজ লাগবে কেন? সেই কাগজ আবার ঠিক করে দেবে অন্য এক শহরে বসে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি, যাকে সে চেনেই না! প্রাচীন অধিবাসীদের কাছে এসব বিষয় কোনো অর্থই বহন করত না। তাহলে কোথা থেকে এই সীমানা এবং দলিল দস্তাবেজগুলো এল? কেন একই গোত্রের দুইটি মানুষ দুই দেশের অধিবাসী হিসেবে বিবেচিত হলো? কারণ, দূর দেশ থেকে বিদেশিরা এসে বলেছিল যে একেকটি এলাকা এখন আলাদা, তারা আলাদা দেশের নাগরিক।

এই অঞ্চলগুলো বহুদিন ধরে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সেই ১২৯৯ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত চলেছে অটোমান শাসন। এই

সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল। ভিয়েনা থেকে আনাতোলিয়া (আধুনিক তুরস্ক) হয়ে আরব উপদ্বীপ এবং ভারত মহাসাগর পর্যন্ত। এখন আমরা যেসব অঞ্চলকে আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, ইসরায়েল/প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, জর্দান, ইরাক এবং ইরান (কিছু অংশ) বলে জানি- এর সবই ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ। এই বিশাল সাম্রাজ্যের মানুষ নিজেদেরকে অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবেই ভাবত। তাই তারা আলাদা দেশ গঠনের কথা ভাবেনি।

অটোমান সম্রাটরা এই বিশাল অঞ্চলকে আলাদা আলাদা নাম দিতে আগ্রহী ছিলেন না। তবে ১৮৬৭ সালে এই নীতিতে একটু বদল আনে তারা। বিভিন্ন প্রশাসনিক এলাকাকে আলাদা করে ফেলা হয় এবং এগুলোর নাম দেওয়া হয় "ভিলায়েত"। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করেই মূলত এই প্রশাসনিক এলাকাগুলো আলাদা করা হয়। কখনো তা বর্তমানের উত্তর ইরাকের কুর্দিদের নিয়ে, কখনো বর্তমান সিরিয়া-ইরাক সীমান্তের আদিবাসীদের নিয়ে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরুর পর ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ স্যার মার্ক সাইকস একটা কাজ করলেন। তিনি একটা চিনাগ্রাফ পেন্সিল দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ভেতর লাইন টানলেন। এই লাইনটা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের হাইফা থেকে শুরু করে ইরাকের কিরকুক পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। কেন এই লাইন টানা হয়েছিল? এটি মূলত ছিল ব্রিটেন আর ফ্রান্সের এক বিশেষ এক পরিকল্পনা। ফ্রেঞ্চ কূটনৈতিক ফ্রাঙ্কোইস জর্জেস-পিকোতে ছিলেন এই পরিকল্পনার আরেকজন হোতা। তারা চেয়েছিলেন এই অঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলে আলাদা আলাদা অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাতে। মিত্রজোট (ফ্রান্স, ব্রিটেন আর রাশিয়া) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যকে পরাজিত করার পর এই লাইন টানা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরের অংশটা ফ্রেঞ্চদের দখলে আর দক্ষিণের অংশ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে রাখার চুক্তি হয়। পরবর্তীতে এটা পরিচিত হয় 'সাইকস-পিকোতে চুক্তি' নামে। এই অঞ্চলের অনেক সিদ্ধান্ত, ইতিহাসের বাঁকবদল, জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এই চুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট মনে হতেই পারে। কারণ ইউরোপীয়রা আসার আগেও এখানে সহিংসতা এবং বিভেদ ছিল। তা সত্ত্বেও, এইসব কৃত্রিম লাইন টেনে আলটপকা জাতিরাষ্ট্র

গঠন যে কখনোই ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না তা আমরা আফ্রিকার ক্ষেত্রে দেখেছি। এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

এই চুক্তির আগে সিরিয়া বলে কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ছিল না লেবানন, জর্দান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, ইসরায়েল বা প্যালেস্টাইন। এইসব নাম আমরা এখন আধুনিক ম্যাপে দেখতে পাই। এই রাষ্ট্রগুলো একদমই নতুন এবং মজবুত ভিত্তির অভাবে ভঙ্গুর। মধ্যপ্রাচ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম। তবে ইসলামের নানারকম সংস্করণ প্রচলিত আছে এখানে। সবচেয়ে বড় বিভাজনটি অনেক পুরাতন, প্রায় খোদ ইসলাম ধর্মের বয়সীই। তা হলো শিয়া-সুন্নি বিভেদ। ইসলামের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) ৬৩২ সালে মারা যাবার পর থেকেই এই বিভাজন শুরু হয়। সুন্নি মুসলিমরাই আরবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এমনকি পৃথিবীর সকল মুসলমানের ৮৫ শতাংশই সুন্নি। সুন্নি নামটি এসেছে "আল সুন্না" শব্দটি থেকে যার অর্থ "ঐতিহ্য রক্ষা করা মানুষ"। নবীর মৃত্যুর পর যারা বললেন যে- ইসলামের উত্তরসূরি নির্বাচন করা হবে আরবের আদি ঐতিহ্য মেনে, তারাই পরে সুন্নি হিসেবে পরিচিতি পান। তারা নিজেদেরকে প্রথাসম্মত মুসলিম হিসেবে দাবি করেন। সুন্নিরা নিজেদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবেও দাবি করেন।

অপরদিকে শিয়া শব্দটি এসেছে "শিয়াত আলি" থেকে। এর অর্থ "আলির দল"। আলি ইবনে আবু তালিব ছিলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কন্যার স্বামী। আলি এবং তার দুই পুত্র হাসান ও হোসেন, তিনজনই গুপ্তহত্যার শিকার হন। শিয়াদের মতে, মহানবীর মৃত্যুর পর হাসান এবং হোসেনেরই ইসলামকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা করতে দেওয়া হয়নি। এখান থেকেই ইসলামে দুইটি শাখা তৈরি হয়। জন্ম দেয় নানারকম মতবাদগত বিরোধের। যদিও একটা সময় বহুবছর ধরে তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল।

এই দুই শাখার মধ্যে আবার আছে নানারকম উপশাখা। সুন্নিদের মধ্যে এই উপশাখাগুলো তৈরি হয়েছে নানা মুফতি এবং মাওলানাদের অনুসরণ করে। এর মধ্যে আছে উনিশ শতকের কট্টরপন্থী ইরাকি মুফতি আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারীরা। কাতার এবং সৌদি আরবের অনেক মুসলিম তাকে অনুসরণ করে। উপমহাদেশে এরা হাম্বলি মাযহাব নামে পরিচিত। এদের মধ্যে

থেকেই জিহাদি মতবাদে বিশ্বাসী অতি রক্ষণশীল সালাফিদের উত্থান ঘটেছে। আবার শিয়াদের মধ্যে তিনটি প্রধান ভাগ আছে। এর মধ্যে প্রধানতমটি হলো বারো ইমামের অনুসারীরা। ইসমাইলি ভাবধারার শিয়ারা সপ্তম ইমামের মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, আবার যাইদি ভাবধারার শিয়ারা পঞ্চম ইমামকে মানতে রাজি নয়। মূলধারার শিয়া মতবাদের বাইরেও অনেক মতবাদ আছে। আলাওয়িজ এবং দ্রুজরা মূলধারার ইসলাম থেকে এতটাই দূরে যে বেশিরভাগ মুসলিম, বিশেষ করে সুন্নিরা তাদের মুসলিম হিসেবে গণ্য করতেই রাজি না।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে আরবের এই দ্বিধাবিভক্ত নানা সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষেরা জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছে। তাদের নেতারা সবসময় তার নিজের গোত্রের অথবা তারা নিজেরা ইসলামের যে ধারাটির অনুসারী, সেই দলের সুবিধা দেখতে চেয়েছে। ইউরোপিয়ানদের টেনে দেওয়া লাইন ব্যবহার করে তারা নিজের জাতির ক্ষমতা সমুন্নত রাখতে চেয়েছে। ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে ইউরোপীয়রা বিভিন্ন গোষ্ঠী আর ধর্মের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছে। এই দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের সবচেয়ে করুণ উদাহরণ হলো ইরাক। শিয়া অধ্যুষিত ইরাক কখনোই সুন্নি পরিচালিত সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। নাজাফ এবং কারবালার মতো ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে তারা নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল। কারণ এখানেই আছে আলি এবং তার দুই পুত্র হাসান ও হোসেনের কবর। এই অঞ্চলের লোকেরা কয়েক শতাব্দী ধরে হাসান এবং হোসেনের কবরকে হৃদয়ের গহীনে জায়গা দিয়েছে। মাত্র কয়েক দশক আগে পাওয়া 'ইরাকি' পরিচয় প্রাচীন এই অনুভূতিকে মুছে দিতে পারেনি।

অটোমান সাম্রাজ্যের সময় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। তারা দেখতো পর্বতপূর্ণ, রুক্ষ এলাকাগুলো কুর্দিদের দখলে। অপরদিকে বাগদাদ এবং আরো পশ্চিমের অঞ্চল (যা এখন সিরিয়া নামে পরিচিত) ছিল আরব সুন্নিদের নিয়ন্ত্রণে। টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নামের দুই বিশাল নদী প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে শাত-ইল-আরবের পানিপথে। এরপরেই জলাভূমি অঞ্চল ও বসরা শহর। বসরায় বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ছিল আরব, আর তাদের মধ্যে

শিয়ারাই ছিল সংখ্যায় বেশি। অটোমানরা এই অঞ্চলকে তিনটা প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করে। মসুল, বাগদাদ এবং বসরা।

এতক্ষণ যেসব এলাকার কথা বলা হলো, প্রাচীনকালে এই এলাকাগুলো পরিচিত ছিল অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া এবং সুমের নামে। এরপর পার্সিয়ানরা এই অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। পার্সিয়ানরা এই অঞ্চল অধিগ্রহণ করার পরে তারাও অঞ্চলগুলো একইভাবে বিভক্ত করে। এমনকি পরবর্তীতে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট এবং উমাইয়া সাম্রাজ্যও এই একই পথে হেঁটেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা আসার পর প্রথমবারের মত এই ধারার পরিবর্তন ঘটে। তারা তিনটি অঞ্চলকে এক করে ফেলে। এই তিন অঞ্চলকে একত্র করার পেছনে ছিল তাদের খ্রিস্টীয় ভাবধারা। তারা পবিত্র-ত্রয়ীর কথা ভেবে এই তিন অঞ্চলকে একসাথে জুড়ে দিল । ফলে তৈরি হলো দুর্যোগ এবং দ্বন্দ্ব।

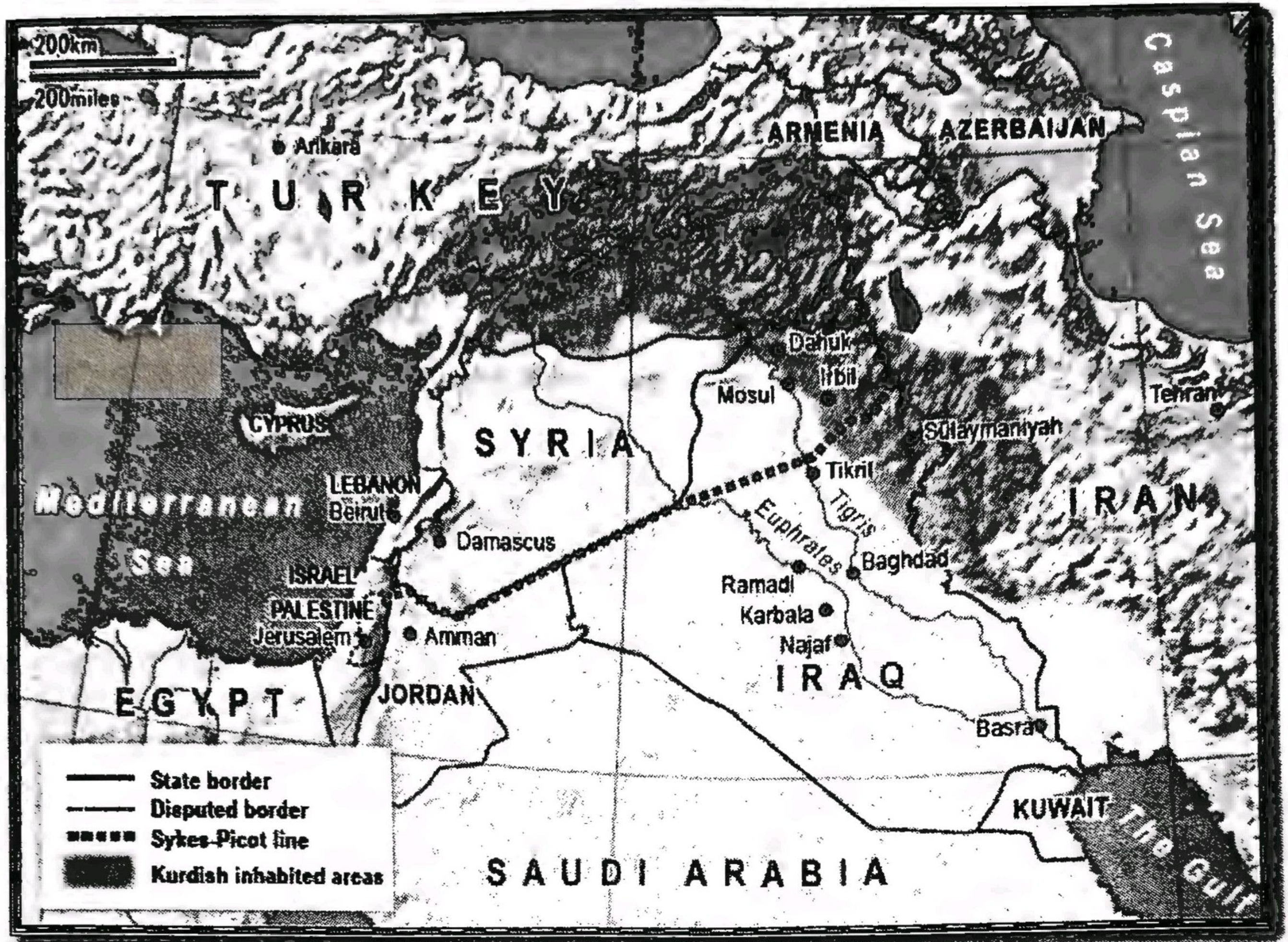
বিশ্লেষকদের মতে, একজন শক্তিশালী নেতা ছাড়া এই তিন অঞ্চলকে এক রাখা কঠিন। ইরাকে একের পর এক শক্তিশালী নেতা এসেছেন। কিন্তু তাদের কেউই সবাইকে একতাবদ্ধ করতে পারেননি। এই মানুষগুলো কোনোদিনই একতাবদ্ধ ছিল না। এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যের মনোভাব ছিল শীতল। তারা একে অপরকে ভয় পেত। আইন প্রনয়ণ করে বা প্রশাসনিক দক্ষতা দিয়ে অনেককিছু বদল করা গেলেও মানুষের মন তো আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না! বিভেদজনিত দূরত্ব এবং পারস্পরিক ভীতি রয়েই গিয়েছিল। রাষ্ট্রের প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণা বেশিরভাগ ইরাকিই বিশ্বাস করেনি। কুর্দিদের ওপর ব্যাপক বিতারণ কার্যক্রম চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ হয়নি। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের আমলে তার নিজের শহরের সুন্নি গোষ্ঠী ইরাকজুড়ে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেও সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেনি। ১৯৯১ সালে শিয়াদের আন্দোলনের সময় গণহত্যা চালিয়েও তাদেরকে থামানো যায়নি।

কুর্দিরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সংখ্যায় তারা ছিল বেশি, তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাই তাদেরকে এলাকা ছাড়তে হয়। অপরদিকে যারা একেবারেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, স্বৈরাচারের সাথে সদ্ভাব রেখেই তাদের চলতে হয়। কারণ, তাদের কোনো উপায় নেই। যেমন ইরাকি খ্রিস্টান বা

ইহুদিরা নিজেদেরকে সেকুলার স্বৈরাচারের হাতেই নিরাপদ বলে ভেবেছিল। এই কারণে তারা সাদ্দাম সরকারের সময় চুপও ছিল। তারা ভাবত, পরিবর্তন শুভ ফল বয়ে আনবে না। তবে কুর্দিরা এরকমভাবে ভাবেনি, ভাবার অবস্থায়ও তারা ছিল না। কুর্দিদের কুর্দি হওয়ার কারণ ভৌগোলিক। নিজেদের এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হলে তা তাদের মেনে নেওয়ার কথা না। তাছাড়া সংখ্যায়ও তারা অনেক। কোনো স্বৈরাচারের সামনে মাথা নত করার কোনো কারণই ছিল না তাদের।

ইরাকের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রদেশ ইরবিল, সুলাইমানিয়া এবং দাহুক অঞ্চলজুড়ে আছে প্রায় ৫০ লাখ কুর্দি। প্রচুর পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত এই এলাকার আকার একটা অর্ধবৃত্তের মতো। অনেক ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তন এবং সামরিক আগ্রাসনের পরেও কুর্দিরা তাদের নিজ পরিচয় হারিয়ে যেতে দেয়নি কখনো। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ১৯৮৮ সালের আল আনফাল অভিযানের কথা। এই অভিযানে আকাশ থেকে কুর্দিদের গ্রামে গ্রামে ফেলা হয় গ্যাস-বোমা। আটটি পর্যায়ে পরিচালিত এই অভিযানে সাদ্দাম হোসেন কাউকে আটক করেননি। তার বদলে ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক প্রায় সব পুরুষকেই মেরে ফেলেছিলেন। এক লাখের বেশি কুর্দিকে মেরে ফেলা হয় সে-সময়। তাদের গ্রামগুলোর নব্বই শতাংশই মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে একদম মুছে ফেলা হয় ম্যাপ থেকে।

১৯৯০ সালে যখন সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করেন, তখন কুর্দিরা তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন- স্বাধীন কুর্দিস্তান বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে স্বাক্ষরিত সেভরেস-এর চুক্তি অনুযায়ী স্বাধীন কুর্দিস্তান তাদের প্রাপ্য। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কখনোই বাস্তবায়ন করা হয়নি। উপসাগরীয় যুদ্ধের শেষদিকে কুর্দিরা নতুনভাবে জেগে ওঠে। মিত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে তারা একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গড়ে তোলে। কুর্দিস্তানের স্বপ্ন সত্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে থাকে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ এই স্বপ্নের পালে আরো দোলা দেয়। বাগদাদ হয়তো আর কখনোই এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে না।



চিত্র- স্বীকৃত রাষ্ট্র না হলেও 'কুর্দিস্তান' অঞ্চলটা ম্যাপে বেশ ভালোভাবেই অবস্থান করছে। এর প্রাকৃতিক সীমানাও আছে। দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে এই অঞ্চলকে ঘিরে নানারকম দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।

কুর্দিস্তান এখনো স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু, তারা অনেকটা স্বাধীন দেশের মতোই আচরণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয়ে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে কুর্দিস্তানের বক্তব্য গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুর্দিস্তান যদি ভবিষ্যতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে এর গঠনটা কেমন হবে! ইরান, সিরিয়া বা তুরস্কের কুর্দিপ্রধান এলাকাগুলো যদি কুর্দিস্তানের অংশ হতে চায়, এই দেশগুলো তখন কী করবে! সেক্ষেত্রে কুর্দিস্তানের সীমানা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ভূমধ্যসাগরে তার প্রভাব কী হবে!

এসবের বাইরেও আরো প্রশ্ন আছে। ইরাকি কুর্দিস্তান দুইটি পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে দ্বিধাবিভক্ত। অপরদিকে সিরিয়ার কুর্দিরা রোজাভা নামে একটা প্রদেশ গড়ার চেষ্টা করছে। তাদের স্বপ্ন, ভবিষ্যতে গঠিত হওয়া অখণ্ড

কুর্দিস্তানের সাথে সংযুক্ত হবে তারা। কিন্তু প্রশ্ন জাগছে, অখণ্ড কুর্দিস্তান গঠিত হলে কে কতটুকু ক্ষমতা পাবে? তখন নিশ্চিতভাবেই ইরাক রাষ্ট্রটি আর আগের মতো থাকবে না। অবশ্য ততদিনে ইরাক নামে আদৌ কোনো রাষ্ট্র নাও থাকতে পারে।

হাশেমি রাজ্য, যাকে আমরা এখন জর্দান বলে জানি, ব্রিটিশদের তৈরি আরেকটা কৃত্রিম দেশ। এই দেশটা একদম মরুভূমি থেকে তুলে আনা। একটু গোড়ার ইতিহাস দেখে নেওয়া যাক। ১৯১৮ সাল থেকে ব্রিটিশদের হাতে এলো শাসন করার জন্য বড় একটা এলাকা, আর এই অঞ্চল রয়েছে নানারকম সমস্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এখানকার আরব গোত্রগুলো ব্রিটিশদেরকে সহায়তা করেছিল। এর প্রতিদান হিসেবে ব্রিটিশরা দুইটি গোত্রকে পুরস্কৃত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। গোত্র দুইটি হলো সৌদ এবং হাশেমি। সমস্যা হলো, তারা সৌদ এবং হাশেমি এই দুইটি গোত্রকেই একই পুরস্কারের আশা দেখিয়েছিল। আর এই পুরস্কারটা ছিল "আরব উপদ্বীপের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এই দুই গোত্রের মধ্যে নিয়মিতই যুদ্ধ লেগে থাকত। তার ওপর এই প্রতিশ্রুতি তাদের মধ্যে আরো দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি তৈরি করে। সমাধান হিসেবে লন্ডন আবারও ম্যাপে হাত দেয়। আবারও আঁকিবুঁকি করে এবং কিছু অংশ সৌদ পরিবারকে আর কিছু অংশ হাশেমি পরিবারকে দিয়ে দেয়। তবে তাদের ওপর নজর রাখার জন্য সেখানে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদও নিয়োগ দেওয়া হয়। সৌদ গোত্রের নেতা অবশেষে তার অধিকৃত এলাকার জন্য একটা নাম বাছাই করে ফেলেন। নিজের নামেই তিনি দেশের নাম রাখলেন। আমরা এখন এই দেশটিকে চিনি "সৌদি আরব" নামে। ব্যাপারটা কেমন? যুক্তরাজ্যকে উইন্ডসরল্যান্ড নামে ডাকার মতোই অনেকটা।

ব্রিটিশরা অন্য এলাকাটির নাম রাখলো ট্রান্সজর্দান। এর মাধ্যমে তারা জর্দান নদীর অপর তীরকে বুঝাত। ধূলিধূসরিত ছোট্ট একটি শহর আম্মানকে ট্রান্সজর্দানের রাজধানী বানানো হলো। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশরা উপনিবেশ গুটিয়ে ফিরে যাবার পর দেশটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জর্দান। হাশেমিরা অবশ্য আম্মানের নয়। তারা মূলত মক্কার কুরাইশ গোত্রের মানুষ। জর্দানের আদি অধিবাসীরা মূলত বেদুইন। বর্তমানে অবশ্য জর্দানের অধিবাসীদের

বেশিরভাগই ফিলিস্তিনি। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলিরা পশ্চিম তীর দখল করার পর অনেক ফিলিস্তিনি জর্দানে চলে যায়। আরব রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র জর্দানই তাদেরকে নাগরিকত্ব দিয়েছিল। এখন অবস্থাটা এমন যে, জর্দানের ৬.৭ মিলিয়ন নাগরিকের অধিকাংশই ফিলিস্তিনি। জর্দানের হাশেমি গোত্রের রাজা আব্দুল্লাহর ওপর আনুগত্য প্রকাশে একেবারেই আগ্রহী নয় তারা। এর পাশাপাশি দেশটিতে আছে ১০ লাখের মত ইরাকি এবং সিরিয়ান উদ্বাস্তু। সীমিত সম্পদের এই দেশটিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে উদ্বাস্তুরা।

একটা দেশের ডেমোগ্রাফিকস বা জনসংখ্যার অনুপাত এভাবে পরিবর্তিত হলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আর এই বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে লেবাননকে। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আরবরা লেবানিজ পর্বত এবং সমুদ্রের মাঝের অঞ্চলটাকে সিরিয়ার অংশ হিসেবেই জানত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষে ফরাসিদের হাতে পড়ার পর বিষয়টি বদলে গেল। এই এলাকার আরব খ্রিস্টানদের সাথে বহু বছর ধরেই ফরাসিদের মৈত্রী ছিল। সেই সম্পর্কের দায় মেটাতে তারা আরব খ্রিস্টানদের জন্য একটি দেশ তৈরি করে দিল । সেই দেশের নাম লেবানন। ১৯২০ এর দশকে ওই এলাকায় আরব খ্রিস্টানরাই ছিল সংখ্যাগুরু। লেবাননের নাম দেওয়া হলো লেবানিজ পর্বতের নামে। ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত এই ভৌগোলিক উচ্চাশা টিকে ছিল। এরপর থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল। লেবাননের শিয়া এবং সুন্নি মুসলিমদের জন্মহার ছিল খ্রিস্টানদের তুলনায় বেশি। তাছাড়া ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর প্রচুর পরিমাণ ফিলিস্তিনি লেবাননে পাড়ি জমাতে থাকে। তাদের কারণেই মূলত মুসলিম জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। লেবাননে মাত্র একবার জনশুমারি হয়েছিল। সেটা ১৯৩২ সালে। কিন্তু এরপর আর হয়নি কেন? কারণ, কোন জনগোষ্ঠী কী পরিমাণে আছে এটা প্রকাশ করা সেখানে খুবই স্পর্শকাতর বিষয় এবং তা থেকে জন্ম নিতে পারে সংঘাত। অনেক দিন ধরেই এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই চলছে। তবে ১৯৫৮ সালে ম্যারোনাইট খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকেই ইতিহাসবিদরা প্রথম লেবানিজ গৃহযুদ্ধ হিসেব চিহ্নিত করেন। সেইসময় মুসলিমরা সংখ্যায় খ্রিস্টানদের থেকে অল্প একটু এগিয়ে ছিল। তবে এখন যে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তা দ্বিধা ছাড়াই বলা যায়। এই বিষয়ে অবশ্য কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা হিসাব নেই।

লেবাননের রাজধানী বৈরুত এবং দেশের দক্ষিণের বেশিরভাগ অংশই শিয়া অধ্যুষিত। এখানে হিজবুল্লাহ গ্রুপের বেশ প্রভাব রয়েছে। হিজবুল্লাহ গ্রুপকে মদদ যোগায় শিয়াপ্রধান দেশ ইরান। হিজবুল্লাহ বাহিনীর আরেকটি শক্তিশালী ঘাঁটি হলো শিয়া অধ্যুষিত বেকা উপত্যকা। এখান থেকে তারা সিরিয়ায় কার্যক্রম চালায় এবং তাদের সরকারকে সহযোগিতা করে। দেশের অন্যান্য শহরগুলোতে সুন্নি জনসংখ্যা বেশি। উত্তরের ত্রিপলিতে প্রায় আশি শতাংশই সুন্নি (ধারণা করা হয়)। এই শহরে অবশ্য আলাওইত গোষ্ঠীর মুসলিমরাও আছে। পাশের দেশ সিরিয়ায় চলমান সুন্নি আর আলাওইত গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের আঁচ লেবাননেও এসে পড়ে। এখানেও মাঝেমধ্যেই এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা বাধে।

বর্তমানে কেবল ম্যাপের ভিত্তিতেই লেবাননকে একক দেশ বলা সম্ভব। কিন্তু বৈরুত বিমানবন্দর থেকে নেমে একটু এগিয়ে গেলেই বুঝা যায়, বাস্তবতা মোটেও এমন নয়। বিমানবন্দর থেকে শহরের কেন্দ্রের দিকে গেলে পার হতে হবে শিয়াপ্রধান এলাকাগুলো। এই এলাকাগুলোতে মহড়া দেয় হিজবুল্লাহ। তারাই দেশের সবচেয়ে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত যোদ্ধাবাহিনী। লেবানিজ আর্মি আছে শুধু কাগজে কলমেই। যদি ১৯৭৫-৯০ এর মতো আরেকটি গৃহযুদ্ধ হয়, তাহলে এই সেনাবাহিনীও থাকবে না। যুদ্ধ লাগলে সরকারি বাহিনীর সৈন্যরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে স্থানীয় মিলিশিয়াতে যোগ দেবে। ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরু হলে এমনই হয়েছিল।

সিরিয়াতে বাস করে নানারকম মানুষ। তাদের এক গোষ্ঠীর বিশ্বাস অন্যের থেকে আলাদা। তারা নানা গোত্রে বিভক্ত। প্রথম ধাক্কাতেই এই রাষ্ট্রের একতা ভেঙে পড়ে। অন্যান্য আরব অঞ্চলের মতো সিরিয়াও সুন্নিপ্রধান। সেখানে মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই সুন্নি। পাশাপাশি আরো কয়েকটি জনগোষ্ঠীর ভালো উপস্থিতি আছে। ২০১১-এর পূর্ব পর্যন্ত সিরিয়ার শহরে, গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি সহাবস্থান করত। তবে কিছু কিছু এলাকায় নির্দিষ্ট একেকটা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল।

ইরাকে গেলে স্থানীয়রা আপনাকে বলবে "আমরা সবাই এক। আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই"। অথচ ইরাকের অধিবাসীদের নামের মধ্যেই সে

কোথায় জন্মেছে এবং তার নেপথ্যের ইতিহাস কী, তা স্পষ্টভাবে বলা থাকে। ইরাকে দল ভাগ করতে কারোরই কখনো বেগ পেতে হয়নি।

ফরাসিরা যখন সিরিয়া শাসন করত, তারাও ব্রিটিশদের মতো "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" নীতি অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ, তারা বিভেদ জিইয়ে রাখার মাধ্যমে নিজেদেরকে শক্তিশালী করে রাখত। আলাওইতরা সে-সময় নুসাইরি বলে পরিচিত ছিল। সুন্নিরা আলাওইতদের মুসলিম হিসেবে গণ্য করে না। আলাওইতরা নিজেদের ইসলামি পরিচয় সমুন্নত রাখার জন্যই মূলত আলাওইত নামটি নেয়। আলাওইত শব্দের অর্থ "আলির অনুসারী"। এই আলাওইতরা ছিল পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক মানুষ, সিরিয়ার সমাজের একদম নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা। ফরাসিদের শাসনের সময় পুলিশ এবং মিলিটারিতে নিয়োগ পেতে থাকে তারা। ধীরে ধীরে তারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রভাবশালী জাতিতে পরিণত হয়।

আলাওইত মুসলিমরা সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২ শতাংশ। সংখ্যালঘু একটা জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের এভাবে প্রভাবশালী অবস্থানে চলে যাওয়াটা অন্যেরা ভালো চোখে দেখেনি। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ একজন আলাওইত। তাঁর গোত্রের নাম আসাদ। বাশারের বাবা হাফিজ আল আসাদ ১৯৭০ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকেই এই পরিবার প্রভাবশালী হতে থাকে। ১৯৮২ সালে হামা শহরে সুন্নি জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালান হাফিজ। সে-সময় সুন্নিরা দ্রুত বাড়ছিল সংখ্যায়। আর সেই বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতেই ঘটে এই হত্যাযজ্ঞ। মাত্র কয়েকদিনেই তিনি প্রায় ৩০,০০০ মানুষ হত্যা করেন। সুন্নিরা এই ঘটনা ভোলেনি, ক্ষমাও করেনি। ২০১১ সালে যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন তারা পুরনো হিসাব মেটানোর সুযোগ পেয়ে যায়। এই গৃহযুদ্ধকে হামার ঘটনার দ্বিতীয় অধ্যায় বললেও ভুল হবে না।

সিরিয়া শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা এখনো বলা মুশকিল। তবে যদি দামেস্কের পতন ঘটে, (যদিও এরকমটা ঘটার সম্ভাবনা ক্ষীণ) তাহলে আলাওইতরা ফিরে যাবে তাদের প্রাচীন উপকূলীয় এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে। সেখানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে নিজেদের আলাদা প্রদেশ গড়ে তুলতে চাইবে। ১৯২০ এবং ৩০-এর দশকেও এরকম ঘটনাই ঘটেছিল।

তাত্ত্বিকভাবে এটা অসম্ভব নয়। আর দামেস্ক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়ে যাবে লাখ লাখ সুন্নি মুসলিম। যদি একটি সুন্নি পরিচালিত সরকার গঠিত হয়, তাহলে তারা চাইবে আলাওইতদের শেষ প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে সিরিয়ান উপকূল সুরক্ষিত করতে।

অদূর ভবিষ্যতে মনে হচ্ছে, বিভিন্ন যুদ্ধবাজ নেতারাই সিরিয়া দেশটিকে ভাগাভাগি করে নিয়ে আলাদা আলাদা অঞ্চল শাসন করবে। প্রেসিডেন্ট আসাদ এর মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর যুদ্ধবাজ নেতাদের একজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। লেবাননের সর্বশেষ গৃহযুদ্ধটি ১৫ বছর ধরে চলেছে এবং এই মুহূর্তে আরেকটা গৃহযুদ্ধের খুব কাছাকাছি আছে তারা। সিরিয়ার ভাগ্যও একইরকম হতে পারে। লেবাননের মতো সিরিয়াও বাইরের শক্তিগুলোর সুবিধা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাশিয়া, ইরান এবং লেবানিজ হিজবুল্লাহ বাহিনী সিরিয়ার সরকারি বাহিনীকে সহায়তা করে। এদিকে আরব দেশগুলো বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা করলেও বিভিন্ন দেশ আছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষে। সৌদি আরব এবং কাতার দুই দেশই এখানে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের লক্ষ্য পূরণে তারা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে।

ভিন্ন মতাবলম্বী এতগুলো অঞ্চলকে এক সুতোয় গাঁথা মোটেও সহজ কোনো কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষতা, সাহস এবং আপোস করার ইচ্ছা। এই আপোস করার মানসিকতাটা বিশেষ করে এখানকার নেতাদের মধ্যে একদমই নেই। সুন্নি জিহাদিরা তো খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে একদম ছিড়ে ফেলতে প্রস্তুত! এই ধরনের চরমপন্থী দলগুলো, যেমন আল কায়েদা বা আইএস- জনগণের সমর্থনও পাচ্ছে। তারা বলছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তৈরি হওয়া বৈষম্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে "প্যান-আরব জাতীয়তাবাদ"। আরবের জাতিরাষ্ট্রগুলোও ব্যর্থই বলা চলে। আরব নেতারা জনগণকে স্বাধীনতা, শান্তি বা উন্নয়ন কিছুই দিতে পারেনি। জিহাদি দলগুলো ইসলামতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে এসমস্ত কিছু সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছে। বেকারত্ব আর শোষণে জর্জরিত জনগণের বড় একটা অংশ এই আশ্বাসে ভরসা রেখেছে। ইসলামপন্থীরা ইসলামের সোনালি

দিনগুলোর কথা বলে। সেই দিনগুলোতে এক ইসলামের নামে আস্ত একটা সাম্রাজ্য শাসন করা হতো। প্রযুক্তি, শিল্প, চিকিৎসা সব দিক দিয়েই এগিয়ে ছিল মুসলিমরা। 'বিধর্মীরা' ইসলামি বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর- এই প্রাচীন সন্দেহকে তারা সাফল্যের সাথে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ফিরিয়ে এনেছে।

"ইরাকের আল কায়েদা" নামক আল কায়েদাসংশ্লিষ্ট একটা গোষ্ঠী ২০০০-এর দশকের শেষ ভাগে এসে ইসলামিক স্টেট নামে পরিচিতি পায়। মূলত আল কায়েদার পুরোনো সদস্যরাই ছিল এর নেতৃত্বে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ যখন চরমে, তখন আল কায়েদা থেকে বিভক্ত হয়ে এই ইসলামিক স্টেট বা আইএস গঠিত হয়। বাইরের বিশ্বে গোষ্ঠীটি প্রথমদিকে ISIL ('Islamic State In the Levant') নামে পরিচিত ছিল। আরবিতে লেভান্ট শব্দটিকে বলা হয় আল শাম। পরবর্তীতে তারা আইসিস নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালের গ্রীষ্ম থেকে নিজেদেরকে "ইসলামিক স্টেট" হিসেবে পরিচয় দিতে থাকে এই দলটি। ইরাক এবং সিরিয়ার বড় অংশে তারা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

শুরু থেকেই জিহাদিগোষ্ঠী হিসেবে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে আইসিস। তাদের প্রচারিত ধর্মীয় রোমান্টিসিজম বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার মুসলিমকে তাদের সাথে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছে। তাদের নিষ্ঠুরতাও অনেককে বিমোহিত করেছে। তবে, আইসিস এর মূল আকর্ষণ ছিল তাদের প্রতিষ্ঠা করা খেলাফত। আল কায়েদা থেকে তাদের কার্যক্রম একটু ভিন্ন। আল কায়েদা শুধু মানুষ হত্যা ও সন্ত্রাসী আচরণের কারণে খবরের কাগজের শিরোনাম হতো। মানুষ তাদের চেনে নরঘাতক হিসেবে। অপরদিকে আইসিস মানুষ হত্যার পাশাপাশি এলাকা দখলেও মনোযোগী ।

ইন্টারনেটের যুগের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি জায়গা দখল করার চেষ্টা করে তারা, তা হলো মনস্তত্ত্ব। ইন্টারনেটের সুবিধাকে তারা পুরোপুরি কাজে লাগাতে থাকে। স্যোসাল মিডিয়ায় নিয়মিত তাদের নিষ্ঠুর কার্যক্রমের ভিডিও প্রচার করতে থাকে। নিষ্ঠুরতার এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করে দিয়েছে তারা। ২০১৫ সালে জনসংযোগের দিক দিয়ে তারা অনেক সরকারকেও পেছনে ফেলে দেয়। জিহাদিদের ব্যবহার করে ঘটানো ভয়ংকর

নিষ্ঠুর কার্যক্রম তারা প্রচার করতে থাকে অনলাইনে। যৌনতা আর সহিংসতার প্রতি আধুনিক প্রজন্মের তীব্র আকর্ষণ থেকে আইসিস পরিণত হয় তরুণ জিহাদি প্রজন্মের আইকনে। নতুন প্রজন্মকে এইসব তরুণ জিদাহিদের ইংরেজিতে অনেকেই "Generation Jackass Jihadis" বলে ডাকে। এই মারাত্মক সহিংস খেলাতে এরা হলো সবচেয়ে প্রথম সারিতে।

২০১৫ সালের গ্রীষ্ম আসতে আসতে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের আরবরা আইএসকে "দায়েশ" নামে ডাকা শুরু করে। এমনকি আঞ্চলিক মিডিয়াগুলোও এই নামে সম্বোধন করতে থাকে। সংগঠনটির প্রতি এই অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ফুটে ওঠে এই নামের মধ্যে দিয়ে। এই দায়েশ নামটা এসেছে সংগঠনটির শুরুর দিকের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে। কার্যক্রম শুরু করার সময় তাদের নাম প্রথমে ছিল "দৌলত আল ইসলামিয়া ইরাক ওয়া আল শামস"। এই নামের সংক্ষিপ রূপ দায়েশ-কে আইএস সদস্যরা প্রচণ্ডরকম অপছন্দ করে। আর এ্রকারণেই মানুষ তাদেরকে এই নামে ডাকতে শুরু করেছে। দায়েশ শব্দের সমোচ্চারিত একটি আরবি ক্রিয়াপদ আছে "দায়েস" (যে ব্যক্তি কপটতা করে এবং ভিন্নমতের মুখ বন্ধ করে দেয়)। এর সাথে অন্তঃমিল আছে আরেকটি আরবি শব্দ ফায়েশ-এর (পাপী)। তবে এই গোষ্ঠীকে যারা ঘৃণা করে তাদের পছন্দ অন্য একটি আরবি শব্দ, জাহেশ (বোকা পাঁঠা)। এরকম অন্ত্যমিলের শব্দ ব্যবহার করে টিটকারি করাকে আরবি সংস্কৃতিতে সাংঘাতিক অপমানজনক বিবেচনা করা হয়। আর এভাবে তামাশা করতে থাকলে যেমন কাউকে অবমাননা করা যায়, তেমনি তার প্রতি ভীতিও কমে যায়।

২০১৫ সাল জুড়েই ইরাকের একাংশ জুড়ে যুদ্ধ চলছিল। তিকরিত শহর আইএস-এর হাতছাড়া হলেও তারা রামাদি শহর নিজেদের দখলে রাখে। যুক্তরাষ্ট্র আচমকা এক অদ্ভুৎ পরিস্থিতিতে পড়ে গেল। অ্যামেরিকার বিমান তখন ইরাকের আইএসের উপরে অল্পস্বল্প বোমা হামলা করছিল, পাশাপাশি চলছিল আকাশ থেকে পুরো এলাকা পর্যবেক্ষণ। ঠিক ওই সময়ে ইরানের রিপাব্লিকান গার্ড কমান্ডাররা তখন ইরাকে ঢুকে আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের এই বিমান হামলা মূলত ইরানের বাহিনীকে সহায়তাই করছিল।

ইরাকি সরকারি বাহিনী যেন মসুল এর নিয়ন্ত্রণ না নিতে পারে, তার জন্য তিকরিত দখলে রাখতে চাইছিল আইএস। কিন্তু রামাদি ছিল তাদের কাছে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সিরিয়ার সীমান্তবর্তী সুন্নি অধ্যুষিত আনবার প্রদেশে শহরটির অবস্থান। এই প্রদেশ নিজেদের হাতে রাখতে পারলে খেলাফত রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের দাবিও পোক্ত হয়।

২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ইরাক ও সিরিয়ার আইএস লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন বোমা হামলা শুরুর একবছর পূর্তি হয়। এই এক বছরে হাজারের ওপরে বিমান হামলা করা হয়েছে। অধিকাংশ বিমান হামলা হয়েছে পারস্য উপসাগরে মোতায়েন করা বিমানবাহী জাহাজ ইউএসএস জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ ও ইউএসএস কার্ল ভিনসন থেকে। এছাড়া কুয়েত এবং আরব আমিরাতের মার্কিন ঘাঁটি থেকেও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। আইএস এর লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর জন্য প্রথমবারের মত ব্যবহার করা হয়েছে এফ-২২ র‍্যাপ্টর স্টিলথ জেট ফাইটার। এই বিমানটিকে এর আগে কোনো প্রত্যক্ষ মিশনে ব্যবহার করা হয়নি। মূলত মার্কিন পাইলটরাই বিমান নিয়ে গেছেন সেখানে। কিন্তু মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের উপস্থিতি না থাকায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো ছিল খুবই মুশকিলের কাজ। লক্ষ্যবস্তুগুলোর বেশিরভাগই ছিল শহরাঞ্চলে। সমন্বয়হীনতার কারণে অনেকক্ষেত্রে আঘাত না হেনেই ফিরে যায় বিমানগুলো।

২০১৫ সালের গ্রীষ্মের শেষদিকে নিয়মিতভাবে দখল হারাতে থাকে আইএস। ২০১৫ সালের শেষ দিকে কুর্দি যোদ্ধারা সিরিয়ার কোবানে শহর পুনরায় দখল করে নেয়। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে গুরুত্বপূর্ন ইরাকি শহর রামাদি আবার চলে যায় ইরাকি সরকারি বাহিনীর দখলে। সেই সাথে আইএস-এর ওপর চলতে থাকে প্রচণ্ড বিমান হামলা।

রাশিয়ানরাও যুক্ত ছিল এসবের মধ্যে। আগের তুলনায় তাদের তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। মিশরে রাশিয়ান যাত্রীবাহী বিমানে আইএস-এর হামলার অজুহাত দেখিয়ে রাশিয়া সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী "ফ্রি সিরিয়ান আর্মি" এবং "আইএস"- উভয় গোষ্ঠীর ওপরই হামলা শুরু করে। ২০১৫ সালে নভেম্বরে প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার জবাবে ফ্রান্সও আইএস-এর লক্ষ্যবস্তুতে

বিমান হামলা চালানো শুরু করে। এমনকি তারা এই ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের কাছেও সাহায্য চেয়ে বসে। আর ইরাকে চলতে থাকা তাদের বিমান হামলাকে সিরিয়া পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়ে বিল পাশ হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।

বিভিন্ন পক্ষের এই তীব্র আক্রমণের ফলে আইএস এর খেলাফত ক্রমেই ছোট হতে থাকে, মারা যায় তাদের বেশকিছু নেতা এবং সম্মুখযোদ্ধা। তবে, সে সময় তারা লিবিয়ায় আরেকটি ঘাঁটি তৈরি করতে থাকে। সেখানে গিয়ে জড়ো হয় শত শত যোদ্ধা। ইরাক ও সিরিয়া থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলে, লিবিয়ায় নতুন করে শুরু করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ২০১৬ সালের বসন্ত আসতে আসতে এই সুদীর্ঘ চলমান যুদ্ধের অন্যতম রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে লিবিয়া।

রাশিয়ান, ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসি এবং অন্যান্যদের এই ব্যাপক উপস্থিতির কারণে ড্রোন মিশন এই এলাকায় খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। হাজার হাজার ড্রোন পাঠানো হচ্ছে। কিছু কিছু তো পাঠানো হচ্ছে একেবারে মার্কিন ভূখণ্ড থেকেই। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে শক্তিশালী আঘাত হানার জন্য আজকাল ড্রোন ব্যবহার করা হয়। ২০১৫/১৬ সালে আইএস-এর কাছ থেকে ইরাকের হাজার হাজার স্কয়ার মাইল ভূমি দখল করার কাজে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে এই ড্রোন।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভৌগোলিক বাধা ডিঙানোর একটা স্পষ্ট ও চমৎকার উদাহরণ এই ড্রোন। আবার, ড্রোনকে ভূগোলের গুরুত্ব বুঝানোর উপায় হিসেবেও দেখা যায়। বিশ্বজুড়ে অন্তত ১০টা ঘাঁটিতে ড্রোন বহর মজুদ করেছে মার্কিনিরা। এর ফলে একজন অপারেটর নেভাদার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে জয়স্টিক ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে, যে দেশটিতে ড্রোনের সদর দপ্তর স্থাপিত হচ্ছে, সেই দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেও বাধ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যেমন- নেভাদা থেকে পাঠানো সিগনাল হয়তো সাগরের নিচে পাতা সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে জার্মানিতে পৌঁছাচ্ছে; এর পরে যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই সিগনাল সম্প্রচার হচ্ছে, তা হয়তো তৃতীয় আরেকটি দেশের, যাদের কাছ থেকে পেন্টাগন ব্যান্ডউইথ কিনেছে। এটাই হচ্ছে মার্কিন শক্তিমত্তার কাল্পনিক ম্যাপ। বর্তমান সময়ের ভূ-রাজনীতি বুঝতে চাইলে এই ম্যাপ সম্পর্কেও জানতে হবে।

আলোর দিকে ছুটে যাওয়া পতঙ্গের মতো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জিহাদি যোদ্ধা হওয়ার বাসনায় ছুটে এসেছে সুন্নি মুসলিমরা। কুর্দি, সুন্নি আর শিয়াদের মধ্যে বিভেদকে খুব চাতুর্যের সাথে ব্যবহার করেছে আইএস। সুন্নি আরবদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত করা এবং পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। সেই সাথে তারা এমন এক খেলাফতের স্বপ্ন দেখিয়েছে যেখানে সকল সহিহ মুসলিম (সুন্নি মুসলিম) একজন যোগ্য শাসকের নেতৃত্বে বসবাস করবে। কিন্তু, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা যে চরমপন্থা অবলম্বন করেছে তাতেই বুঝা গেছে তাদের এসব ইউটোপিয়ান পরিকল্পনা কেন সফল হচ্ছে না। এই স্বপ্ন যে বাস্তবায়নের অযোগ্য তা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ, প্রথমত শুধু ইরাকে বসবাসরত সুন্নিদের কিছু গোত্র তাদের এই জিহাদি মতবাদকে সমর্থন দিচ্ছে। তাও সমর্থন দিচ্ছে শুধু নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে, ষষ্ঠ শতকে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাদেরও নেই। তাদের উদ্দেশ্য মিটে গেলে তারাই এই জিহাদিদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাছাড়া কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের কী পরিণতি হয়, তাও এতদিনে সবার জানা হয়ে গেছে। সবার এও জানা হয়ে গেছে যে সুন্নি মুসলিম না হওয়ার অর্থ মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং ইরাকের খ্রিস্টান, ক্যালডিয়ান, ইয়াজিদিসহ অন্যান্য অ-সুন্নি জাতিগোষ্ঠী তাদের বিপক্ষেই থাকবে সব সময়। মুসলিম বিশ্বের অন্য দেশগুলো থেকেও তারা সমর্থন পাচ্ছে না।

এতে করে ইরাকের জনগণের মধ্যে যারা সুন্নি, কিন্তু জিহাদি নয়, তারা পড়ে গেছে বিপদে। ইরাক যদি ফেডারেল শাসিত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তারা পড়ে যাবে একদম মাঝখানে। সুন্নি ত্রিভূজ নামে পরিচিত ধূলিপূর্ণ এক এলাকায় আটকে যাবে তারা। এর পূর্বদিকে থাকবে বাগদাদ, পশ্চিমে রামাদি আর উত্তরে তিকরিত। এই অঞ্চলের সুন্নিদের সাথে সিরিয়ার আদিবাসীদের মিল বেশি। নিজেদের দেশের উত্তরের কুর্দি আর দক্ষিণের শিয়াদের সাথে তাদের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত কোনো মিল নেই।

এই অঞ্চলে শুধু সুন্নিদের টিকিয়ে রাখার মতো যথেষ্ট মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামো নেই। ইরাক দেশটি তেলসম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু এই তেলক্ষেত্রগুলোর অধিকাংশই শিয়া এবং কুর্দিদের এলাকায়। ইরাকে যদি জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে

একতা না থাকে, তাহলে তেল থেকে অর্জিত অর্থের সুষম বন্টন হবে না। তেল যে অঞ্চলের, শুধু সেখানকার অধিবাসীরাই সুফল ভোগ করবে। কুর্দিদের ভূমিতে সুন্নিরা সুবিধা করতে পারবে না। বাগদাদের দক্ষিণের শহরগুলো, যেমন নাজাফ এবং কারবালাতে শিয়াদের সংখ্যা অনেক বেশি। বসরা এবং উম কাসর বন্দর সুন্নি এলাকা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। যে সুন্নিদের হাতে একসময় দেশের শাসনভার ছিল, তারা এখন নিজেদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই খাবি খাচ্ছে। এমন কী তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথাও ভাবছে। কিন্তু সে ভাবনা হালে পানি পাচ্ছে না। কারণ, আলাদা হয়ে গেলে সম্পদ বলতে তেমন কিছুই তাদের হাতে থাকবে না।

বিভক্ত হয়ে গেলে ভৌগোলিক কারণে শিয়ারাই বেশি সুবিধা পাবে। শিয়ারা এমন সব এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে আছে, যেখানে রয়েছে তেলক্ষেত্র। এছাড়াও তাদের এলাকায় আছে ৩৫ মাইলব্যাপী উপকূল রেখা, শাত ইল আরব পানিপথ, বন্দর এবং বাইরের পৃথিবীর সাথে সংযোগের সুবিধা। পাশাপাশি আছে পার্শ্ববর্তী শিয়াপ্রধান দেশ ইরানের সাথে অর্থনৈতিক এবং সামরিক মৈত্রী।

জিহাদিরা স্বপ্ন দেখে সালাফি ইসলামের মাধ্যমে সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করার। তবে তার আগে তারা মধ্যপ্রাচ্যে খেলাফত কায়েম করতে চায়। ইরাকের মসুল থেকে শুরু করে লেবাননের বৈরুত, জর্দানের আম্মান হয়ে তারা নিয়ন্ত্রণ পেতে চায় ইসরায়েলের জেরুজালেম পর্যন্ত। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অত সহজ নয়। পুরো আরব বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি ইসলামিক স্টেটের নেই। আর তাদের সামর্থ্যের ওপরই তাদের খিলাফতের আয়তন নির্ভর করছে।

কিন্তু তাদের এই লক্ষ্য বা স্বপ্ন যাই বলা হোক, মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এটা বড় একটা সমস্যাই। ইউরোপে ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত চলমান "ত্রিশ বছরের যুদ্ধ"কে এর সাথে তুলনা করা যায়। ধর্মীয় কারণে তৈরি হওয়া এই যুদ্ধে ইউরোপের প্রায় ৬০ লাখ লোক মারা যায়। আইসিসদের তৈরি এই সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি পুরো পৃথিবীতেই প্রভাব ফেলবে। আন্তর্জাতিক অনেক জিহাদিই একসময় ফিরে যাবে তাদের নিজের দেশে। কেউ ফিরবে

ইউরোপে, কেউ উত্তর অ্যামেরিকায়, কেউ ককেশাস অঞ্চলে, কেউ ফিরবে ইন্দোনেশিয়া বা বাংলাদেশে। আর ফিরে গিয়ে শান্তির ঘর-গেরস্তি করার সম্ভাবনা খুবই কম। লন্ডনের গোয়েন্দা সংস্থার মতে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যত ব্রিটিশ মুসলিম আছে, তার চাইতে বেশি আছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জিহাদি গ্রুপে। ইসলামপন্থীরা বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই তাদের মৌলবাদিকরণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সে তুলনায় ইউরোপের দেশগুলোতে মৌলবাদ-বিরোধী কার্যক্রম শুরু হয়েছে একেবারেই সাম্প্রতিক সময়ে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা এই ইসলামি চরমপন্থা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশকেই ভুগতে হচ্ছে। একেক দেশে সমস্যার রূপ একেকরকম। সৌদি আরবকে এমন ভুগতে হয়েছিল আল কায়েদাকে নিয়ে। কয়েক দশকের প্রচেষ্টায় তাদেরকে এলাকাছাড়া করার পরে এখন আবার সামলাতে হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জিহাদিদের। দক্ষিণে তাদের সমস্যা আবার অন্যরকম। এই এলাকায় তাদের সীমানা ইয়েমেনের সাথে। ইয়েমেন সহিংসতা আর সন্ত্রাসী কার্যক্রমে পরিপূর্ণ একটি দেশ। বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জিহাদিরা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে রেখেছে।

জর্দানেও মাথাচাড়া দিয়েছে ইসলামপন্থী আন্দোলন। বিশেষ করে জর্দানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জার্কা শহরের কথা বলতেই হয়। শহরটি সিরিয়া ও ইরাকি সীমান্তঘেঁষা। এই অঞ্চলে আল কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট সমর্থিত হাজার হাজার জঙ্গির বাস। জার্কার প্রশাসন তাদের ভয়ে ভীত। ইরাক আর সিরিয়ার সীমান্ত ডিঙিয়ে যে কোনো সময় জর্দানের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে তারা। ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জর্দানের সামরিক বাহিনীকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর একটি বলে ধরা হয়। কিন্তু স্থানীয় ইসলামপন্থীদের সাথে বাইরের যোদ্ধারা যোগ দিয়ে গেরিলা কার্যক্রম শুরু করলে তা সামলানো কঠিন হয়ে যাবে জর্দানের সামরিক বাহিনীর পক্ষে। ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভুত নাগরিকেরা জর্দানকে রক্ষা করতে অসম্মতি জানালে এই দেশটির ভাগ্যও সিরিয়ার মতো হতে পারে। হাশেমি শাসকগোষ্ঠী এবং ইসরায়েল, কেউই এটা চায় না।

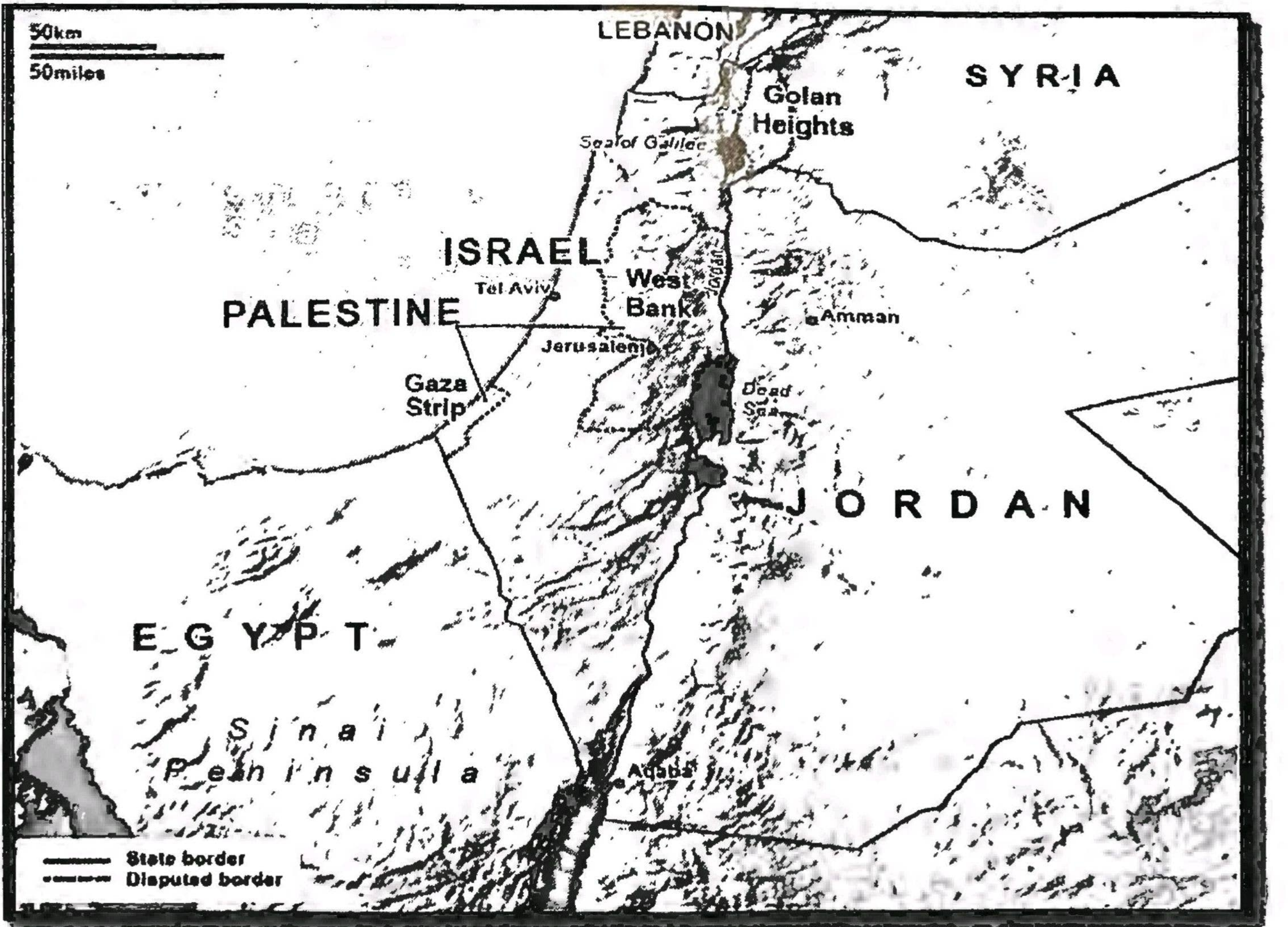
মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্যমান এই সমস্যাগুলোর কারণে সারা বিশ্বের মনোযোগ ইসরায়েল-আরব দ্বন্দ্ব থেকে অনেকটাই সরে গেছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব মাঝেমধ্যেই প্রবলভাবে ফিরে আসে। ইসরায়েলের অস্তিত্বই আরব বিশ্বের সব সমস্যার মূল, এই দাবি একদমই অহেতুক। বিশ্লেষকরা মোটামুটি একমত হয়েছেন এই বিষয়ে। আরব বিশ্বের নিজস্ব আরো অনেক ইসরায়েল রকম সমস্যা আছে তাদের নিজেদের মধ্যেই। ইসরায়েল ইস্যু নিয়ে শোরগোল তুলে নিজেদের সমস্যা আর অদক্ষতাগুলো ঢাকতে চান আরবের নেতারা। ইসরায়েলকে সামনে দেখিয়ে তারা চালিয়ে যান স্বৈরশাসন, দমন এবং নিপীড়ন। জনগণ যেমন ইসরায়েলকে একমাত্র শত্রু হিসেবে বিশ্বাস করেছে, তেমনি তাদের পছন্দের পশ্চিমা বিশ্লেষকরাও এই প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থেকেছেন। যদিও, ছোট্ট এই ভূখণ্ড নিয়ে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে নির্মম সহিংসতা চলছে তো চলছেই। এতটুকু একটা জায়গা নিয়ে এত সংঘর্ষ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

জর্দান নদীর পশ্চিম থেকে ভূমধ্যসাগর উপকূল পর্যন্ত অঞ্চলটাকে সিরিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করত অটোমানরা। তারা এর নাম দিয়েছিল ফিলিস্তিনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে এই জায়গাটা "প্যালেস্টাইন" বা ফিলিস্তিন নামে আত্মপ্রকাশ করে। ইহুদিরা একসময় ইসরায়েলে থাকত। এই অঞ্চলে তারা ছিল হাজার বছর ধরে। কালের পরিক্রমায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় তারা। ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরলেও সেই প্রাচীন ইসরায়েল তাদের কাছে ঈশ্বরের "প্রতিশ্রুত ভূমি" হিসেবেই থেকে যায়। বিশেষ করে জেরুজালেম তাদের পবিত্র ভূমি। ১৯৪৮ সালের পূর্ববর্তী এক হাজার বছরে আরব মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীতে প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট ঘোষিত হওয়ার পর ইহুদিরা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফেরার আন্দোলন শুরু করে। এই অঞ্চলে তখন অল্প কিছু ইহুদি বসবাস করছিল। দিন দিন এই আন্দোলন বেগবান হয়। পূর্ব ইউরোপে ইহুদি-বিতাড়ন কার্যক্রম বা "Pogrom" শুরু হওয়ার পরে ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিন অঞ্চলে চলে আসতে থাকে। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলে ইহুদিভূমি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল। আরবদের কাছ থেকে জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ইহুদিদের উৎসাহিত করছিল তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ইহুদি হত্যাযজ্ঞের পর প্যালেস্টাইনে ফেরার স্রোতে শামিল হয় দুনিয়ার সব ইহুদি। ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যে শুরু হয় ঘোরতর সংকট। ব্রিটেন তখন এই সমস্যা সমাধানের ভার তুলে দেয় সদ্যগঠিত

জাতিসংঘের হাতে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত ভোটের মাধ্যমে অঞ্চলটিকে দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। ইহুদিরা এই বিভাজন মেনে নেয়, কিন্তু আরবরা সোজা 'না' করে দেয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফিলিস্তিনিরা শরনার্থী হয়ে এলাকা ছাড়তে থাকে। আর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি শরণার্থী আসতে থাকে ইসরায়েলে।

সেই সময় পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীর অঞ্চল দখল করে নেয় জর্দান। মিশর গাজা অধিগ্রহণ করে। গাজাকে তারা তাদের সম্প্রসারিত অঞ্চল বলে দাবি করতে থাকে। কিন্তু এসব এলাকায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের নাগরিকত্ব বা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। এমনকি এ দুই দেশের স্থানীয় অধিবাসীরাও কখনো প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কোনো আন্দোলনে নামেনি। এদিকে সিরিয়া এই গোটা অঞ্চলকেই সিরিয়ার অংশ হিসেবে দাবি করতে লাগল। সেখানকার অধিবাসীদেরও তারা সিরিয়ান বলেই অভিহিত করল।



চিত্র- ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিম তীর, গাজা এবং গোলান মালভূমি নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে দেশগুলোর মধ্যে।

এখন পর্যন্ত প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে মিশর, সিরিয়া এবং জর্দান। প্যালেস্টাইন যদি কখনো ইসরায়েলের দখলমুক্ত হয়েও যায়, তাতেও এই ভূখণ্ড নিয়ে বিবাদ বন্ধ হবে না। এই তিনটি দেশ তখন বিভিন্ন অংশে তাদের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসবে। তবে বর্তমান শতকে এসে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে জাতিবোধ এবং একতার অনুভূতি প্রবল। আরব শাসকরা যদি তাদের ভূখণ্ড থেকে কোনো অংশ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তারা প্রবলভাবে রুখে দাঁড়াবে। বিংশ শতাব্দী থেকে আরবের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফিলিস্তিনিরা। এই দেশগুলোর স্বভাব ও আচরণ সম্পর্কেও ভালোভাবেই জানা আছে তাদের। ফিলিস্তিনিদের কোনোরকম নাগরিক সুবিধা দিতে নারাজ এই দেশগুলো; তাদেরকে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বাস্তু হিসেবেই দেখতে চায় এরা। ফিলিস্তিনিরা যেন কোনোভাবেই দেশের মূলধারায় আসতে না পারে, সে ব্যাপারে আরব দেশগুলো খুবই সচেষ্ট।

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় জেরুজালেম, পশ্চিম তীর এবং গাজার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ইসরায়েল। ২০05 সালে তারা গাজা ছেড়ে গেলেও পশ্চিম তীরে হাজার হাজার বসতি স্থাপনকারী থেকে যায়। জেরুজালেমকে ইসরায়েল সবসময়ই তাদের রাজধানী হিসেবে জেনে এসেছে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এখানেই একটা পাথরের ওপরে আব্রাহাম আইজাককে কোরবানি দিতে যান। আর সেই পাথরের ওপরেই নাকি স্থাপিত হয়েছিল রাজা সলোমনের মন্দির, যা পবিত্রের মধ্যেও পবিত্রতম। আবার মুসলিমদের জন্যও জেরুজালেমের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের ধর্মে এটি তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। কারণ, তাদের ভাষ্যমতে মহানবী হযরত মোহাম্মদ(সা.) এখান থেকেই মিরাজে গমন করেন। কথিত আছে, তিনি আব্রাহামের সেই পাথরের ওপর থেকেই রওনা দেন। সেই পাথরকে ভিত্তি করেই স্থাপিত হয়েছে ডোম অব রক, যাকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে আল আকসা মসজিদ। সামরিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে জেরুজালেমের ভৌগোলিক গুরুত্ব মাঝামাঝি পর্যায়ে। এখানে তেমন শিল্পাঞ্চল নেই। নদী বা বিমানবন্দরও নেই এখানে। কিন্তু সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দিক বিবেচনা করলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইহুদি এবং মুসলিমরা ধর্মীয় আদর্শগত কারণেই এই অঞ্চল নিয়ে যুদ্ধ করে চলেছে। এই যুদ্ধ চলমান থাকবে।

জেরুজালেমের প্রতি অধিকার কেউ এত সহজে ছাড়তে চাইবে না। এর সমাধান অতি জটিল।

এর চেয়ে গাজার অধিকার ছেড়ে দেওয়াটাই ইসরায়লের পক্ষে সহজ ছিল (যদিও তার জন্যও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে)। গাজা থেকে ইসরায়েলি সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার পরে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনে আসলে কতটা উন্নয়ন ঘটেছে, সে প্রশ্ন অবশ্য রয়েই যায়। প্যালেস্টাইনের দখলে থাকা দুইটি অঞ্চলের মধ্যে গাজা সবচেয়ে পিছিয়ে। এই জায়গাটি দৈর্ঘে মাত্র ২৫ মাইল, আর প্রস্থে ৭.৫ মাইল। এই ছোট্ট জায়গায় ১৮ লাখ মানুষের বাস। গাজা একটি দুর্ভাগা এবং ভয়াবহ দরিদ্র নগর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে গাজা তিনদিক দিয়ে ইসরায়েল ও মিশরের নিরাপত্তা বলয়ে বন্দি। আর পশ্চিমে আছে সমুদ্র। ইসরায়েল সীমান্তের কাছাকাছি কোনোকিছু নির্মাণ করার অনুমতি নেই। গাজা থেকে ইসরায়েলে রকেট নিক্ষেপের সুযোগ কমাতেই এই নিষেধাজ্ঞা। এই অঞ্চলে দুই পক্ষের মধ্যে অসম লড়াই চলছে। গাজা থেকে রকেট ছোড়া হচ্ছে, আর ইসরায়েল তাদের রকেটকে ঠেকাতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করছে। অতি সম্প্রতি গাজা থেকে ছোঁড়া কয়েকশ রকেটের জবাব হিসেবে প্যালেস্টাইনে সর্বাত্মক হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল।

গাজায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে এটি বেশ উপযুক্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে জায়গাটি দুঃস্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছু। যুদ্ধ শুরু হলে কোথাও আশ্রয় নেওয়ার জায়গা থাকে না। পশ্চিম তীরে তারা যেতে পারে না। অথচ এই দুই এলাকার মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব মাত্র ২৫ মাইল। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হলে গাজার অধিবাসীদের কোথাও যাবার উপায় নেই। নিজেদের উন্নয়নেও তাদের করার মতো কিছু নেই।

পশ্চিম তীর গাজার চেয়ে আয়তনে প্রায় সাতগুণ বড়। কিন্তু এই অঞ্চলটির চারদিক ভূমিবেষ্টিত। এর বড় একটা অংশ পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলটা উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। এখানে কর্তৃত্ব করা মানে পশ্চিমের উপত্যকা, উপকূলীয় সমভূমি এবং জর্দান উপত্যকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। ধার্মিক ইহুদিদের মতে এই অঞ্চলটায় শুধু তাদেরই অধিকারে আছে। তারা বাইবেলকে

উদ্ধৃত করে বলে- জুদিয়া এবং সামারিয়াতে শুধু তাদেরই বসবাস থাকবে। সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেও এই জায়গাটা ইসরায়েলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তারা কোনো অ-ইহুদি সামরিক বাহিনীকে ঢুকতে দেবে না। কারণ, ইসরায়েলের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ এই অঞ্চলের উপকূলীয় সমভূমিতে বাস করে। এই পার্বত্য অঞ্চল দখল করে ভারী গোলা নিক্ষেপ করা হলে তারা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই সমতলে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো আছে। আরো আছে সফল হাইটেক কোম্পানিগুলো, আছে ভারী শিল্পকারখানা এবং বিমানবন্দর।

এসব কারণে ইসরায়েল নিরাপত্তাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এসব কারণেই প্যালেস্টাইন যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেও, সামরিক স্বাধীনতা তারা পাবে না। এই পার্বত্য অঞ্চলে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনী রাখতে পারবে না তারা। জর্ডান সীমান্তের নিয়ন্ত্রণও ইসরায়েলকে নিজের হাতেই রাখতে হবে। এতসব সাবধানতা আর শর্ত দেওয়ার কারণ হলো, ইসরায়েল অতি ক্ষুদ্র একটা রাষ্ট্র। প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে গেলে পিছিয়ে আসার মত জায়গা দেশটির নেই। এই কারণে তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে শুধু নিজেদের রক্ষা করাটাই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। নিজেদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিখুঁত করাটাই চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত এই ছোট্ট দেশটির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পশ্চিম তীর থেকে তেল আবিবের ন্যূনতম দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল। পশ্চিম তীরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অতি সাধারণ একটি সেনাবাহিনীর পক্ষেও ইসরায়েলকে দুইভাগ করে দেওয়া সম্ভব। ফলে নিজের দেশের অস্তিত্বের প্রশ্নেই পশ্চিম তীরে তারা কাউকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেবে না।

বর্তমানে ইসরায়েলের নিরাপত্তা প্রায়ই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এই দেশের সাধারণ নাগরিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে, আশপাশের দেশগুলো থেকে নিয়মিতভাবে চলছে রকেট হামলা। তবে এর কারণে যে তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে, এমন না। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মিশরকে হুমকি বলা যায় না। দুই পক্ষের মধ্যে উভয়ের জন্য সুবিধাজনক একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সিনাই উপদ্বীপ থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের চুক্তি হয়েছে। দুই পক্ষের

একটা বাফার অঞ্চল হিসেবে কাজ করছে এই উপদ্বীপ। সিনাই-এর পূর্ব দিকে লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষা জর্দানের শহর আকাবা। এই অঞ্চলের মরুভূমি যেমন ইসরায়েলকে রক্ষা করে চলেছে, তেমনি আম্মানের সাথে শান্তিচুক্তিও আছে। ফলে সেদিক থেকে চিন্তা নেই। উত্তরে লেবানন থেকে কিছুটা হুমকি অবশ্য আছে। তবে সেটা অত বড় কিছু না। এমনিতে সাধারণত টুকটাক সীমান্ত-সংঘর্ষ আর হালকা গোলা ছোঁড়াছুড়িই হয়ে থাকে। আর হিজবুল্লাহ যদি ইসরায়েলের অভ্যন্তরে দূরপাল্লার রকেট ছোঁড়ে, তখন ইসরায়েল ব্যাপকভাবে তার জবাব দেয়।

লেবাননের চাইতে প্রতিবেশী সিরিয়া থেকেই বরং হুমকিটা বেশি। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে দামেস্ক সবসময় উপকূলের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ চেয়ে এসেছে। সিরিয়া লেবাননকে তাদের অংশ বলেই মনে করে (আসলেই তো তা ছিল)। ২০০৫ সালে সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হওয়াকে তারা ভালোভাবে নেয়নি। উপকূলের এই পথটা বন্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে গোলান মালভূমি পার হয়ে গ্যালিলি সাগর অঞ্চলের পাহাড়ি পথ ধরে ভূমধ্যসাগরে যেতে হবে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে গোলান হাইটস অঞ্চলটি ইসরায়েল দখল করে নেয়। ইসরায়েলের উপকূলীয় অঞ্চল ভেদ করে ইসরায়েলের কেন্দ্রে পৌঁছতে চাইলে সিরিয়ান বাহিনীকে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ঘটাতে হবে। দূর ভবিষ্যতে হয়তো এমন ঘটতে পারে, কিন্তু খুব শীঘ্রই এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষ করে সিরিয়ান গৃহযুদ্ধ চলাকালীন তো একেবারেই অসম্ভব।

তাহলে বাকি রইলো শুধু ইরান। বিশেষ করে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে ইদানিং যেখানে ইরান প্রশ্নের মুখোমুখি, তাদের ব্যাপারটা অবশ্যই খতিয়ে দেখার মতো।

অ-আরবীয়, ফার্সি ভাষাভাষী প্রধান বিশাল এক রাষ্ট্র ইরান। জার্মানি, ফ্রান্স আর যুক্তরাজ্যকে একত্র করলে যত বড় হয়, ইরান তার চেয়েও বড়। কিন্তু এই তিনটি দেশের সম্মিলিত জনসংখ্যা যেখানে ২০ কোটি, সেখানে ইরানের জনসংখ্যা মাত্র ৭.৮ কোটি। ইরানের বেশিরভাগ মানুষ থাকে পার্বত্য অঞ্চলে। এই দেশের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আছে মরুভূমি এবং লবণাক্ত ভূমি। এসব

অঞ্চল মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়। এসব এলাকা বসবাসের জন্য কতটা প্রতিকূল তা বুঝতে চাইলে এই পথ দিয়ে একবার গাড়ি চালিয়ে গেলেই হবে। এসব জায়গায় বসবাসের সংগ্রাম করা খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

ইরানে দুইটি বিশাল পর্বতশ্রেণী আছে, জাগ্রোস এবং এলবুর্জ। জাগ্রোস পর্বতমালা উত্তর দিক থেকে শুরু হয়ে তুরস্ক এবং ইরাক সীমান্ত ধরে ৯০০ মাইল চলে গেছে। পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালি পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বতমালা। জাগ্রোসের দক্ষিণাঞ্চল থেকে পশ্চিমের দিকে একটা সমভূমি চলে গেছে। আর এই সমভূমিতেই ইরাক ও ইরানকে বিচ্ছিন্ন করেছে শাত-ইল-আরব। এই অঞ্চলেই ইরানের মূল তেলক্ষেত্রগুলোর অবস্থান। অন্য তেলক্ষেত্রগুলো রয়েছে উত্তরের দিকে এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে। সবগুলো একত্র করলে তা হবে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডার। এতকিছু থাকা সত্ত্বেও অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পিছিয়ে পড়ছে ইরান। এছাড়াও তাদের ওপর রয়েছে নানারকম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। ফলে তারা কল-কারখানাকে আধুনিকীকরণ করতে পারছে না।

এলবুর্জ পর্বতমালার শুরুও উত্তর দিক থেকেই। তবে এর সীমানা আর্মেনিয়ার সাথে। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরের পুরোটা জুড়ে আছে এই পর্বতমালা। তারপরে তুর্কমেনিস্তান হয়ে ঢুকে গেছে আফগানিস্তানে। এই পর্বতশ্রেণিটা রাজধানী তেহরান থেকেও দেখা যায়। শহরের উত্তরদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে অতি নয়নাভিরাম। এখানে বছরের কয়েক মাস ধরে চমৎকার স্কি করা যায়। কিন্তু এই অঞ্চলের গোপনীয়তা পরমাণু প্রকল্পের চাইতেও কঠিনভাবে রক্ষা করা হয়।

ইরান ভৌগোলিকভাবে অনেক সুবিধা পেয়েছে। এর তিনপাশে পর্বত আর, অন্যপাশে রয়েছে জলাভূমি অঞ্চল এবং পানি। ১২১৯-২১ সালে মঙ্গোলরা সর্বশেষ এই এলাকা ভেদ করে প্রবেশ করতে পেরেছিল। এরপর যারাই সামনে এগিয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে মাথা ঠুকে ধূলিধূসরিত এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরে গেছে। ২০০৩ সালে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধেও এমনটা ঘটেছে। পৃথিবীর সেরা সামরিক শক্তিসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ দিক দিয়ে ইরাকে ঢোকার পরে ডানে

মোড় না নিয়ে অন্যদিকে যেতে বাধ্য হয়। ঐসময় ইউএস আর্মিতে একটা কথা প্রচলিত ছিল, "আমরা মরুভূমিতে যুদ্ধ করি, পর্বতে না"।

১৯৮০ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরুর পর ইরাক শাত-ইল-আরব ধরে ছয় ডিভিশন সেনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা ইরানের খুজেস্তান প্রদেশ অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল। সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। জাগ্রোসের পাদদেশে পৌঁছানো তো দূরে থাক জলাভূমি অঞ্চলই অতিক্রম করতে পারেনি তারা। যুদ্ধটা চলেছিল ৮ বছর ধরে। মারা গিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ।

পর্বত-অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ার কারণে ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ কম। ফলে সংযুক্ত অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারেনি। আর পারস্পরিক যোগাযোগ না থাকার কারণে তৈরি হয়েছে একদম ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বেশকিছু নৃগোষ্ঠী। যেমন খুজেস্তানে আরব সংখ্যাগরিষ্ঠরা ছাড়াও আছে কুর্দি, আজেরি, তুর্কমেন ও জর্জিয়ানসহ বেশকিছু জাতিগোষ্ঠী। ইরানের প্রধান ভাষা ফার্সি। ফার্সিভাষী পারসিকরাই ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। এই ভাষায় কথা বলে দেশটির ৬০ শতাংশ মানুষ।

বৈচিত্র্য সুন্দর। কিন্তু তা সংঘাতের সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে। এই কারণে ইরান সবসময় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে ছিল। ইরানের ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক অত্যন্ত ভীতি উদ্রেককারী একটি প্রতিষ্ঠান। নিষ্ঠুর কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পদ্ধতি বেছে নিয়েছে তারা। ইরান জানে, কেউ তাদেরকে আক্রমণ করতে আসবে না। আবার এও জানে, বাইরের দেশগুলো এখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোকে প্রভাবিত করে তাদের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। এতে ইরানের ইসলামি বিপ্লব হুমকির মুখে পড়বে।

পরমাণু শিল্পেও ইরান বেশ এগিয়ে গেছে। ইসরায়েলসহ অনেক দেশেরই বিশ্বাস, তারা গোপনে পরমাণু অস্ত্র বানাচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলে চলছে স্নায়ুযুদ্ধ। ইরানের কাছে পরমাণু অস্ত্র থাকার সম্ভাবনাকে ইসরায়েল নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। ইরান অস্ত্রেশস্ত্রে তাদের সমকক্ষ হয়ে যাবে বা একটা বোমা দিয়েই ইসরায়েলকে উড়িয়ে দেবে, তারা ঠিক এমনটা ভাবছে না। মূল বিষয়টি আরো জটিল। ইরান যদি পরমাণু অস্ত্র

বানিয়েই ফেলে, তাহলে বাকি আরব দেশগুলোর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হবে। তারাও পরমাণু অস্ত্র হাতে পাওয়ার চেষ্টা করবে। সৌদি আরবের কথা বলা যায় উদাহরণ হিসেবে। তারা মনে করে, আয়াতুল্লাহরা এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। তারা মনে করে ইরান এই অঞ্চলের সকল শিয়াকে একজোট করে ফেলতে চায়। তারা এটাও মনে করে যে, ইরান কোনো না কোনোভাবে পবিত্র নগরী মক্কা আর মদীনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পরমাণু ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে গেলে ইরান আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। আর এরকম হলে সৌদি আরব তখন হয়তো তার মিত্র দেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে পরমাণু অস্ত্র কিনতে চাইবে। এই অবস্থায় মিশর এবং তুরস্কও পরমাণু অস্ত্র কিনতে চাইতে পারে।

ইরানের পরমাণু গবেষণা প্রকল্পে সবসময়ই ইসরায়েলের বিমান হামলার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু চাইলেই আবার তারা এই আক্রমণ চালাতে পারে না। অনেক কিছু ভাবতে হয়। সরলরেখা ধরে গেলে ইসরায়েল থেকে ইরানের দূরত্ব অন্তত ১০০০ মাইল। এই পথের ওপর আবার পড়েছে দুইটি সার্বভৌম দেশ, জর্ডান এবং ইরাক। ইসরায়েল যদি ইরানকে হামলা করার পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে থাকে, তাহলে ইরাকের চোখ এড়াবে না। তারা অবশ্যই সতর্ক করবে ইরানকে। আর তাছাড়াও এত দীর্ঘ পথ আসা-যাওয়া করতে জ্বালানি ভরার প্রয়োজন হতে পারে। জ্বালানিবাহী বিমান ইসরায়েলের হাতে নেই, আর থাকলেও তাকে ঐ দুই সার্বভৌম দেশের আকাশসীমার মধ্য দিয়েই উড়তে হবে। আর সবশেষ কারণ হচ্ছে, ইরানের হাতে আছে ইস্কাপনের টেক্কা, হরমুজ প্রণালি। হরমুজ প্রণালি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথগুলোর একটি। প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে যত তেল পরিবহন করা হয় তার ২০ শতাংশই যায় এই প্রণালি দিয়ে। অত্যন্ত সংকীর্ণ এই প্রণালিটি যদি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুরো বিশ্ব এর ভুক্তভোগী হবে। তেলের দাম তখন আকাশ ছোঁবে। এই বিশাল ক্ষতি প্রথম বিশ্বের কোনো শিল্পোন্নত দেশই মেনে নিতে চাইবে না। আর এই কারণেই ইরানে হামলা না চালানোর ব্যাপারে ইসরায়েলকে চাপে রাখে বহির্বিশ্ব।

"যুক্তরাষ্ট্র ঘিরে ধরেছে"- এরকম একটা আতঙ্ক পুরো ২০০০-এর দশক জুড়ে পেয়ে বসেছিল ইরানকে। মার্কিন নেভি তখন ছিল গালফ অঞ্চলে, আর তাদের সেনাবাহিনী ছিল ইরাক ও আফগানিস্থানে। তবে তেমন কিছু তারা ঘটায়নি। আর এখন তো দুই দেশ থেকেই মার্কিনিরা তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে, সেই আশঙ্কা একদমই নেই। এই মুহূর্তে ইরান বেশ শক্তিশালী অবস্থানে আছে। শিয়া অধ্যুষিত ইরাক তাদের মিত্র। ইরাকের দক্ষিণে দামেস্কে আছে তাদের আলাওইত মিত্ররা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে লেবাননের শিয়া সামরিক দল হিজবুল্লাহও তাদের মিত্র।

প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের উৎপত্তিস্থল এবং কেন্দ্র ছিল এই ইরান। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৪০০ সালে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল মিশর থেকে ভারত পর্যন্ত। প্রাচীনকালের মতো এখন আর রাজত্ব বিস্তারের কথা ভাবে না ইরান। তারা বর্তমানে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে চায়। তাদের মূল লক্ষ্য হলো পশ্চিমের বিশাল সমতল ভূমি- আরব বিশ্ব এবং শিয়াপ্রধান এলাকা। সুন্নি অধ্যুষিত সৌদি আরবের চিন্তার কারণ এটাই। ইরান-সৌদি আরবের এই স্নায়ুযুদ্ধকে অ্যামেরিকা-রাশিয়ার শীতল যুদ্ধের সাথে তুলনা করা যায়। সৌদি আরব ইরানের চেয়ে আকারে অনেকখানি বড় এবং ইরানের চেয়ে অনেক ধনী। কিন্তু সৌদি আরবের জনসংখ্যা খুবই কম। ইরানের ৭.৮ কোটির বিপরীতে তাদের জনসংখ্যা মাত্র ২.৮ কোটি। সৌদি আরব তাদের সামরিক বাহিনী নিয়েও খুব একটা আত্মবিশ্বাসী না। শীতল যুদ্ধ যদি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের পারসিক প্রতিবেশীদের সাথে সংঘর্ষে কতটুকু পেরে উঠবে তা নিয়ে নিজেরাই সন্দিহান।

সৌদি আরব আর ইরান, দুই দেশই চায় মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ হতে। দুই দেশই নিজেদেরকে ইসলামের নিজস্ব ধারার ধারক ও বাহক মনে করে। সাদ্দাম হোসেনের আমলে সৌদি আরব আর ইরানের মধ্যে একটা শক্তিশালী বাফার জোন ছিল। সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতাচ্যূতির পর এই বাফার জোনটাও চলে যায়। এখন দুই দেশ উপসাগরের দুই পার থেকে একে অপরের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এবং একে অপরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জাতিসংঘের সাথে ইরানের পরমাণুবিষয়ক চুক্তির

মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৮ সালে। ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানভীতি রয়েই গেছে। এই চুক্তি চলাকালে এই বিষয়ে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া পশ্চিমা মিডিয়ায় নিয়মিত উঠে আসতো। পুরো আরব অঞ্চলের মিডিয়া ছিল এই চুক্তির ঘোরতর বিরোধী। কিছু কিছু পত্রিকায় তো এই চুক্তিকে ১৯৩৮ সালে নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত মিউনিখ চুক্তির অনুরূপ বলে প্রচার করে।

আর এই ভীতি থেকেই ২০১৬ সালে ঘটে এক নৃশংস ঘটনা। সুন্নিপ্রধান দেশ সৌদি আরব একদিনে ৪৭ জনের প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে, যাদের অন্যতম ছিলেন সে দেশের জ্যেষ্ঠ শিয়া নেতা নিমর আল-নিমর। এই ঘটনার মাধ্যমে সৌদি রাজ পরিবার যুক্তরাষ্ট্রসহ বাকি বিশ্বকে বুঝিয়ে দেয়, পরমাণুচুক্তি থাকুক বা না থাকুক, তারা ইরানকে যখন তখন দেখে নিতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে শিয়াপ্রধান দেশগুলোতে শুরু হয় প্রবল বিক্ষোভ। তেহরানে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসে ভাংচুরের পরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। আর গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চলতে থাকা শিয়া-সুন্নি গৃহযুদ্ধের পালে নতুন হাওয়া লাগে।

ইরানের পশ্চিমে আছে তুরস্ক; একইসাথে এশীয় এবং ইউরোপীয় পরিচয় নিয়ে চলা একটি দেশ। আরব রাষ্ট্রগুলোর সীমানাতে অবস্থিত হলেও তারা আরব নয়। তাদের ভূমির বেশিরভাগ অংশই মধ্যপ্রাচ্যের সীমানায়, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে চলমান দ্বন্দ্ব থেকে তারা সবসময় দূরে থাকার চেষ্টা করে। তুরস্ক নিজেকে ইউরোপীয় মনে করলেও তাদের প্রতিবেশী উত্তর আর উত্তর-পশ্চিমের ইউরোপীয় দেশগুলো তুরস্ককে কখনোই ইউরোপের অংশ মনে করেনি। তুরস্ককে যদি ইউরোপীয় দেশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ইউরোপের সীমানা আনাতোলিয়ান সমভূমি পার হয়ে যায়। তখন ইউরোপের সীমান্তবর্তী দেশ হবে ইরাক, সিরিয়া আর ইরান। এই বিষয়টি বেশিরভাগ মানুষই মেনে নিতে পারে না। প্রশ্ন হলো, তুরস্ক যদি ইউরোপের অংশ না হয়, তাহলে এটা কোথায়? তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল ২০১০ সালে ইউরোপের সেরা সাংস্কৃতিক শহর নির্বাচিত হয়েছিল। গানের প্রতিযোগিতা ইউরোভিশন এবং ফুটবল প্রতিযোগিতা ইউয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগেও তারা অংশ নেয়। ১৯৭০-এর দশকেই

তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল। অথচ, ইউরোপের সাথে এতভাবে সম্পৃক্ত এই দেশটির মাত্র পাঁচ শতাংশ ইউরোপ ভূখণ্ডে অবস্থিত! ভূগোল-বিশারদদের অধিকাংশই মনে করেন বসফরাস প্রণালির পশ্চিমে তুরস্কের যে অংশটুকু আছে, সেটুকু ইউরোপে। আর বসফরাসের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে থাকা দেশটির বাকি অংশ বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত।

তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য না করার পেছনে এটাও একটা কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে কুর্দিদের প্রতি তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণও আছে। তুরস্কের জনসংখ্যা ৭.৫ কোটি। তারা ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হলে তুরস্ক থেকে শ্রমিকেরা দলে দলে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেতে পারে। আরো একটা বড় কারণ আছে যার কথা প্রকাশ্যে বলা হয় না। তা হলো- তুরস্কের জনসংখ্যার ৯৮ ভাগই মুসলিম। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো ধর্মনিরপেক্ষ অথবা খ্রিস্টান সংগঠন নয়। তবে নির্দিষ্ট "মূল্যবোধ" নিয়ে একটা বিতর্ক আছেই। তাই যতবারই তুরস্কের সদস্যপদের পক্ষে প্রসঙ্গ উঠেছে, ততবারই এর বিপক্ষে নানা যুক্তি দেওয়া হয়েছে। বিগত দশকের প্রেক্ষাপটে তুরস্কের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কমে গেছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে তুরস্ক আসলে বিকল্প ভাবছে।

১৯২০ সালে মুস্তাফা কেমালের হাতে কোনো বিকল্প ছিল না। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জেনারেল হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির এই নজির নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীপক্ষ যখন তুরস্ককে টুকরো টুকরো করে দখল করে নিচ্ছিল, এরকম একটা সময় তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট হন। বিজয়ীপক্ষ তুরস্কের ওপর যে সব শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছিল তা প্রত্যাখ্যান করে একটা রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। আর সেখান থেকেই সামনে তুলে ধরা হয় মুস্তাফা কেমালকে। নিজের হাতে নতুন এবং আধুনিক তুরস্ক গড়ে তুলতে থাকেন তিনি। নতুন এই তুরস্ককে ইউরোপের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার

প্রয়াসও চালিয়ে গেছেন। তুরস্কে তিনি নিয়ে আসেন পশ্চিমা আইন-কানুন। প্রথমবারের মতো সেখানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করেন। তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মধ্যে আরো ছিল ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া, ফেজ টুপি নিষিদ্ধ করা, আরবি লিপির পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রবর্তন করা। তিনি তুরস্কের নারীদেরকে ভোটাধিকার দেওয়ারও দুই বছর পরে স্পেনের নারীরা ভোটাধিকার পায়, আর তুরস্কের ১৫ বছর পরে ভোটাধিকার পায় ফ্রান্সের নারীরা। ১৯৩৪ সালে তুর্কিরা নামের সাথে পারিবারিক পদবি ব্যবহারের আইনগত অধিকার পায়। সকল পরিবার নিজের মত করে পারিবারিক পদবি তৈরি করে নেয়। সে সময় কেমালকে দেওয়া হয় 'আতার্তুক' উপাধি। এর অর্থ হলো- তুর্কদের পিতা। বাংলা ভাষায় তিনি "মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক", এবং "মোস্তফা কামাল পাশা" দুই নামেই পরিচিত। ১৯৩৮ সালে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পরে নতুন যুগের নেতারা তার দেখানো পথেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন, গড়ে তুলতে থাকেন পশ্চিম ইউরোপের আদলে। আর যে নেতারা তা করতে চাননি, তারা শিকার হন সামরিক অভ্যুত্থানের। কামাল আতাতুর্কের স্বপ্ন ধুলিসাৎ হোক তা কখনোই চায়নি সে দেশের সামরিক বাহিনী।

কিন্তু এতকিছুর পরেও তুরস্ক ক্রমাগত ইউরোপের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হতেই থাকে। তখন তুরস্কে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। নতুন নেতারা ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে শুরু করেন। ১৯৮৯ সালে ক্ষমতায় আসেন এই ধারার রাজনীতিবিদ তারগুত ওজাল। ক্ষমতায় এসেই তিনি পালাবদলের হাওয়া বইয়ে দেন। তিনি প্রচার শুরু করেন সেই প্রাচীন মতবাদ- তুরস্ক হলো ইউরোপ, এশিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী এক মহান রাষ্ট্র। তিনি আশাবাদ দেখান, তুরস্ক আবার এই তিন অঞ্চলের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকারী একটি দেশে পরিণত হবে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানও একই মতাদর্শের অনুসারী। তাঁর উচ্চাশা অন্যদের চেয়েও বেশি। তবে এই লক্ষ্য পূরণ করতে তাকেও ওজালের মতোই প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর এই বাধাগুলো মূলত ভৌগোলিক।

আশেপাশের আরব দেশগুলো সন্দেহ করে যে এরদোয়ান অর্থনৈতিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের মতো বিশাল কিছু একটা গড়তে চাচ্ছেন আবারও। এই কারণে তারা তুরস্কের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক। ইরানের কাছেও তুরস্ক এই অঞ্চলের বৃহত্তম সামরিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইরানের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক কখনোই মধুর ছিল না। কিন্তু, সিরিয়ান গৃহযুদ্ধে আলাদা প্রতিপক্ষকে সমর্থন করার কারণে এই সম্পর্কে বর্তমানে আরো ভাটা পড়েছে। মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড সরকারকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছিল তুরস্ক। কিন্তু, মিশরের সেনাবাহিনী দ্বিতীয়বারের মতো অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করার পর এই নীতি অবলম্বনের সমস্যার দিকটা দেখতে পায় তুরস্ক। কায়রো আর আঙ্কারার সম্পর্ক হয়ে ওঠে বরফ-শীতল।

মস্কোর সাথে আঙ্কারার সম্পর্ক এর চাইতেও শীতল। প্রায় ৫০০ বছর ধরে তুর্কিদের সাথে রাশিয়ানদের দ্বন্দ্ব চলছে। বিগত এক শতকে তারা সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কিন্তু, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ গোটা পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে। রাশিয়া সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে তুরস্ক চায়, আসাদ সরকারকে ফেলে দিয়ে সিরিয়ায় সুন্নি সমর্থিত সরকার বসাতে। ২০১৫ সালে রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিজেদের আকাশসীমা লঙ্ঘনের অজুহাতে একটা রাশিয়ান এসইউ ২৪ যুদ্ধবিমানকে ভূপাতিত করে তুরস্ক। দুই দেশের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বাগযুদ্ধ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে- দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত বাক্যবাণ ছুঁড়ে আর পরস্পরের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করেই থামে তারা। এই উত্তপ্ত অবস্থা শুধু সিরিয়ার যুদ্ধ বা রাশিয়ান বিমানের কারণে নয়। উভয় দেশই আসলে কৃষ্ণ সাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের ওপর আধিপত্য করতে চায়। সেইসাথে চায় তুর্কমেনিস্তানের তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে। উভয় দেশই জানে, তুরস্ক যতই শক্তিশালী হতে থাকবে, "স্তান" দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার নিয়ে রাশিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব ততই প্রবল হবে। আর নিজেদের সার্বভৌমত্ব বা মানসম্মানের প্রশ্নে কেউই ছাড় দেবে না।

ইসরায়েলের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে মুসলিম বিশ্বের বাহবা পেলেও, তুরস্ক প্রকৃতপক্ষে পিছিয়েই গেছে কিছু ক্ষেত্রে। ইসরায়েল এখন গ্রিস আর সাইপ্রাসের সাথে গ্যাস ও জ্বালানি বিষয়ক মৈত্রী গড়েছে। এই ত্রয়ী একযোগে নিজেদের উপকূল অঞ্চলে গ্যাস উত্তোলন করছে। তুরস্কের সাথে শীতল সম্পর্ক চলতে থাকার কারণে মিশরও এই নতুন শক্তিজোটের সাথে হাত মিলিয়েছে। তারা এই তিন দেশের কাছ থেকে জ্বালানি কিনছে। অপরদিকে তুরস্কের জন্য ইসরায়েল কাছ থেকে জ্বালানি কেনাই সুবিধাজনক হতো। কিন্তু, বিরোধিতা করতে গিয়ে সেই উপায় হারিয়েছে তারা। ফলে জ্বালানির জন্য পুরনো শত্রু রাশিয়ার ওপরেই নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জ্বালানি সরবরাহের জন্য নতুন পাইপলাইন তৈরিতেও রাশিয়াকে সহায়তা করছে তুরস্ক।

তুরস্ক আর ইসরায়েলের মধ্যে এই নব্য শীতল যুদ্ধ চলতে দেখে যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কারণ দুই দেশই তাদের মিত্র। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ন্যাটোর অবস্থান শক্ত থাকবে। তুরস্ক কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বসফরাস প্রণালির দখল তাদের হাতে থাকায় কৃষ্ণসাগরে ঢোকা ও বের হওয়ার পথ তাদের নিয়ন্ত্রণে। এই প্রণালির সব থেকে সরু অংশের প্রস্থ এক মাইলেরও কম। তুরস্ক যদি এই প্রণালি বন্ধ করে দেয়, তখন কৃষ্ণসাগরে অবস্থানরত রাশিয়ান নৌবহরের পক্ষে ভূমধ্যসাগর হয়ে আটলান্টিকে যাওয়া সম্ভব হবে না। বসফরাস প্রণালি কোনোভাবে পার হতে পারলেও গিয়ে পড়তে হবে মর্মর সাগরে। এখান থেকে ভূমধ্যসাগরে যেতে চাইলে আবার দার্দানেলেস প্রণালি হয়ে আগে ইজিয়ান সাগরে পৌঁছাতে হবে। আর এই পুরো অংশটাই তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে।

বিশাল ভূমি করায়ত্ব থাকার কারণে কিন্তু সমুদ্রশক্তি হিসেবে তুরস্ককে সেভাবে কখনো বিবেচনা করা হয় না। অথচ তাদের তিনদিকে আছে তিনটি সাগর। আর এই তিন সাগরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ফলে তুরস্ককে সমীহ করতেই হবে। এছাড়া ইউরোপের সাথে মধ্যপ্রাচ্যে, ককেশাস এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর ব্যবসা আর যোগাযোগের সেতু হিসেবেও তারা ভূমিকা

রাখে। এই তিন অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে তুরস্কের সাংস্কৃতিক নৈকট্য রয়েছে। কিছু দেশের সাথে আছে জাতিগত নৈকট্যও।

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে তুরস্ক বদ্ধপরিকর। এতে বাধা আসবে তারা জানে, কিন্তু পিছু হটতে তারা রাজি নয়। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইটে "পররাষ্ট্র নীতির সারসংক্ষেপ" অংশে লেখা আছে- "তুরস্ক আফ্রো-ইউরেশিয়ান অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যেখানে আছে অবারিত সুবিধা আর সম্ভাবনা, সেই সাথে আছে হারাবার ভীষণ ঝুঁকিও"। সভ্যতার চূড়ায় ওঠার প্রয়াস হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ হতে তুরস্ক প্রচেষ্টা চালিয়েই যাবে- সে কথাও সেখানে লেখা আছে।

তবে তাদের এই ইচ্ছা এত সহজে বাস্তবায়ন হবে, এরকমটা আশা করা বাতুলতা। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ কীভাবে গণতন্ত্রের পথে চলতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে এই কদিন আগেও তুরস্ককে দেখানো হতো। তবে, তুরস্কের গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নিয়মিতই প্রশ্ন উঠছে। কুর্দিদের ওপর নিপীড়ন, ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলোর সাথে বৈষম্য এবং সিরিয়ার সরকারের বিপক্ষের যুদ্ধে ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোকে সমর্থন দেওয়ার কারণে তারা প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইহুদিদের সম্পর্কে যে ধরনের মন্তব্য করে থাকেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। এছাড়া অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী এবং লিঙ্গসমতা নিয়ে তার বক্তব্যও প্রশ্ন তৈরি করে। তার ওপর আছে তুরস্কের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া। এই সবকিছুকে বিপদ সংকেত হিসেবেই দেখছে পশ্চিমা বিশ্ব। তবে এটা ঠিক যে, আরবের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় তুরস্কে গণতন্ত্র ব্যবস্থা সুসংহত এবং উন্নত। এরদোয়ান হয়তো আতাতুর্কের গড়ে যাওয়া অনেককিছুই নষ্ট করছেন, কিন্তু তুরস্কের বর্তমান প্রজন্ম আরব মধ্যপ্রাচ্যের অন্যদের তুলনায় স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারছে।

আরব বিশ্ব ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল অনেক দিন। হুট করে সেখানে কোনো গণজাগরণ ঘটার সম্ভাবনা কম। ২০১০ সালে যখন বিভিন্ন জায়গায় গণআন্দোলন শুরু হয়, তা দ্রুতই দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর গৃহযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল। আরব বসন্ত মূলত মিডিয়ার অতিরঞ্জন। এই শব্দদ্বয় শুনতে খুব রোমান্টিক লাগতে পারে, কিন্তু এর ভেতরের বাস্তবতা অনেক কঠিন এবং

জটিল। আরব বসন্তের সময় সিটি স্কয়ারে ইংরেজিতে লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়ানো উদারপন্থী তরুণদের সাক্ষাৎকার নিতে অতি উৎসাহী হয়ে ছুটে গেছেন সাংবাদিকরা। তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই উদারপন্থী তরুণরাই আরব বিশ্বের মুখপাত্র, তারাই ইতিহাসের বাঁক বদল ঘটাবে। ইরানের সবুজ বিপ্লবের সময়ও তারা একই ভুল করেছেন। তেহরানের তরুণ ছাত্রদেরকে তারা ভেবেছেন পুরো ইরানের মুখপাত্র। অথচ আরো কতশত ইরানি তরুণ যে প্রতিক্রিয়াশীল বাসিজ মিলিশিয়া বা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, সেই হিসাব তারা রাখেননি।

১৯৮৯ সালের পূর্ব ইউরোপ জুড়ে ছিল সর্বগ্রাসবাদের চরম এক রূপ; এর নাম- কমিউনিজম। সেখানকার মানুষ তখন মনে করত একমাত্র গণতন্ত্রই তাদেরকে মুক্তি দিতে পারে। লৌহ যবনিকার অপর পাশে পশ্চিম ইউরোপে তখন গণতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পূর্ব ইউরোপের জনগণের গণতন্ত্র এবং সুশীল সমাজ নিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল। কিন্তু ২০১১ সালের আরব বিশ্বের মানুষদের এসব বিষয়ের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। একেকজন একেক মতবাদ নিয়ে এলো, আর তার অনুসারীরা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছুটতে লাগল। চরম বিভ্রান্তিপূর্ণ এক সময় ছিল তখন। এই নানা ধরনের মতবাদের মধ্যে ছিল গণতন্ত্র, উদারপন্থী গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং নেতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবাদ। এর পাশাপাশি নানারকম ছদ্মবেশে ইসলামি মতবাদ ছিল। সরাসরি ইসলামপন্থা তো ছিলই।

মধ্যপ্রাচ্যে বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। লিবিয়ার কোনো এক শহরের কিছু সরলমনা তরুণ-তরুণী হয়তো একটি উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করতে চান। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ হয়তো সমকামীদের অধিকার নিয়েও কাজ করতে আগ্রহী। কিন্তু এই উদারমনা রাজনৈতিক কর্মী অথবা সমকামী-অধিকার নিয়ে কাজ করা যে কেউ যখন-তখন গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে পারে। স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে টিকে থাকতে দেবে না। ইরাকের কথা বলা যায়। এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে উদারনৈতিকতার কোনো বালাই নেই। সমকামী হওয়ার কারণে মানুষজনকে নিয়মিতভাবেই হত্যা করা হয় সেখানে।

আরব জাগরণের দ্বিতীয় পর্যায় রমরমিয়ে চলছে বর্তমানে। যদিও, সে জাগরণে সাম্য, বাক স্বাধীনতা বা সর্বজনীন ভোটাধিকারের মত পশ্চিমা মতাদর্শের কোনো জায়গা নেই। বরং সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, যাদের কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, গোত্রীয় মনোভাব এবং অস্ত্রের ঝংকারই মূল চালিকাশক্তি। আরব বিশ্বে নানারকম প্রাচীন কুসংস্কার এবং ঘৃণার চর্চা প্রবলভাবে প্রচলিত। এই বিষয়টা পশ্চিমাদের পক্ষে অনুধাবন করা আসলে সম্ভব নয়। এমনকি নিজের চোখে দেখলেও হয়তো এখানকার প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্বাস করতে চাইবে না তারা। পশ্চিমাদের নিজেদের মধ্যেও কিন্তু কম কুসংস্কার নেই। নিজেদের ব্যাপারগুলো আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখি, কিন্তু এর বাইরে কিছু দেখলে আমরা গেল গেল রব তুলি!

আরব বিশ্বে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ করা হয় খুবই অকপটভাবে। এটা বলতে গেলে নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। বেশিরভাগ মানুষ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। এসব নিয়ে কথা বলেন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত অল্প কিছু আধুনিক মানুষ। গণমাধ্যমেও এই ব্যাপারগুলো তেমনভাবে আসে না। ইহুদিদের নিয়ে কুৎসা আর কটুক্তি এখানে খুবই সাধারণ ব্যাপার। পত্রিকাগুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে নাৎসি স্টাইলে কার্টুন আঁকা হয়। টিভি শোতে প্রতিক্রিয়াশীল ইমামরা নিয়মিতভাবেই এসে কথা বলে যান। তারা প্রকাশ্যে বিদ্বেষমূলক মতবাদ প্রচার করেন সেখানে।

পশ্চিমারা মূলত এসব মতবাদের পক্ষে সাফাই গেয়ে থাকেন, নয়তো 'ওরিয়েন্টালিস্ট' তকমা লেগে যেতে পারে! এডওয়ার্ড সাঈদ প্রণীত এই অভিধা গায়ে লাগার ভয়ে তারা নিজেদের উদারনীতির সাথে আপোস করে বসেন। অন্যরা আবার কিছুটা সরল মনে এসব ব্যাপারে চিনি লেপন করে বলার চেষ্টা করেন। তারা বলে থাকেন যে এইসব হত্যা বা সহিংসতা সংক্রান্ত আলাপ আসলে রূপক মাত্র, আরবি ভাষা না জানলে এসব শব্দের অলংকার বুঝা সম্ভব না। মোদ্দাকথা, তারা বলতে চান যে ঘৃণার এই প্রকাশ আরবদের সত্যিকারের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই বক্তব্য থেকে আসলে আরবদের সম্পর্কে

তাদের ধারণার স্বল্পতাই প্রকাশ পায়। আরবরা যখন প্রবল ঘৃণা ভরে কিছু বলে, তা তাদের মন থেকেই বলে।

হোসনি মোবারককে ক্ষমতা থেকে নামানোর পেছনে জনগণের অবদান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাইরের বিশ্ব এখানে সামরিক বাহিনীর চালটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। সামরিক বাহিনী বহু বছর ধরেই হোসনি মোবারক এবং তার পুত্র গামালকে টেনে নামানোর অপেক্ষায় ছিল। জনগণ রাস্তায় নেমে তাদের হয়ে সেই কাজটাই করে দিয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুড তার সমর্থকদের রাস্তায় নামার আহ্বান জানালে সেনাবাহিনীর সামনে দরজা খুলে যায়। মিশরে মূলত তিনটা রাজনৈতিক দল আছে- মোবারকের ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, সামরিক বাহিনী এবং ব্রাদারহুড। ব্রাদারহুড আর মিলিটারি মিলে হোসনি মোবারককে শেষ করে দেয়। এরপর নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসে ব্রাদারহুড। ক্ষমতায় এসেই তারা মিশরের ইসলামিকরণের কাজ শুরু করে। এর ফলাফল ভালো হয়নি। সেনাবাহিনী তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ইসলামপন্থীরা এখন বিরোধী শক্তি হিসেবে থাকলেও প্রকাশ্যে আসতে পারছে না। আন্ডারগ্রাউন্ডে সক্রিয় আছে।

কায়রোতে যখন হোসনি মোবারকবিরোধী আন্দোলন হচ্ছিল, তখন পথে নামে কয়েক লাখ মানুষ। কিন্তু মোবারকের পতনের পর কাতার থেকে ইসলামপন্থী নেতা ইউসুফ আল কারাদাওয়ি যখন ফিরে এলেন, তখন কম করে হলেও ১০ লাখ মানুষ সমবেত হয়েছিল। এই বিপুল জনতাকে "আরব বিশ্বের কণ্ঠ" হিসেবে মানতে নারাজ পশ্চিমা মিডিয়া। উদারপন্থীদের জন্য আরব বিশ্ব কখনোই যথাযথ জায়গা নয়, ছিলও না কখনো। তার মানে এই নয় যে, সেখানকার সকল মানুষই চরমপন্থী। এখানকার মানুষ ক্ষুধার্ত এবং ভীত। তাদেরকে যদি রুটি ও নিরাপত্তা অথবা গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক বোলচাল- এই দুইয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে তারা কোনটা নেবে এটা তো সহজেই অনুমান করা যায়!

মধ্যপ্রাচ্যে সমস্যা অসংখ্য, কিন্তু দায়ভার নেওয়ার কেউ নেই। এখানে ক্ষমতার জন্য হানাহানি করে চলা গোষ্ঠীগুলো নিজেদেরকে "রাজনৈতিক দল" বলে। দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখতে চাওয়াটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

ক্ষমতার জন্য তাদের এই লড়াইকে পশ্চিমা বিশ্ব অনেক সময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই হিসেবে দেখে এবং তাদেরকে বাহবা দেয়। এর ফলাফল হিসেবে মরতে থাকে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ। লিবিয়া, ইরাক, ইয়েমেন এবং সিরিয়াতে এই অবস্থা চলছে। সহসাই তা বদলাবে বলেও মনে হচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্র এসব অঞ্চল থেকে তাদের মনোযোগ কমাতে চায়। এখান থেকে তারা সেনাবহর সরিয়ে নিয়ে আসছে। কারণ, খরচে কুলোচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র সরে গেলে চীন এবং কিছু ক্ষেত্রে ভারত এই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসবে। চাইনিজরা ইতোমধ্যেই ইরান, ইরাক এবং সৌদি আরবে পাকা খেলোয়াড় হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া কী হবে তা নির্ধারিত হবে কোনো এক পরাশক্তির রাজধানীতে অনুষ্ঠিত কোনো এক বৈশ্বিক সম্মেলনে। বিশ্বমঞ্চে যখন এই দাবা খেলা চলতে থাকবে, মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ তখন তাদের ভূমিতে তাদের আশা-নিরাশা, কল্পনা আর জীবনের কঠিন বাস্তব নিয়ে লড়াই করতে থাকবে।

সাইকস-পিকোতে লাইন ভেঙে ফেলা হয়েছে। নতুন করে যেভাবেই তা জোড়া লাগুক, রক্তক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যায় সাত

ভা র ত এবং পা কি স্তা ন



“ভারত কোনো জাতি বা রাষ্ট্র নয়। ভারত হলো বিভিন্ন জাতিসত্তার এক উপমহাদেশ”

- মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।



ভারত এবং পাকিস্তান

ভারত এবং পাকিস্তান আর কোনো বিষয়ে একমত না হলেও একটা বিষয়ে অবশ্যই একমত হবে। সেটা হচ্ছে, তারা একে অপরকে নিজের আশেপাশে চায় না। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে ১৯০০ মাইল দীর্ঘ একটা সীমান্ত। তাই পরস্পরের প্রতি এই মনোভাবটা একটু ঝামেলারই বটে! দুই দেশের ইতিহাস বৈরিতা আর দ্বন্দ্বের। এখন আবার দুই দেশের হাতেই পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। তাই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে তার ওপর নির্ভর করছে কোটি কোটি মানুষের জীবন।

ভারতের জনসংখ্যা ১৩০ কোটি, আর পাকিস্তানে ১৮ কোটি। দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থাসহ নানান সমস্যায় পাকিস্তান জর্জরিত। অপরদিকে ভারত তাদের উন্নয়নশীল অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে বিশ্বের বুকে একটা উদীয়মান শক্তি হিসেবে পরিচিত। নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের দিকে তাকালে তারা টের পায় অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের সূচকে তারা কতটা এগিয়ে গেছে।

বিভিন্ন সময়ে এই দুই দেশের মধ্যে চারটি বড় বড় যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, আর ছোটখাটো লড়াই হয়েছে অনেক। এসব যুদ্ধ আর সংঘাতের কারণে দুই দেশের মানুষ সবসময় একে অপরের বিরুদ্ধে তেতে থাকে। এর মধ্যে পাকিস্তানি এক সামরিক অফিসার মন্তব্য করে বসেন- পাকিস্তান ভারতকে অসংখ্য ক্ষতে জর্জরিত করে চরমভাবে রক্তাক্ত করবে। এর জবাবে ২০১৪ সালে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স রিভিউ পত্রিকায় ভারতীয় সমর বিশারদ অমরজিৎ সিং লিখেছিলেন- "যে যাই বলুক, আমার মনে হয়, ভারতে পারমাণবিক বোমা হামলা করতে পাকিস্তানকে উৎসাহিত করা উচিত। এতে লাখ লাখ প্রাণ হয়তো ঝরে যাবে। কিন্তু দিনের পর দিন ধরে অসংখ্য রক্তাক্ত ক্ষত বয়ে চলা বা

অবাস্তব সম্ভাবনার আশংকায় শক্তির অপচয় করার চাইতে এটাই ভালো হবে।” ভারত সরকার অবশ্য কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে এমন বক্তব্য রাখবে না। তবে এর মাধ্যমে দুই দেশের সামাজিক মনস্তত্ত্বে পরস্পরের প্রতি জমে থাকা ঘৃণার তীব্রতা বুঝা যায়। ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই দেশের জন্ম একটা চরম দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে। এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে এই দুই দেশকে ধ্বংসও করে দিতে পারে।

বৈরী সম্পর্কের এই দুই দেশ ভৌগোলিকভাবে একদম গায়ে গা ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে থাকা এই দুইটি দেশ একত্রে একটা প্রাকৃতিক কাঠামো তৈরি করেছে। এই কাঠামোর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর। উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে হিন্দুকুশ, আর উত্তরে আছে হিমালয় পর্বতমালা। ঘড়ির কাঁটার দিকে গেলে বেলুচিস্তানের মরুভূমি থেকে মালভূমি ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে উঠতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে রূপ পেয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চল আরো উঁচু হয়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালায় পরিণত হয়েছে। ডানে ঘুরলে পূর্বদিকে এই পর্বত সংযুক্ত হয় কারাকোরামের সাথে। সেখান থেকে চলে যায় হিমালয়ে। তারপর শুরু হয় চীন আর বার্মার সীমানা। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে, ভূখণ্ডটি দক্ষিণে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমে এসেছে। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে আরো আছে বাংলাদেশ, যাকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে আছে ভারত।

ওপরে বর্ণিত এই কাঠামোর মধ্যে আছে বর্তমান সময়ের ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটান। নেপাল ও ভুটান একেবারে ছোট, ভূমিবেষ্টিত এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দুইটি দেশ। বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত এবং চীন নানাভাবে দেশ দুইটিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশের সমস্যাটা সমুদ্র নিয়ে। সমুদ্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকাটা তাদের সমস্যা নয়। সমস্যাটা হলো, সমুদ্র বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমুদ্রের কারণে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল প্রায়ই বন্যার মুখোমুখি হয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভৌগোলিক সমস্যা হচ্ছে, দেশটির প্রায় পুরোটা ঘিরে আছে ভারত। ১৯৪৭ সালে সম্পাদিত চুক্তির কারণে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত আছে ২৫৪৫ মাইল জুড়ে। একদম গায়ে জড়িয়ে থাকা যাকে বলে। ভারত ছাড়া শুধু বার্মার সাথে বাংলাদেশের ছোট

একটা সীমান্ত আছে। ভারতকে এড়িয়ে বাইরের বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের স্থল যোগাযোগের এই একটাই বিকল্পপথ।

বাংলাদেশ একটি অস্থিতিশীল দেশ। জঙ্গিবাদের সমস্যাও আছে সেখান, যা ভারতকে প্রায়ই সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু বাংলাদেশসহ এই তিনটি ছোট প্রতিবেশী দেশ কখনোই ভারতের সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ থেকে শুরু করে পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানও তেমন একটা হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়নি। তবে এখন পাকিস্তানকে নিয়ে ভারতকে ভাবতেই হচ্ছে।

ওপরে উল্লেখ করা কাঠামোর ভেতর যে অঞ্চলগুলো আছে তার বেশিরভাগই আকারে বিশাল। এদেরকে কেন্দ্রীয়ভাবে শাসন করা অত সহজ কাজ না। ব্রিটিশরাও পারেনি। তাদের বিখ্যাত আমলাতন্ত্র এবং বিস্তৃত রেলপথ দিয়েও তা সম্ভব হয়নি। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন দিতেই হয়েছিল তাদেরকে। আর তার ওপরে ছিল তাদের বিভাজনের নীতি। স্থানীয় এক নেতাকে অপর নেতার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে অশান্তি জিইয়ে রাখাই ছিল ব্রিটিশদের শাসনকাজের অন্যতম কলকাঠি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার পেছনে আছে জলবায়ুগত কারণ। উত্তরে হিমালয়ের প্রভাবে বয় কনকনে হাওয়া, আর জমে বরফ। দক্ষিণে আছে বন-জঙ্গল। উপমহাদেশ জুড়ে থাকা অসংখ্য নদী আর ধর্মের কারণেও বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এইসব নদীর ধারে বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সভ্যতা। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর সিন্ধু অববাহিকার রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। এমনকি বর্তমান সময়ে এসেও প্রায় সব জনবহুল অঞ্চলই এই নদীগুলোর আশেপাশে। অঞ্চলগুলোও একে অপরের থেকে ভিন্ন, জন্ম দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি। যেমন শিখ অধ্যুষিত পাঞ্জাব আর তামিল অধ্যুষিত তামিলনাড়ু প্রদেশের কথা বলা যায়। ভৌগোলিক কারণেই এই ভিন্নতার সৃষ্টি।

বিভিন্ন পরাশক্তি বিভিন্ন সময় ভারতে আক্রমণ করেছে। কিন্তু পুরোপুরিভাবে জয় করতে পারেনি কেউই। এমনকি বর্তমানে নয়াদিল্লি ভারতের রাজধানী হলেও ভারতের সব এলাকা পুরোপুরি দিল্লির নিয়ন্ত্রণে নেই।

একই কথা প্রযোজ্য ইসলামাবাদের ক্ষেত্রেও। ইসলামাবাদ পুরো পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। মুসলিমরা একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের আলাদা দেশ গড়তে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু এমনকি ইসলামের পক্ষেও ভাষাগত, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক দূরত্ব নিরসন করা সম্ভব হয়নি।

মুসলিমরা প্রথমবারের মত এই অঞ্চলে আক্রমণ চালায় অষ্টম শতকে। উমাইয়া খেলাফতের আমলে আরবরা বর্তমান সময়ের পাকিস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত চলে আসে। সেই সময় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নানারকম বৈদেশিক আক্রমণ চলেছে ভারত উপমহাদেশে। তারা নানা মেজাজের ইসলাম প্রচার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার পূর্ব দিকে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠী বাস করত, তারা ধর্মান্তরিত হয়নি কখনোই। সেই সময়েই ধর্মভিত্তিক বিভাজনের বীজ রোপিত হয় ভারতবর্ষে।

ব্রিটিশরা এসেছিল, ২০০ বছর শাসন করে চলেও গেছে। তারা চলে যাওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণও ছুটে গেছে। অবশ্য সত্যিকার অর্থে ভারতবর্ষে কখনোই কোনো কেন্দ্র ছিল না। এই অঞ্চলটা সবসময়ই বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম দ্বারা বিভক্ত ছিল। পাঞ্জাবি আর গুজরাটিরা যেমন এক নয়, তেমনই পর্বত আর মরুভূমিতে বাস করা মানুষও একরকম নয়। হিন্দু আর মুসলিমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকাটাও স্বাভাবিক। ১৯৪৭ সালে ভারত দুইভাগে বিভক্ত হয় মূলত উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে। পরবর্তীতে তা আরো একবার ভেঙে মোট তিনভাগ হয়। এই তিনভাগের নাম হলো ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ব্রিটিশরা যখন ভারত ছেড়ে যায়, তখন তারা দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভারে বিপর্যস্ত। তারা বুঝতে পারছিল তাদের সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে আসছে। তাই দাপটের সাথে মাথা উঁচু করে চলে যেতে পারেনি তারা। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটেনের হাউজ অফ কমন্স-এ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়া এবং ভারতভাগের ঘোষণা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই ভাগে ভাগ হয়। ৭৩ দিন পরে, ১৫ই আগস্ট তারা প্রায় পুরোপুরিই চলে যায়।

লাখে লাখে মানুষ তখন তাদের ঠিকানা বদলাতে থাকে। ভারত থেকে মুসলিমরা যেতে থাকে পাকিস্তানে। আর পাকিস্তান থেকে শিখ আর হিন্দুরা

ভারতে আসতে থাকে। রাস্তা ভর্তি ছিল মানুষের সারি। একেকটা সারিতে প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো মানুষ ছিল। ট্রেন ভর্তি করে মানুষ চলে যাচ্ছিল নতুন ঠিকানায়, ফিরতি ট্রেনও আসছিল মানুষে ভর্তি হয়ে।

সময়টা ছিল অস্থিরতা আর বিশৃঙ্খলার। পথে পথে শুরু হলো দাঙ্গা। ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে লাগল মুসলিম, হিন্দু আর শিখরা। ব্রিটিশরা তখন ঐসব ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছে। ভারতবর্ষে তাদের সেনা উপস্থিতি তখনো ছিল। কিন্তু, পাকিস্তান আর ভারতের নতুন নেতাদের অনেক অনুরোধের পরেও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠাতে রাজি হয়নি তারা। সেই চরম বিশৃঙ্খলার সময় মারা যায় অন্তত দশ লাখ মানুষ, গৃহহারা হয় অন্তত দেড় কোটি। থর মরুভূমির পশ্চিমে অবস্থিত সিন্ধু উপত্যকা এবং আরো পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা মিলে পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আর কলকাতার পূর্ব দিকের গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলের নতুন নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

কিন্তু এই নতুন দেশ পাকিস্তানের প্রাপ্তি কী ছিল? ভারতের তুলনায় খুবই কম। পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল ভারতবর্ষের সব থেকে সমস্যাসঙ্কুল সীমান্ত অঞ্চল, আফগানিস্তানের লাগোয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। পাকিস্তানকে ভাগ করা হয়েছিল দুই অংশে। এই দুই অংশ, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল ১০০০ মাইল, যার মাঝে আবার ছিল ভারত। যুক্তরাষ্ট্রেরও এমন দূরবর্তী প্রদেশ আছে, যেমন আলাস্কা। তবে যুক্তরাষ্ট্রকে কখনো তাদের প্রদেশগুলোর দূরত্ব নিয়ে বড় সমস্যায় পড়তে হয়নি। কারণ এই দুই অংশের মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক, ভাষাগত বা অর্থনৈতিক সংযোগ। তাছাড়া সার্বিক পরিস্থিতিও ছিল স্থিতিশীল। অপরদিকে দুই পাকিস্তানের মধ্যে একটাই মাত্র যোগসূত্র ছিল, সেটা হলো ইসলাম। কিন্তু ধর্মীয় এই মিল তাদেরকে কখনোই সেভাবে এক সুতোয় গাঁথতে পারেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান ভেঙে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তান। নয় মাস ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের পরে স্বাধীনতা লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান। জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের নতুন একটি দেশ। যুদ্ধের সময় ভারত সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিল বাংলাদেশকে।

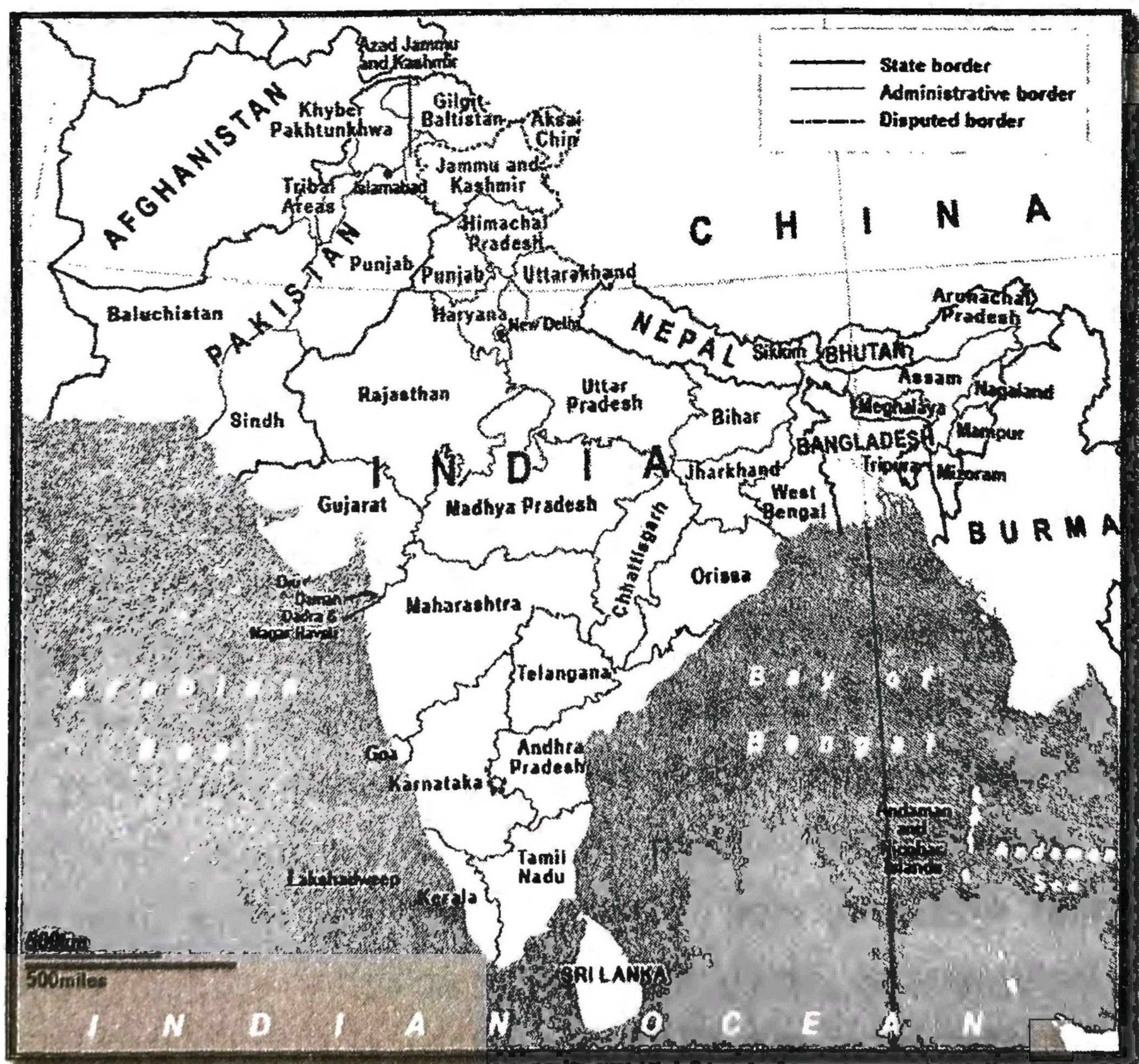
১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিনে অটোমান সাম্রাজ্যের সমাপ্তির পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। জিন্নাহ এবং নবগঠিত পাকিস্তানের অন্যান্য মুসলিম নেতারা একটি সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাদের দাবি ছিল মুসলিমদের জন্য তারা একটি ঐক্যবদ্ধ দেশের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি।

পাকিস্তান বরাবরই ভারত থেকে পিছিয়ে। ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক বা অর্থনৈতিক- সব দিক দিয়েই তারা পিছিয়ে। পাকিস্তানের জাতীয় পরিচয়ও এতটা সমৃদ্ধ না। অপরদিকে বিশাল আকার, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন থাকা সত্ত্বেও ভারতে সমৃদ্ধ সেকুলার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছ। জাতীয় পরিচয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ভারতীয়রা। অপরদিকে পাকিস্তান শুধু ইসলাম ধর্মের পরিচয়ে জনগণকে একত্রিত করতে চেয়েছে। এখানে স্বৈরাচারী শাসন চলেছে বছরের পর বছর। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের চেয়ে নিজেদের আঞ্চলিক পরিচয়কেই বড় মনে করেছে জনগণ।

অপরদিকে শুরু থেকেই ভারত চলেছে সেকুলার নীতিতে। ১৯৪৭ এর বিভাজন তাদেরকে সুবিধাই দিয়েছিল বলা যায়। পুরনো শিল্পাঞ্চলগুলোর অধিকাংশই ছিল তাদের সীমানার মধ্যে। এছাড়াও প্রধান প্রধান শহর এবং করযোগ্য আয়ের আওতাভুক্ত অঞ্চলগুলোর বেশিরভাগই পড়ে তাদের ভাগে। যেমন, কলকাতা। কলকাতায় ছিল ব্যাংক এবং বন্দর। ফলে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) হারায় তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বৃটিশ ভারতের যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছিল, দেশভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগ্যে জোটে তার মাত্র ১৭ শতাংশ। পাকিস্তানের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিনির্ভর। উন্নয়নের পেছনে খরচ করার মতো যথেষ্ট টাকা তাদের ছিল না। তার ওপর সংঘাতময় পশ্চিম সীমান্ত আর নিজেদের মধ্যে নানারকম বিভাজন তো ছিলই। পাকিস্তান নিয়ে আরো আলোচনার আগে তাদের নামটার শাব্দিক অর্থটা জেনে নেওয়া যাক। এই নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে বিভাজনের ব্যাখ্যা। পাক শব্দের অর্থ পবিত্র, আর স্তান অর্থ অঞ্চল। তবে এই নামের আরো অর্থ বের করা যায়। যেমন, "পি" তে পাঞ্জাব, "এ" তে আফগানিয়া (আফগান

সীমান্তের পশতুভাষী অঞ্চল), "কে" তে কাশ্মীর, "এস"-এ সিন্ধু আর "টি" তে বেলুচিস্তানের স্তান। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী এলাকাগুলো বড়জোর একেকটি প্রদেশ হতে পারে, কিন্তু একতাবদ্ধ দেশ হওয়া খুব কঠিন। নিজেদের মধ্যে একতা গড়ে তুলতে পাকিস্তান কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু একজন পাঞ্জাবি একজন বালুচকে বা একজন সিন্ধি একজন পশতুনকে বিয়ে করছে, এমন ঘটনা কমই ঘটে। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৬০ ভাগ পাঞ্জাবি, ১৪ ভাগ সিন্ধি, ১৩.৫ ভাগ পশতুন আর ৪.৫ ভাগ বালুচ। দেশের সংখ্যালঘু খ্রিস্টান আর হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তো আছেই, প্রধান দুইটি মুসলিম গোত্র, সুন্নি এবং শিয়াদের মধ্যেও ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলমান আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিরা শিয়াদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এককথায় বলতে গেলে পাকিস্তানে এক রাষ্ট্রের ভেতরেই আছে বেশ কয়েকটি জাতি।



চিত্র- যে অঞ্চলগুলো নিয়ে পাকিস্তান এবং ভারত গঠিত হয়েছে, সেই অঞ্চলগুলোর অধিকাংশই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। মূলত যেসব মুসলিম ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানে গিয়ে থিতু হয়েছে, তাদের মাতৃভাষা এটি। তাদের বেশিরভাগই বাস করে পাঞ্জাব অঞ্চলে। উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারটা পাকিস্তানের অন্য অঞ্চলের মানুষেরা কখনোই ভালোভাবে নেয়নি। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা একে পাঞ্জাবি আধিপত্য হিসেবে দেখেছে। তারা মনে করে, তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভাবা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পশতুনরাও কখনো তাদের এলাকায় বাইরের মানুষের আধিপত্য মেনে নেয়নি। পশতুন অঞ্চলের আদিবাসীদের এলাকাগুলোকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাধীন বলা হয়। কাগজে কলমে তাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব এলাকায় কখনোই ইসলামাবাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা আরো জটিল। তাদের নিয়ে ভারত আর পাকিস্তান দুই দেশেরই কাড়াকাড়ি। কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতা চায়। কিন্তু কাশ্মীরকে স্বাধীনতা না দেওয়ার ব্যাপারে ভারত আর পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রই একমত।

বালুচিস্তানেও চলছে স্বাধিকার আন্দোলন। মাঝেমধ্যে এই আন্দোলন তীব্র রূপ নিচ্ছে। বালুচিস্তানের জনসংখ্যা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার সামান্য এক অংশ। কিন্তু এই অঞ্চলের গুরুত্ব অনেক। বালুচিস্তানকে ছাড়া পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন। এই প্রদেশটি পাকিস্তানের মোট আয়তনের ৪৫ শতাংশ জুড়ে বিস্তৃত। তাছাড়া দেশটির প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ সম্পদের বড় অংশও রয়েছে এই অঞ্চলে। বালুচিস্তান আরো একটি কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল পাকিস্তানের জন্য নতুন আয়ের পথ দেখাচ্ছে। ইরান এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে পাকিস্তান হয়ে চীনে জ্বালানি যাওয়ার পথ এই অঞ্চল দিয়েই তৈরি হওয়ার কথা। বালুচিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা উপকূলীয় শহর গোয়েদার। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন ১৯৭৯ সালে যখন রাশিয়া আফগানিস্তানকে আক্রমণ করে, তখন গোয়েদার ছিল তাদের সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। গোয়েদারে আছে উষ্ণ পানির বন্দর। উষ্ণ পানির একটা বন্দরকে করায়ত্ত করার জন্য মস্কো বহুদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অতি মূল্যবান অঞ্চলটি চীনেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। চীন এখানে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ২০০৭ সালে এখানে একটি গভীর পানির বন্দর নির্মিত হয়। বর্তমানে দুই দেশ মিলে এই বন্দরের সাথে চীনের সংযোগ

স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে নিজেদের জ্বালানি শক্তির চাহিদা মেটাতে চীন পাকিস্তানকে ব্যবহার করবে, এতে সন্দেহ নেই। চীন চায় মালাক্কা প্রণালি পরিহার করে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন করতে। চীন অধ্যায়ে আমরা দেখেছি এই প্রণালিটি অতি সংকীর্ণ এবং এর চারপাশে চীনের শত্রুদেশ আছে। তাই মালাক্কা প্রণালি দিয়ে পণ্য পরিবহন করতে স্বস্তি বোধ করে না তারা। মালাক্কা প্রণালি তাদের ব্যবসার উন্নয়নের গতি স্তিমিত করে দিচ্ছে। মালাক্কার বদলে পাকিস্তানকে ব্যবহার করলে চীন নানা দিক দিয়েই সুবিধা পাবে।

২০১৫ সালের বসন্তে দুই দেশের মধ্যে ৪৬ বিলিয়ন ডলারের একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় গোয়েদার থেকে চীনের জিনজিয়াং অঞ্চল পর্যন্ত ১৮০০ মাইল দীর্ঘ বিশাল হাইওয়ে, রেলপথ এবং পাইপলাইন তৈরি হবে। একে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে চীন পেয়ে যাবে ভারত মহাসাগর দিয়ে সরাসরি যাতায়াতের সুযোগ। ২০১৫ সালে গোয়েদার বন্দর অঞ্চলের ২৩০০ একর ভূমি ৪৪ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে চীন। সেখানে তারা নির্মাণ করছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এই সবকিছুই চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের অংশ। উভয় দেশই জানে যে বালুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং অস্থিতিশীলতা চলতেই থাকবে। তাই, এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে ২৫০০০ সদস্যের নিরাপত্তা বাহিনী।

স্থলপথ নির্মাণে চীনের এই ব্যাপক বিনিয়োগ পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্য খুবই সুবিধাজনক। এই কারণে তারা বরাবরই নির্মমভাবে এই অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করে চলেছে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই অঞ্চল থেকে আহরিত সম্পদ এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যয় শুরু না করা হবে, ততদিন এই অঞ্চলে থেমে থেমে সহিংসতা চলতেই থাকবে, তা একরকম নির্ধারিত।

পাকিস্তানকে একতাবদ্ধ রাখার মূলমন্ত্রগুলো হচ্ছে ইসলাম, ক্রিকেট, গোয়েন্দা সংস্থা, সামরিক বাহিনী এবং ভারতবিদ্বেষ। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদ জোরালো হয়ে উঠতে থাকলে এই বিষয়গুলো দিয়ে আর কতদিন পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা যাবে, তা প্রশ্নের দাবি রাখে। গত এক দশক ধরেই

পাকিস্তানে একরকম গৃহযুদ্ধ চলছে। এর আগে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের সাথেও অপরিণামদর্শী কিছু যুদ্ধে জড়িয়েছে তারা। এই যুদ্ধগুলোর ভেতর প্রথমটা হয় ১৯৪৭ সালে, দেশ ভাগের কিছুদিন পরেই। যুদ্ধটা ছিল কাশ্মীরকে নিয়ে। ১৯৪৮ সালে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং দুই দেশ কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা (লাইন অফ কন্ট্রোল) ধরে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ ভাগ করে নেয়। এই নিয়ন্ত্রণরেখাকে এশিয়ার বার্লিন দেওয়ালও বলা হয়। অবশ্য, উভয় দেশই পুরো কাশ্মীরের ওপর নিজেদের সার্বভৌম অধিকার দাবি করে।

৪৭-এর যুদ্ধের প্রায় ২০ বছর পরে পাকিস্তান একটা ভুল করে বসে। ১৯৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধে ভারতকে পর্যদুস্ত হতে দেখে ভারতের সামরিক শক্তিকে তুচ্ছ ভেবে বসে তারা। সে-সময় চীনের তিব্বত অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ভারত আর চীনের দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল। ভারত তখন তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাই লামাকে আশ্রয় দিয়েছিল। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছিল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে চীন স্পষ্টভাবেই নিজেদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে দেয়। তারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতের প্রাণকেন্দ্রের কাছাকাছি আসাম পর্যন্ত চলে আসে। চীনের এই প্রবল গতিতে এগিয়ে যাওয়া দেখে পাকিস্তান ধরে নেয় যে ভারতকে সহজেই পরাজিত করা সম্ভব। ১৯৬৫ সালে তারা মহা উৎসাহে ভারত আক্রমণ করে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

এরপর ১৯৮৪ সালে আবারও যুদ্ধ হয়। ভূমি থেকে ২২০০০ ফিট ওপরে, সিয়াচেন হিমবাহের ওপর হওয়া এই যুদ্ধটি ছিল ইতিহাসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় সংঘটিত যুদ্ধ। ১৯৮৫, ১৯৮৭ এবং ১৯৯৫ সালেও ছোটখাটো যুদ্ধ হয়। এছাড়া পাকিস্তান নিয়মিতভাবে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ন্ত্রণরেখা পার করে ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলেছে। ১৯৯৯ সালে কাশ্মীর নিয়ে আবারও যুদ্ধ হয় দুই দেশের মধ্যে। তখন দুই দেশই পরমাণু অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। ওই সময়টাতে এই অঞ্চল কয়েক সপ্তাহ ধরে পরমাণু যুদ্ধের হুমকির মুখে ছিল। এই ভয়াবহ সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করতে উদ্যোগ নেয় যুক্তরাষ্ট্র। তাদের কূটনীতিবিদরা দ্রুততার সাথে দুই দেশের মধ্যে সংলাপের ব্যবস্থা করেন এবং অবশেষে তারা যুদ্ধ থামায়। ২০০১ সালেও আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এখনো নিয়মিতই দুই দেশের মধ্যে গোলা বিনিময় চলছে। দুই দেশই

সামরিকভাবে মুখোমুখি অবস্থানে আছে। উভয় দেশই বলে থাকে যে তাদের সামরিক স্থাপনা শুধু প্রতিরক্ষার স্বার্থে। কিন্তু একে অপরকে একেবারেই বিশ্বাস করে না। তাই উভয়েই সীমান্ত অঞ্চলে মোতায়েন করা সেনা ও সরঞ্জামের সংখ্যা বাড়িয়ে চলছে।

পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব কখনোই হওয়ার নয়। তবে কাশ্মীরের ব্যাপারটা না থাকলে হয়তো এত চরম বৈরিতা থাকত না। ভারত চায় পাকিস্তানের ভেতরের জাতিগত অস্থিতিশীলতাকে জিইয়ে রাখতে। অপরদিকে পাকিস্তান চায় ভারতকে দুর্বল করতে। ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলায় পাকিস্তানের ইন্ধন আছে। ২০০৮ সালের মুম্বাই গণহত্যায় পাকিস্তানের জড়িত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কাশ্মীর দুই দেশের কাছেই একটা মর্যাদার ব্যাপার। তবে কাশ্মীরের পেছনে এভাবে উঠে পড়ে লাগার পেছনে কৌশলগত কারণও আছে। কাশ্মীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেলে মধ্য এশিয়ার সাথে ভারতের যোগাযোগের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে, এবং সেই সাথে পাওয়া যাবে আফগানিস্তানের সাথে সীমানা। ভারত যদি কাশ্মীর পুরোটা দখল করতে পারে, তাহলে পাকিস্তানের সাথে চীনের সীমানা থাকবে না। ফলে চীনও আর পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইবে না। পাকিস্তানের সরকার বড় গলা করে বলে, "চীনের সাথে সম্পর্ক পর্বতের চেয়েও উচ্চ আর সমুদ্রের চেয়েও গভীর"। অনেক বাড়িয়ে বলা হলেও এই কথাগুলো অ্যামেরিকাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই কারণে পাকিস্তানকে দেওয়া বিপুল আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার ব্যাপারে দ্বিধায় থাকে ওয়াশিংটন।

এদিকে কাশ্মীরের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেলে ইসলামাবাদের পররাষ্ট্রনীতি শক্তিশালী হবে এবং ভারতকেও বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো পানির ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারবে পাকিস্তান। সিন্ধু নদের উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের তিব্বত অঞ্চলে। তবে নদীটি পাকিস্তানে ঢুকেছে ভারতশাসিত কাশ্মীর অঞ্চল দিয়ে। পুরো পাকিস্তান জুড়ে প্রবাহিত হয়ে করাচির আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে নদীটি। পাকিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলে পানি সরবরাহ করে সিন্ধু ও তার উপনদীগুলো। এই নদীতে পানির প্রবাহ ঠিক না

থাকলে তুলা চাষসহ পাকিস্তানের আরো অনেক শিল্পই ধ্বসে পড়বে। এই নদীর জল নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি আছে। এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও একে অপরের সাথে নদীর জল ভাগাভাগি করার বিষয়ে বলা আছে এই চুক্তিতে। কিন্তু যেভাবে দুই দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাতে এই চুক্তি মেনে চলা ভবিষ্যতে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র কাশ্মীরের পূর্ণ অধিগ্রহণই পাকিস্তানের জলের নিশ্চয়তা দিতে পারে। দুই দেশের কেউই কাশ্মীরের অধিকার ছাড়তে চাইবে না। আর কাশ্মীর প্রসঙ্গে মতৈক্যে না পৌঁছালে দুই দেশের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাশ্মীরের নিয়তি মোটামুটি নির্ধারিত। কাশ্মীরকে ঘিরে দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত যোদ্ধারা সীমানা পার হয়ে ভারতীয় অংশে হামলা চালিয়ে চলে যাবে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবে এবং কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা চলবে। এই খণ্ডযুদ্ধ থেকেই হয়তো পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি পরমাণু অস্ত্র নিয়ে হম্বিতম্বি শুরু হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এছাড়া দুই দেশই ছদ্মযুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আফগানিস্তান এখন এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য চমৎকার জায়গা। কারণ, ন্যাটোবাহিনী এখন সেখান থেকে চলে গেছে।

পাকিস্তান কৌশলগত দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে আছে ভারতের তুলনায়। কৌশলগত গভীরতা না থাকায় ভারতের কাছে পূর্ব দিকে বেকায়দায় পড়ে পিছু হটতে হলে পশ্চিমে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। পাকিস্তান-ভারত সীমানার দক্ষিণ অংশে রয়েছে বিশাল জলাভূমি, মাঝ বরাবর আছে থর মরুভূমি আর উত্তরে পর্বতমালা। অতি দুর্গম এই জায়গাগুলো অতিক্রম করা যে কোনো সামরিক বাহিনীর জন্যই কঠিন। তবে তা সম্ভব এবং দুই দেশেরই আলাদা পরিকল্পনা আছে এই ব্যাপারে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনার মধ্যে আছে করাচির বন্দর অবরোধ করা এবং সেখানকার তেল ডিপো থেকে সাগর বা স্থলপথে তেলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া। তবে তাদের জন্য দক্ষিণ আর উত্তরের মাঝখানের জায়গা দিয়ে আক্রমণ করাই শ্রেয়তর হবে। এই অংশে আছে পাঞ্জাব। আর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ পাঞ্জাবেই অবস্থিত।

ভারতীয় সীমানা থেকে ইসলামাবাদের দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল। এই দূরত্বের অধিকাংশই সমতল পথ। তাই, যদি বড় আকারে যুদ্ধ লেগে যায়, এই অঞ্চলে পৌঁছুতে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর খুব একটু সমস্যা হবে না। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে। যদিও ভারতের তরফ থেকে এমন কোনো ইচ্ছা কখনো প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু যুদ্ধকৌশলের ক্ষেত্রে শত্রুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই। পাকিস্তান মনে করে ভারত তা করতেই পারে। অন্তত ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে পাকিস্তানের এই উদ্বেগের কারণ আছে বৈকি! আর তাই এই অঞ্চলে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একাধিক পরিকল্পনা রাখতেই হচ্ছে পাকিস্তানকে।

প্ল্যান এ হলো- ভারতীয় বাহিনীকে পাঞ্জাবে আসতে বাধা দেওয়ার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে নিজেরাই ঢুকে পড়া এবং পাল্টা আক্রমণ করে ভারতের জাতীয় মহাসড়ক 1A -কে অবরুদ্ধ করে দেওয়া। ভারতের সেনাবাহিনীর রসদ পরিবহন করা হবে এখান দিয়েই। ভারতীয় সামরিক বাহিনী আকারে বিশাল, ১০ লাখেরও বেশি এর সদস্যসংখ্যা। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর চেয়ে আকারে অন্তত দ্বিগুণ তো হবেই! এত বড় একটা বাহিনীর জন্য বিশাল রসদের সরবরাহও প্রয়োজন। এই সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হলে তারা মহাবিপদে পড়ে যাবে। আর প্ল্যান বি হলো, আফগানিস্তানের সীমানার দিকে পিছু হটা। এজন্য তাদের কাবুলের সহযোগিতা দরকার। কাবুলে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল সরকার থাকলে তারা তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবে। এইভাবেই ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তান জড়িয়ে গেছে আফগানিস্তানের সাথে। ফলে ভারতও জড়াতে বাধ্য হয়েছে। দুই পক্ষই চায় কাবুলে নিজেদের সুবিধা মতো সরকার বসুক। আর তা যদি সম্ভব না হয়, কাবুলের সরকার তাদের শত্রুর শত্রু হোক!

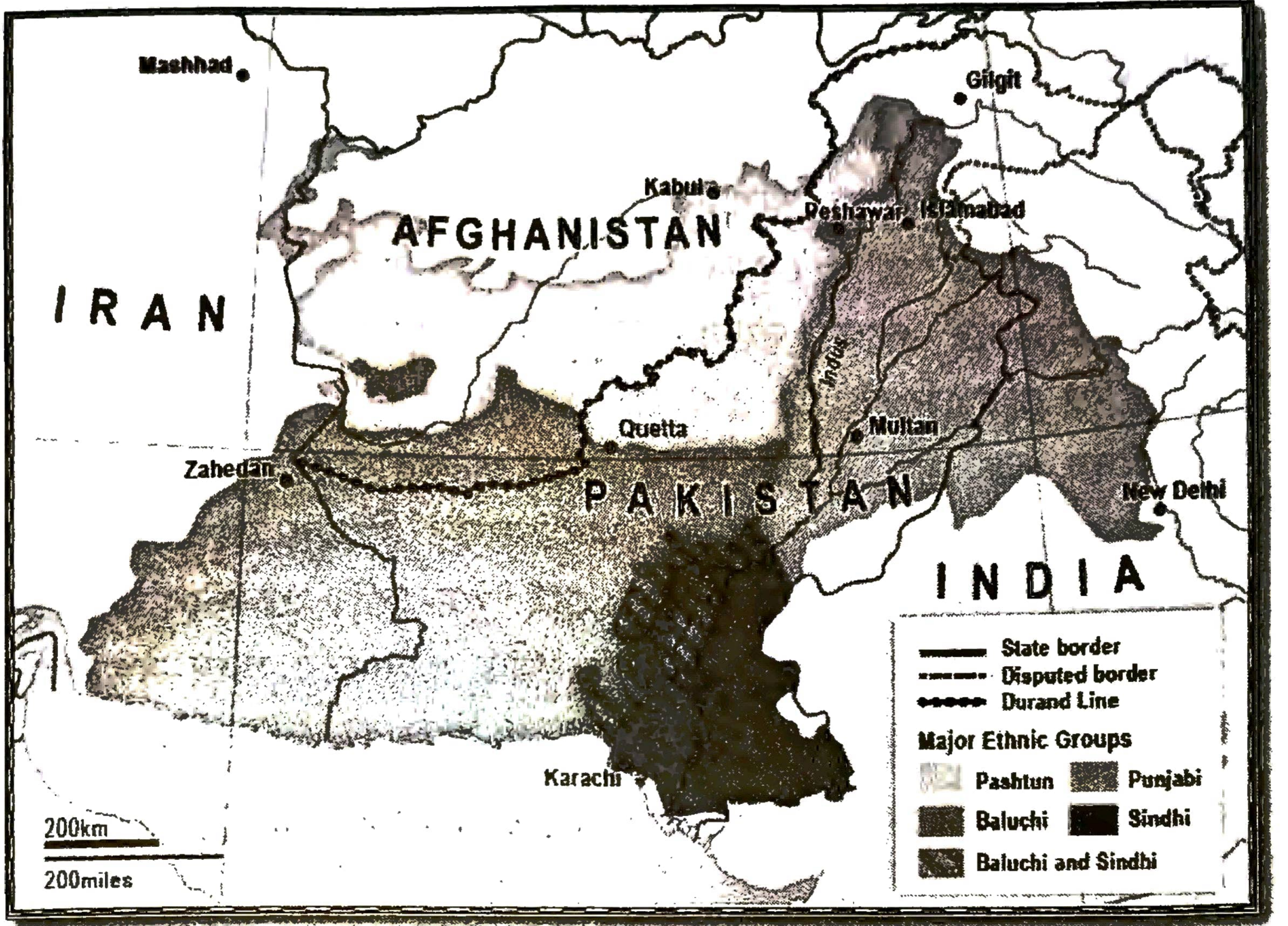
১৯৭৯ সালে সোভিয়েতেরা যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তখন ভারত মস্কোকে কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। ওদিকে পাকিস্তান দ্রুত অ্যামেরিকা আর সৌদির পক্ষে চলে গিয়েছিল। তারা সোভিয়েত রেড আর্মির বিরুদ্ধে লড়তে আফগান মুজাহিদদের প্রশিক্ষিত ও সশস্ত্র করার পরিকল্পনা নেয়। সোভিয়েতেরা আফগানিস্তানে পরাজিত হওয়ার পরে পাকিস্তানের

ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আইএসআই (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) তাদের পরিকল্পনায় বদল আনে। তাদের প্রত্যক্ষ মদদেই আফগানিস্তানে তালিবানদের জন্ম হয়। পরে এই তালিবানরাই আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসে। পাকিস্তানের পক্ষে আফগান তালিবানদের সাথে মিশে যাওয়া সহজ। তালিবানদের বেশিরভাগই পশতুন। পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষও পশতুন। তারা কখনোই একে অপরকে আলাদা ভাবেনি। তাদের মধ্যেকার সীমান্তকে তারা পশ্চিমাদের চাল মনে করে। এই কথা অবশ্য অনেকাংশেই সত্যি বলা যায়।

আফগান-পাকিস্তানের এই সীমানাকে বলে ডুরান্ড লাইন। ডুরান্ড লাইন আঁকেন স্যার মর্টিমার ডুরান্ড। তিনি ঔপনিবেশিক ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। তিনি এই লাইনটি আঁকেন ১৮৯৩ সালে। আফগানিস্তানের তৎকালীন শাসকও এই সীমান্তের সাথে একমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে আফগান সরকার এই চুক্তিটি অস্বীকার করে বসে। তখন তাদের মনে হয়েছিল যে, এই লাইনটা বিভেদ তৈরির একটা ঔপনিবেশিক চাল ছাড়া আর কিছু না। সে-সময় থেকে পাকিস্তান চেষ্টা চালিয়ে আসছে যেন আফগানিস্তান এই সীমানাটা মেনে নেয়। কিন্তু আফগানদের মত বদলায়নি। উভয় অংশের পশতুনরা বরাবরই এই লাইনটাকে অগ্রাহ্য করে এসেছে। পর্বতের দুই পাশের মানুষজন শত শত বছর ধরে যেভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল, সেভাবেই অব্যাহত রেখেছে।

খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের কেন্দ্রীয় এলাকাকে পশতুনিস্তান নামেও ডাকা হয়। এই অঞ্চলের কেন্দ্রে আছে পাকিস্তানের শহর পেশওয়ার। এই শহরকে তালিবানদের সামরিক শিল্পকেন্দ্র হিসেবে ধরা যায়! এখানে ঘরে ঘরে কালাশনিকভ রাইফেল ও বোমা তৈরি হয়। তালিবান যোদ্ধারা এখানে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো আসে আর যায়। পাকিস্তান সরকারও এসব কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে মদদ যুগিয়ে থাকে। পেশোয়ারে প্রচুর আইএসআই অফিসার আসে। তালিবান বা এই জাতীয় আরো বাহিনীর জন্য অর্থ বা দিক নির্দেশনা নিয়ে সীমান্তের ওপারে যায় তারা। পাকিস্তান অনেকদিন ধরেই আফগানিস্তানে

সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে। এতদিন এসব নির্বিঘ্নে করে গেলেও এখন তারা এই নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়ে গেছে।



চিত্র- -১৮৯৩ সালে টানা ডুরান্ড লাইন দিয়ে পাকিস্তান-আফগান অঞ্চলের মূল জাতিগোষ্ঠীকে আলাদা করা যায়নি। এই অঞ্চলের গোত্রগুলো তাদের রাষ্ট্রের বাকিদের চাইতে সীমান্তের অপরপারের স্বগোত্রীয় মানুষদেরকেই বেশি আপন ভাবে।

পাকিস্তানি সমর্থনপুষ্ট তালিবানরা অনেকদিন ধরেই বিদেশি আল কায়েদার যোদ্ধাদের সাহায্য করে যাচ্ছিল। ২০০১ সালে ৯/১১-এর সেই নারকীয় ঘটনা ঘটল। আল কায়েদা অ্যামেরিকায় গিয়ে টুইন টাওয়ারে বোমা হামলা চালিয়ে এল। আর এই পরিকল্পনা আফগানিস্তানে বসেই করা হয়েছিল। তখন থেকেই শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ। তালিবান আর আল কায়েদাকে কাবুল থেকে বিতাড়িত করল মার্কিনিরা। তালিবানবিরোধী আফগান নর্দার্ন অ্যালায়েন্স আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এল এবং ন্যাটোর বাহিনী এসে আফগানিস্থানকে স্থিতিশীল করার দায়িত্ব নিল।

৯/১১-এর হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে তাদের কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের চাইছিল, তাদের এই "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" পাকিস্তানও যেন সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। তাদের আরো চাওয়া ছিল, পাকিস্তান যেন সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করে। তখনকার মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েল নিজেই ফোন করেন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে। পারভেজ মোশাররফকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থেকে বের হয়ে কলটা ধরতে হয়েছিল। কলিন পাওয়েল সোজাসাপটাভাবে বলে দেন, "হয় আপনি আমাদের পক্ষে, নয়তো বিপক্ষে"। পাওয়েলের ডেপুটি, রিচার্ড আরমিটেজ আইএসআই-এর প্রধানকে ফোন করে জানিয়েছিলেন- যদি তারা সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেয়, তাহলে বোমা ফেলে পাকিস্তানকে প্রস্তরযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে পারভেজ মোশাররফের নিজের লেখা ছাড়া আর কোথাও এই ব্যাপারে শক্ত কোনো প্রমাণ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকেও এমন কিছু স্বীকার করা হয়নি। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করে, এটা সত্য। আবার তারা পুরোপুরি সহযোগিতা করেনি, এটাও সত্য।

ইসলামাবাদ যুক্তরাষ্ট্রের কথা মানতে এবং সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। তবে এই সহযোগিতাকে একদম সর্বজনীন পাকিস্তানি সমর্থন বলা যায় না। পাকিস্তানে অনেকেই এর বিপক্ষে ছিল। বেশ কিছু জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তানের সরকার। সেই সাথে বেশকিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীর কার্যক্রমেও লাগাম টানা হয়। ২০০৪ সালের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু গোষ্ঠীর ওপর সামরিক অভিযান চালায় পাকিস্তান সরকার। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেও, ওই অঞ্চলে মার্কিন ড্রোন হামলাকে গোপনে সমর্থন জানায় তারা।

তবে পাকিস্থানের পক্ষে এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেও সহজ ছিল না। গোটা ৯০-এর দশক জুড়ে তালিবানদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং আইএসআই। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল। এখন তাদের বিরুদ্ধে সেই সেনাবাহিনী আর ইন্টেলিজেন্সকেই ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে! এটা খুবই কঠিন সিদ্ধান্ত। তালিবানরা এর প্রতিক্রিয়া জানায় তীব্রভাবে। প্রবল আক্রোশে সীমান্ত প্রদেশের কিছু আদিবাসী এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তারা। প্রেসিডেন্ট মোশাররফকে তিনবার হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও মোশাররফের সম্ভাব্য উত্তরসূরি বেনজীর ভুট্টোকে হত্যা করতে সক্ষম হয় তারা। বোমা হামলা আর সামরিক অভিযানের মাঝখানে পড়ে নিহত হয় পাকিস্তানের অন্তত ৫০,০০০ সাধারণ নাগরিক।

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর যৌথ আক্রমণ এবং আফগান সীমান্তে পাকিস্তানি কড়াকড়ির কারণে আল কায়েদা-সংশ্লিষ্ট আরব, চেচেন ও অন্যান্য দেশের যোদ্ধারা আশ্রয় নেয় নানা দেশে। আল কায়েদা নেতাদেরকে একে একে খুঁজে খুঁজে মারা হয়। কিন্তু তালিবানদের কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। তালিবান যোদ্ধাদের বেশিরভাগই আফগান এবং পাকিস্তানি। উন্নত বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে সংগঠিত আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা বিশেষ এক পন্থা বেছে নিল। পশ্চিমাদের তারা বলল- "তোমাদের হাতে ঘড়ি থাকতে পারে, তবে আমাদের আছে সময়"। তারা ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে শুরু করল। তারা জানত, যত আক্রমণই হোক না কেন, সময়ের সাথে একসময় তা স্তিমিত হয়ে আসবেই। পাকিস্তানের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকেও সাহায্য পাচ্ছিল তারা। কয়েক বছরের মধ্যেই বুঝা গেল, তালিবানরা হারেনি। তারা তাদের জাতিগোষ্ঠী পশতুনদের সাথে মিশে গিয়েছিল। সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে তারা আবার তাদের কার্যক্রম শুরু করবে নতুন উদ্যমে, এই ছিল পরিকল্পনা।

যুক্তরাষ্ট্র অবলম্বন করেছিল "হাতুড়ি ও নেহাই" পদ্ধতি। তারা আফগান তালিবানদের হাতুড়ির বাড়ি দেবে আর সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানের সামরিক কার্যক্রমকে নেহাই হিসেবে ব্যবহার করবে। কিন্তু দেখা গেল তালিবান-অধ্যুষিত আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে হাতুড়ির বাড়ি মেরে লাভ হচ্ছে না। স্পঞ্জ যেমন পানিকে শুষে নেয় সেভাবে তারা আঘাতগুলো সয়ে নিল। অ্যামেরিকা হাতুড়ি দিয়ে স্পঞ্জকে বাড়ি দিয়ে অযথাই শক্তিক্ষয় করতে লাগল। তালিবানরা পশতুন পার্বত্য অঞ্চলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

এর মধ্যে ২০০৬ সালে ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা দক্ষিণের হেলমন্দ প্রদেশকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করবে। প্রাদেশিক রাজধানী লস্কর গাহ ছাড়া এই অঞ্চলের আর কোথাও আফগান সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই প্রদেশ ছিল আফগান পশতুন অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। ব্রিটিশরা ভালো মনেই এই কাজটি করতে গিয়েছিল হয়তো! যদিও তারা ইতিহাস সম্পর্কে জানত না এমন নয়।

আফগানদের ইতিহাস জেনেও তারা কেন এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে এক রহস্য হয়ে আছে এখনো। এর জন্য এখনো ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা সচিব জন রেইডকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করে দোষারোপ করা হয়। দাবি করা হয় যে তিনি বলেছিলেন- "আশা করি রাগের বসে একটা গুলিও ছোড়া হবে না।" আসলে তিনি বলেছিলেন, "আমরা দক্ষিণে এসেছি আফগান জনসাধারণকে সাহায্য করতে, তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে। আমরা চাই তারা তাদের গণতন্ত্র এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করুক। আশা করি আমরা তিন বছরের মধ্যেই ফিরে যেতে পারব এবং এই সময়ের মধ্যে একটি গুলিও ছোড়ার প্রয়োজন হবে না"। খুবই আশাবাদী কথা বটে, কিন্তু কতটুকু বাস্তবসম্মত?

সেই গ্রীষ্মে তিনি লন্ডনের পররাষ্ট্র দপ্তরে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেখানেও তিনি তার এই আশাবাদী বক্তব্য প্রচার করে গেছেন। প্রতিরক্ষা সচিবের সাথে আমার কথা হয়েছিল সেসময়। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "চিন্তা করো না টিম। আমরা তালিবানদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি ওখানকার মানুষকে রক্ষা করতে"। জবাবে আমি বলেছিলাম, "আপনিও একদমই চিন্তা করবেন না। তালিবানরা আপনাদের ওপর হামলা করবেই"।

এই কথোপকথন যখন হয়, তখনও আফগানিস্তানে "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা" করতে গিয়ে ৪৫০ জন ব্রিটিশ সৈন্যের মৃত্যু ঘটেনি। আমি এখনো ভেবে পাই না, ব্রিটিশ সরকার ঐ সময় আসলে কী ভাবছিল! তারা কি আসলে জনগণের মন যোগানোর জন্য এসব কথা বলেছিল, আর ভেতরে ভেতরে ঠিকই জানত যে কতটা কঠিন হবে এই অভিযান! নাকি তারা আসলেই এতটা নির্বোধ আশাবাদ ধারণ করতো মনের ভেতরে! তো তালিবানরা ব্রিটিশদের রক্ত ঝরাল, অ্যামেরিকানদের রক্ত ঝরাল, ন্যাটোকে রক্তাক্ত করল, এবং অপেক্ষা করতে লাগল ন্যাটোর প্রস্থানের জন্য। ১৩ বছর পর ন্যাটো ঠিকই চলে গেল।

আর এই পুরো সময়টাতেই পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা দু-মুখো নীতি অনুসরণ করেছিলেন। পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নীতি সমর্থন করছিল। কিন্তু তালিবানদের মতো পাকিস্তানও জানতো, একসময় না একসময় মার্কিনিদের চলে যেতেই হবে। আর যখন তারা চলে যাবে, তখন আফগানিস্তানে বন্ধু স্থানীয় সরকারই দরকার

হবে পাকিস্তানের। এজন্যই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও সরকারের কিছু অংশ তালেবানদের সমর্থন করা অব্যাহত রেখেছিল। ন্যাটোর পশ্চাদপসরণের পর অন্তত আফগানিস্তানের দক্ষিণ অংশ তালিবানদের হাতে চলে যাবে, আর সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য ইসলামাবাদের সাহায্য চাইবে কাবুল সরকার। এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই এই জুয়া খেলেছিল তারা।

পাকিস্তানের এই পরিকল্পনা গোপন থাকেনি। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের এই ছলচাতুরি প্রকাশ্যেই দৃশ্যমান হলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। দেখা গেল পাকিস্তান সরকারের নাকের ডগায় অ্যাবোটাবাদের সামরিক ঘাঁটিতে লুকিয়ে আছে আল কায়েদার প্রধান নেতা ওসামা বিন লাদেন। পাকিস্তানের সাথে মৈত্রী থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর একদমই বিশ্বাস রাখতে পারেনি। তাই তারা যখন লাদেনকে হত্যা করতে বিশেষ বাহিনী পাঠাল, সেটা তারা ইসলামাবাদকে জানায়নি। স্পষ্টতই এটা পাকিস্তানি সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন। এই পরিস্থিতি তাদের সামরিক বাহিনী এবং সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল । এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই পক্ষের মধ্যে যে বাকযুদ্ধ হলো, তাও ছিল যথেষ্ট অপমানজনক- "যদি বলো তোমরা লাদেনের অবস্থান জানতে না, তাহলে তোমরা একেবারেই অযোগ্য। আর যদি বলো তোমরা জানতে, তাহলে তো তোমাদেরকে লাদেনের সহযোগী বলেই ধরতে হবে"।

পাকিস্তানের সরকার অবশ্য এই দু-মুখো অবস্থানের কথা কখনোই স্বীকার করেনি। তাদের এই খেলার কারণে প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার পাকিস্তানি আর আফগান নাগরিক, প্রাণ হারিয়েছে কিছু মার্কিনিও। অ্যাবোটাবাদে অভিযানের পরেও ইসলামাবাদ এই বিষয়টা অস্বীকার করতে থাকে। কিন্তু এখন আর তাদেরকে তেমন কেউ বিশ্বাস করে না। গুরুত্ব হারিয়ে ফেলার পরেও যুক্তরাষ্ট্রের মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি লাদেনকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে পাকিস্তান। তাহলে আফগানিস্তান নিয়ে পাকিস্তানের পরিকল্পনার পক্ষে সহায়ক গোষ্ঠীগুলোকে যে তারা সহায়তা করবে, তা তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। মুশকিলটা হলো, ততদিনে পাকিস্তানেও এরকম গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেছে। আর তারা পাকিস্তানের মধ্যেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটে আর জটিল হয়ে উঠল।

আফগান তালিবানদের যেমন প্রভাব, আর যেভাবে তারা বাড়ছিল, তাতে পাকিস্তানে এমন কিছু হওয়াটা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। দুই দেশের তালিবানরাই ছিল প্রধানত পশতুন জনগোষ্ঠীর। অ-পশতুন কারো কর্তৃত্ব তারা মেনে নেবে না। ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশদের তারা মেনে নেয়নি। একবিংশ শতকের পাঞ্জাবি নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকেই বা তারা মানবে কেন!

এই ব্যাপারটা ইসলামাবাদ সবসময়ই বুঝেছে, মেনেও নিয়েছে। পাকিস্তান সরকার ভাবতে ভালোবাসত যে পুরো দেশের সব এলাকাকেই তারা একইভাবে শাসন করছে। পশতুনরাও বাইরে বাইরে দেখাত যে তারা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের এর পূর্ব পর্যন্ত এই লুকোচুরির খেলা ভালোভাবেই চলেছে। এরপর সব বদলে যায়। ২০০১ এর পর থেকে পাকিস্তানের পরিস্থিতি বেশ কঠিন হতে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে সাধারণ জনগণ মারা যেতে থাকে, আর কমতে থাকে বিদেশি বিনিয়োগ। সাধারণ মানুষ পড়ে যায় চরম দুর্বিপাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও বিপাকে পড়ে যায়। তারা তাদের এতদিনের মিত্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। সেই যুদ্ধে তাদের অন্তত ৫০০০ সেনা মারা যায়। একতা ভেঙে পড়ে এবং গৃহযুদ্ধ দানা বাঁধতে থাকে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জন্য পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে পড়ে যে, গোয়েন্দা তথ্য এবং তালিবানদের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রকে জানাতে বাধ্য হয় তারা। আর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাকিস্তানি তালিবানদের ওপর ড্রোন হামলা চালানো হয়। আর এই ড্রোন হামলার সময় মার্কিনিদের ভুলে নিহত হয় শত শত সাধারণ নাগরিক। ফলে পাকিস্তানকে নিন্দা জানানোর ভান করতে হয়, বলতে হয় যে এসব হামলা পাকিস্তানি সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন। বেশিরভাগ ড্রোন পাঠানো হয়েছে আফগানিস্তানের মার্কিন ঘাঁটি থেকে। তবে, কিছু ক্ষেত্রে পাকিস্তানে অবস্থিত গোপন ঘাঁটি থেকেও ড্রোন উড়েছে বলে ধারণা করা হয়। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে হামলার ব্যাপকতা বুশ প্রশাসনের তুলনায় ওবামা প্রশাসনের আমলে ছিল অনেক বেশি।

২০১৫ সালের বসন্তে পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়ে ওঠে। ন্যাটো আফগানিস্থান ছেড়ে চলে যায়। অ্যামেরিকাও তাদের আফগান মিশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অল্প কিছু সেনা মোতায়েন রাখা হয়েছিল বিশেষ পরিস্থিতির কথা বলে। আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয় বিশেষ অভিযান এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা। আর অনানুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত করতে চাইছিল কাবুল যেন তালিবানদের অধীনে চলে না যায়। ন্যাটোর অনুপস্থিতিতে আফগান সীমান্তে তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে রাখাটা পাকিস্তানের জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ওয়াশিংটন তখনও পাকিস্তানকে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। এর ফলে যেসব পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যায় তা হলো-

- ❖ পাকিস্তান তার পূর্ণশক্তির সামরিক বাহিনী নিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে হামলা চালিয়ে তালিবানদের পরাজিত করবে।
- ❖ তালিবানরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং পাকিস্তানে অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলবে, আর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ভেঙে যাবে।
- ❖ অ্যামেরিকা আগ্রহ হারিয়ে ফেলার পর ইসলামাবাদ তালিবানদের সাথে সন্ধি করে ফেলবে। পরিস্থিতি একসময় স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পাকিস্তান উত্তর-পশ্চিম দিকটা ছেড়ে দেবে, কিন্তু তাদের এজেন্ডা ছড়িয়ে দিতে থাকবে আফগানিস্তানে।

এই সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে প্রথমটা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আদিবাসী গোত্রগুলোকে এখন পর্যন্ত কোনো বিদেশি শক্তি পরাজিত করতে পারেনি। পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বালুচ আর কাশ্মীরীদের (এবং কিছু পশতুন) নিয়ে গঠিত পাকিস্তানি বাহিনী যখনই আফগানিস্তানের আদিবাসীদের এলাকার দিকে এগিয়ে যাবে, তখনই তারা বিদেশি শক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা বাস্তবে পরিণত হওয়ার সুযোগ ছিল। কারণ, অনেক সাবধান বাণী সত্ত্বেও কারো কথায় কান দেয়নি পাকিস্তান। কিন্তু ২০১৪ সালে তালিবানরা পেশোয়ারের একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে ১৩২ জন শিশুকে মেরে

ফেলল। তখন পাকিস্তান বুঝল, যে দানব তারা তৈরি করেছে, সে দানব যে কোনো দিন তাদের সর্বনাশ করে দিতে পারে।

এর ফলে ৩ নম্বর দৃশ্যপট বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেল। আফগানিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এমনিতে তেমন আগ্রহ নেই। তালিবানরা যদি আন্তর্জাতিক জিহাদিদেরকে আফগানিস্থানে জায়গা না দেয়, তাহলে আর তাদের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র মাথা ঘামাবে না, এই ব্যাপারে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দুই পক্ষ থেকেই আছে। আফগান তালিবানদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে পাকিস্তান, যেন কাবুল সরকার ভারতের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। যেন এই সুযোগে ভারত তাদের পেয়ে না বসে। ভারতকে সেই সুযোগ পাকিস্তান কিছুতেই দেবে না। আর পরিস্থিত স্বাভাবিক হয়ে আসলে পাকিস্তানি তালিবানদের সাথে চুক্তিতে আসবে পাকিস্তান সরকার।

আফগান তালিবানরা যদি বোকার মত ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদাকে আশ্রয় না দিত, তাহলে পরিস্থিতি এত ঘোলাটে হতোই না। এমনকি ৯/১১ এর হামলার পরে পশতুন আতিথেয়তার রেওয়াজ বজায় রাখতে গিয়ে আরো বেশি গন্ডগোল হয়ে যায়। মার্কিনিরা যখন চেয়েছিল, তখন তালিবানরা সেই অতিথিদেরকে তাদের হাতে তুলে দেয়নি। ফল হলো যুদ্ধ। আর ১৫ বছর ধরে যুদ্ধের পরেও মার্কিনিদের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে রইলো যে, আফগানিস্তান নিয়ে নীতি বদল করে পরিকল্পনার অতিরিক্ত হাজার হাজার সেনা সেখানে মোতায়েন রাখতে হলো।

এদিকে ভারত একইসাথে অনেককিছু সামলায়। সামলাতে তারা বাধ্য হয় বলা চলে। পাকিস্তানই তাদের মাথাব্যথার একমাত্র কারণ নয়। যদিও ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্তানই প্রথম এবং প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে পরমাণু অস্ত্রসমৃদ্ধ এমন একটা আগ্রাসী দেশ থাকলে তা হওয়ারই কথা। কিন্তু একই সাথে ভারতকে একশ ত্রিশ কোটি মানুষের অন্ন সংস্থান করতে হয়। তার ওপর আবার বৈশ্বিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার প্রচেষ্টাও জারি রাখতে হয়।

চীনের সাথে দ্বন্দ্বই ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতিনির্ধারকদের প্রধান মাথাব্যথা হতে পারত। কিন্তু চীন ও ভারতের মাঝখানে সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালা

থাকায় তা হয়নি। এই পর্বতমালা না থাকলে ইন্দো-চীন ইষদুষ্ণ সম্পর্ক ভীষণ জটিল আর শীতল হতো। ম্যাপের দিকে এক ঝলক তাকালে মনে হবে বিশাল দুইটি দেশ পাশাপাশি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেদুই দেশের সীমান্ত বরাবর প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বতমালা। সিআইএ ফ্যাক্টবুক অনুযায়ী এই পার্বত্য সীমান্তের দৈর্ঘ ১৬৫২ মাইল।

ভারত আর চীনের বিবাদমান বিষয়গুলোর মধ্যে একটা বড় ইস্যু হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে উঁচু জনবসতি, তিব্বত। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে চীন তিব্বতকে চায়। ভীষণভাবেই চায়। চীন কিছুতেই ভারতকে তিব্বতের দখল নিতে দেবে না। এমনকি তিব্বতকে স্বাধীন থাকতে দিতেও রাজি নয় তারা। কারণ স্বাধীন তিব্বত ভারতকে সামরিক ঘাঁটি বসানোর সুযোগ করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে উঁচু অঞ্চলের সামরিক সুবিধা পেয়ে যাবে ভারত।

চীন যখন তিব্বতকে অধিগ্রহণ করে ফেলল, ভারত তার জবাব দিল হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় দালাইলামাকে আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে। ফলে ধর্মশালা তিব্বত মুক্তি আন্দোলনেরও কেন্দ্র হয়ে উঠলো। এটা অনেকটা দীর্ঘমেয়াদের বীমা প্রকল্পের মতো। পরবর্তীতে কিছু ফেরত পাওয়ার আশা ছাড়াই ভারত কিস্তি প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিব্বতের স্বাধীনতা অসম্ভবই মনে হয়। তবে কয়েক দশকের মধ্যে কোনোভাবে যদি এই অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়, ভারত সে-সময় তিব্বতের সরকারকে মনে করিয়ে দেবে একসময় তারা কত সাহায্য করেছে! চীনও জানে যে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও ধর্মশালার ব্যাপারটা তারা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। এর জবাব তারা দিচ্ছে নেপালে। সেখানকার মাওবাদী কার্যক্রমে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে বেইজিং।

ভারত কোনোভাবেই নেপালে মাওবাদী কর্তৃত্ব চায় না। কারণ সেক্ষেত্রে নেপাল আসলে চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। বেইজিং যে টাকাকড়ি আর বাণিজ্যের মাধ্যমে নেপালে প্রভাব বিস্তার করছে, তা তারা জানে। এমনিতে মাওবাদী আন্দোলন নিয়ে চীনের আসলে তেমন মাথাব্যথা নেই। তবে তারা ভারতকে বার্তা দিতে চায় যে, তাদেরও ওরকম "দীর্ঘমেয়াদি বীমা প্রকল্প"তে

বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে। প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর দিকে ভারত যত বেশি মনোযোগ দেবে, চীনের ওপর থেকে মনোযোগ ততই কমবে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ নিয়েও চীনের সাথে দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি চলছে। চীন এই অঞ্চলটিকে দক্ষিণ তিব্বত হিসেবে দাবি করে। চীনের আত্মবিশ্বাস যতই বাড়ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে এই অঞ্চলে তাদের দাবিকৃত ভূমির পরিমাণ। আগে তারা অরুণাচলের একদম পশ্চিমে অবস্থিত তাওয়াং অঞ্চলকেই শুধু নিজের বলে দাবি করত। সময়ের সাথে সাথে তাদের দাবি বেড়ে চলেছে। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে গোটা প্রদেশকেই চীনের অংশ বলে দাবি করে তারা। অথচ অরুণাচলের ওপর ভারতের সার্বভৌমত্ব ১৯৫৫ সাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত। চীনের এই দাবি আংশিকভাবে ভৌগোলিক, আর আংশিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক। অরুণাচলের সাথে চীন, ভুটান ও বার্মার সীমান্ত আছে। ফলে এই অঞ্চলটা কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আবার, অরুণাচলের প্রতি এই দাবি দেখানো মানে পরোক্ষভাবে তিব্বতকে বলে দেওয়া যে- স্বাধীনতা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এই বার্তাটা ভারতও তার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যকে নিয়মিতভাবে দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। কোথাও তীব্রতা বেশি, কোথাও কম। কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেউই খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেনি। যেমন, পাকিস্তানি ও ভারতীয় অংশের পাঞ্জাব নিয়ে স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্র গড়ার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে শিখরা। এই আন্দোলন বর্তমানে স্তিমিত হয়ে থাকলেও, যে কোনো সময় বেগবান হয়ে উঠতে পারে। আসাম রাজ্যে একইসাথে বেশ কয়েকটা আন্দোলন চলছে। বোড়ো ভাষাভাষীরা নিজেদের আলাদা প্রদেশ চায়। মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন তো আসাম অঞ্চলে মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশই চায়। নাগাল্যান্ডের খ্রিস্টানরা নিজেদের আলাদা দেশের দাবিতে আন্দোলন করছে। সেখানকার ৭৫ শতাংশ জনগণই ব্যাপ্টিস্ট খ্রিস্টান। নাগাল্যান্ড ন্যাশনাল কাউন্সিল যে দাবিতে লড়াই করছে, তা পূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব। একই কথা অন্য সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্যও প্রযোজ্য।

ভারতে শিখদের সংখ্যা দুই কোটির বেশি। মুসলিমদের সংখ্যা তো আরো বেশি, ১৭ কোটি। এছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘুরা তো আছেই। এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সর্বভারতীয় ঐক্যের অনুভূতি ধারণ করে আছে ভারত। বিশ্বমঞ্চে পরাশক্তি হতে চাইলে এই ঐক্যটা খুব দরকার।

পৃথিবীবাসী চীনের উত্থান দেখছে বিস্মিত চোখে। চীন পরাশক্তি হওয়া নিয়ে এতটাই বুঁদ যে তার বিশাল প্রতিবেশী ভারতকে প্রায়শই উপেক্ষা করে যাচ্ছে। ভারত হয়তো এই শতাব্দীতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের সাথে পাল্লা দেওয়া শুরু করবে। ভারত বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটি দ্বিতীয় অবস্থানে আছে (অতি সম্প্রতি ভারত জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশে পরিণত হয়েছে)। ভারতের সাথে মোট ছয়টি দেশের সীমান্ত (আফগানিস্তানকে ধরলে সাতটি)। ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথের দৈর্ঘ্য ৯০০০ মাইল। এখানে আছে প্রচুর উর্বর জমি এবং সুপেয় জল। দেশটি পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষ কয়লা উৎপাদনকারী। তেল আর গ্যাসেরও প্রাচুর্য আছে। তবে সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার পরেও ভারতকে বাইরে থেকে জ্বালানি আমদানি করতে হয়। জ্বালানির পেছনে ভর্তুকি দেওয়াটা ভারতের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার পরেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে চীনের সমকক্ষ হতে পারেনি ভারত। চীন এখন বিশ্ববাজার দখল করার চেষ্টা করছে। আর ভারত সবে বিশ্ববাজারে স্থান তৈরি শুরু করেছে। হিমালয়ের কারণে আলাদা থাকা এই দুই দেশ এবার হয়তো মুখোমুখি হয়ে যাবে! তবে স্থলে নয়, সমুদ্রে। হাজার বছর ধরে পাশাপাশি থাকার পরেও চীন ও ভারত পরস্পরকে অগ্রাহ্য করে এসেছে তাদের মধ্যকার দূর্গম সীমানার কারণে। হিমালয় পেরিয়ে একে অপরের ভূখণ্ড দখল করতে যাওয়া ছিল অসম্ভব। আর তাছাড়া দুই দেশের হাতেই প্রচুর চাষযোগ্য জমি ছিল। তাই পাশের দেশে গিয়ে জমি দখলের প্রয়োজনও পড়েনি।

কিন্তু বর্তমানের এই প্রযুক্তিনির্ভরতার যুগে দুই দেশেরই প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি শক্তি প্রয়োজন হচ্ছে। দুই দেশেই কিছু প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এলাকা আছে, তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়। তাই

জ্বালানি শক্তির খোঁজে মহাসাগরে না বের হয়ে উপায় নেই। আর সেখানেই এই দুই শক্তি মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা।

পঁচিশ বছর আগে ভারত "পূর্বে তাকাও" নামক একটা নীতি হাতে নিয়েছিল। চীনের অবাধ উত্থানকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই এই নীতিতে চলা শুরু করে ভারত। তারা নাটকীয়ভাবে চীন থেকে প্রচুর আমদানি শুরু করে। পাশাপাশি চীনের লাগোয়া দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে থাকে। এর মধ্যেই তারা বার্মা, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডের সাথে জোরালো সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে। তবে এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ভিয়েতনাম আর জাপানের সাথে মিলে দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য কমানোর চেষ্টা করছে ভারত।

নতুন এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা পেয়েছে নতুন এক মিত্র, যুক্তরাষ্ট্র। দশকের পর দশক ধরে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। তারা মনে করত মার্কিনিদের মতলবটা ব্রিটিশদের মতোই। পার্থক্য শুধু এই যে- মার্কিনিদের ইংরেজি বলার ধরনটা একটু আলাদা, আর টাকা-পয়সাও ব্রিটিশদের চেয়ে বেশি। তবে, একবিংশ শতাব্দীর ভারত আগের চাইতে আত্মবিশ্বাসী, আর বিশ্বও এখন বহুমুখী। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাওয়ার কারণও আছে তাদের। ২০১৫ সালে যখন বারাক ওবামা ভারত সফরে এলেন, তখন ভারতের জাতীয় দিবসের মিলিটারি প্যারেডে রাশিয়ান ট্যাংকগুলোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সি-১৩০ হারকিউলিস এবং সি-১৭ গ্লোবমাস্টার এয়ারক্রাফটও প্রদর্শন করা হলো। ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র- এই দুই বৃহৎ গণতন্ত্র ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছাকাছি আসছে।

ভারতের আছে উন্নত অস্ত্রসজ্জিত বিশাল একটি আধুনিক নৌবাহিনী। এতে আছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারও। কিন্তু চীন বর্তমানে বিশাল এবং শক্তিশালী গভীর সাগরের নৌবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা আঁটছে, যার সাথে পেরে ওঠা ভারতের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। এজন্য ভারত মৈত্রীজোট গঠনের দিকে নজর দিয়েছে। চীনের নৌবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে না পারলেও অন্তত একজোট হয়ে শক্তির জানান যেন দেওয়া যায়, এটাই তাদের লক্ষ্য। চীন সাগর থেকে মালাক্কা প্রণালি এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারতের

নাকের ডগায় আরব সাগরের উপকূলে পাকিস্তানের গোয়েদারে অবস্থিত বন্দরে চৈনিক নৌবাহিনীর যাত্রাপথ যেন সুগম না থাকে, তা নিশ্চিত করতে চায় ভারত।

তবে চীনের সাথে ভারতের এইসব সমীকরণ এই উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতিতে মুখ্য নয়। এই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক রাজনৈতিক সমীকরণ খুব সোজাসাপ্টা। ভারতের ক্ষেত্রে ঘুরেফিরে সবই পাকিস্তানমুখী, আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভারতমুখী।

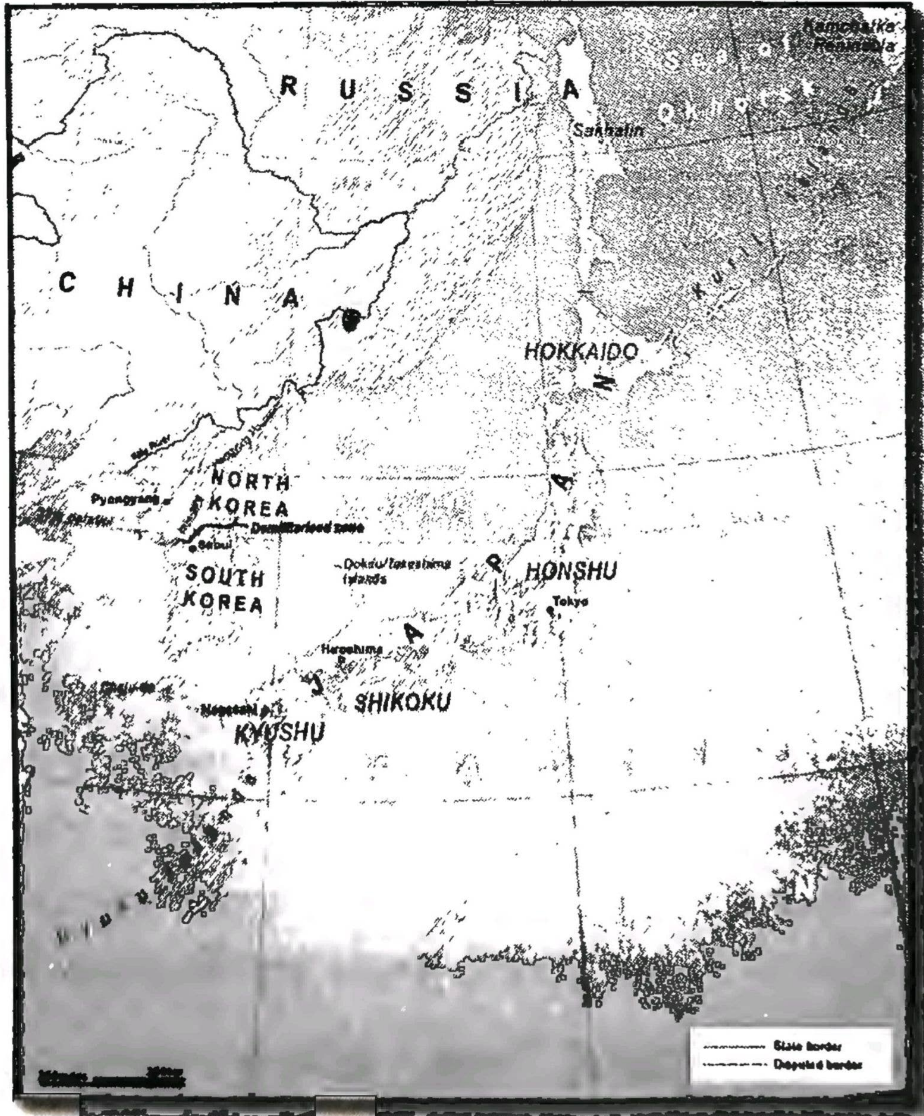
অধ্যায় আট



কোরিয়া এবং জাপান

"আমি কিম জং ইলকে নিয়ে একটু মশকরা করার চেষ্টা করেছিলাম "ওহ প্রিয় নেতা" বলে, কিন্তু তা আমার মুখেই আটকে গেল"।

- ক্রিস্টোফার হিচেন্স, লাভ পোয়েট্রি এন্ড ওয়ার: জার্নিস এন্ড এসেস।





কোরিয়া এবং জাপান

কোরিয়া সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়? এই সমস্যার আসলে কোনো সমাধান হয় না। কোনোভাবে সামাল দিতে হয়। পৃথিবীতে তো আরো অনেক জায়গায় অনেক রকম সমস্যা চলছে। সেসব এলাকাতেই বরং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়াটা জরুরি। মালয়েশিয়া থেকে রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্টক বন্দর পর্যন্ত সকলেই সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছে উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়ার সংকট। আশেপাশের সব দেশই জানে, এখানে বড় কোনো ঝামেলা হলে তারাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই দুই দেশের যুদ্ধে বাকি দেশগুলোকেও জড়িয়ে পড়তে হবে এবং সবার অর্থনীতিই পড়ে যাবে বেকায়দায়। চীনারা উত্তর কোরিয়ার পক্ষে লড়াই করতে চায় না। আবার দুই কোরিয়া একত্রিত হয়ে তাদের নাকের ডগায় যুক্তরাষ্ট্রকে বন্দর তৈরির জায়গা করে দেবে, তাই বা তারা কীভাবে মানবে! যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করতে অনাগ্রহী। কিন্তু এতদিনের এত ভালো বন্ধুকে বিসর্জন দিলে বাকিরা কী ভাববে! অন্যদিকে জাপানের সাথে কোরিয়ার সম্পর্ক পুরোনো। ঐতিহাসিকভাবে কোরিয়ান উপদ্বীপের সাথে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হলে তাদেরকেও সতর্ক হয়ে চলতে হবে। কারণ, জাপান জানে, কোরিয়াতে যাই ঘটুক না কেন তাতে তারা জড়িয়ে যাবেই।

আপোস ছাড়া দুই কোরিয়ার এই দ্বন্দ্বের কোনো সমাধান নেই। আপোসের ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার সামান্য হলেও আগ্রহ আছে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার নেতাদের মধ্যে এই ব্যাপারে ন্যূনতম কোনো আগ্রহ নেই। এই জটিল ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, কেউ জানে না। সমাধানটি যেন আসি আসি করেও দিগন্তে এসেই মিলিয়ে যায়।

কোরিয়ার প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবার ভেতরের সম্পর্কের টানাপোড়েনের বেশ খানিকটা মিল আছে। কিউবা এবং যুক্তরাষ্ট্র এক সময়ের

ঘোরতর প্রতিপক্ষ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসে বেশ কয়েক বছর ধরে তারা একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল। যে কোনো ধরনের বিরোধ এড়িয়ে একটা সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্ব চাইছিল দুই পক্ষই। এর ফলে ২০১৫ সালে কিউবা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উত্তর কোরিয়া এই ধরনের কূটনৈতিক বোলচালের মধ্যে নেই। দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে এমন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব এলে উত্তর কোরিয়া মুখের ওপর না করে দেয়।

উত্তর কোরিয়া একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। ২.৫ কোটি মানুষের এই দেশটিকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা চলে। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া একটা নীতি-নৈতিকতাহীন তথাকথিত কমিউনিস্ট রাজতন্ত্র বসে আছে দেশটির চালকের আসনে। তারা চীনের কাছ থেকে সমর্থন পায়। আবার চীন যে খুব ভালোবেসে তাদের সমর্থন দিচ্ছে, বিষয়টা এমন না। তাদের সমর্থনের অন্যতম কারণ হচ্ছে উত্তর কোরিয়া থেকে ইয়ালু নদী পার হয়ে দলে দলে উদ্বাস্তু যেন চীনে পাড়ি না জমায়।

অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হলে উত্তর কোরিয়া কী মতলব ফেঁদে বসে, যুক্তরাষ্ট্র তা নিয়ে শঙ্কিত। উত্তর কোরিয়ার পাগলাটে সরকার সুযোগ পেলেই নতুন কোনো অভিযানের পরিকল্পনা আঁটতে পারে। তাই দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় ৩০,০০০ সদস্যের বাহিনী মোতায়েন রাখতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে। দক্ষিণ কোরিয়া চায় না দুই কোরিয়া এক হোক। দুই কোরিয়া এক হলে তাদের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হবে। এই কারণে একীভূত হওয়ার ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো পদক্ষেপ নেই।

পূর্ব এশিয়ার রঙ্গমঞ্চের কুশীলবেরা সবাই জানে যে পরিস্থিতিটা অসম্ভব জটিল। ভুল সময়ে যদি জোর করে কোনো সমস্যা সমাধান করতে চাওয়া হয়, তা আরো জটিল রূপ নিতে পারে। এতে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার বদলে আরো অবনতি হবে। এমনকি পরিস্থিতি ঘোরতর সঙিন হয়ে যেতে পারে। দুই রাজধানী বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া, গৃহযুদ্ধ দানা বাঁধা বা মানবিক বিপর্যয় শুরু হয়ে যাওয়ার ভয় একেবারে অমূলক নয়। কোরিয়া থেকে ছোড়া মিসাইল টোকিওর আশেপাশেও পড়তে পারে। কোরিয়ান উপদ্বীপে চৈনিক আর মার্কিনিরা হয়তো

মুখোমুখি হয়ে যাবে আবারও। তার ওপর আবার একপক্ষের হাতে আছে পরমাণু অস্ত্র। এমনকি উত্তর কোরিয়া যদি হার মেনেও নেয়, সেটা তৈরি করবে নতুন সমস্যার। আশেপাশের দেশগুলোর সীমানা জুড়ে নামবে উদ্বাস্তুর ঢল। যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়তে পারে গোটা অঞ্চলে। এই অঞ্চলের প্রতিটা দেশকেই তখন ভুগতে হবে। এসব ভেবে কেউই কোনো পদক্ষেপ নিতে চায় না। সমাধানের ভার সবাই ছেড়ে রাখতে চায় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে। এভাবেই চলছে এই অঞ্চলের রাজনীতি।

এমনকি বিশ্বনেতারাও উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য পতন নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেন না। কারণ এই কাজ করা মানে আশেপাশের দেশগুলোর আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার পতনের সম্ভাবনাকে আরও ত্বরান্বিত করা। আর যেহেতু কেউই তা করতে চাইছেন না, তাই এই বিষয় নিয়ে চুপ থাকাই ভালো। আবার এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা না করলেও সমস্যাটা যুগ যুগ ধরে রয়ে যাবে। এ যেন শাঁখের করাত!

কূটনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য উত্তর কোরিয়া দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষ্যাপাটে আচরণ করছে। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়া একটি ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের মত হুমকি ধামকি দিয়ে চলে। তাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চীন বাদে বাকি সবাইকে সন্দেহ করা। তবে চীনকেও যে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে তা বলা যায় না। অথচ উত্তর কোরিয়ার বাণিজ্য পুরোপুরি চীনের ওপর নির্ভরশীল। ২০১৪ সালের হিসাব অনুসারে তাদের আমদানির ৮৪.১২ শতাংশই আসে চীন থেকে, আর রপ্তানির ৮৪.৪৮ ভাগও চীনেই যায়। বাইরের বিশ্ব যেন একত্রিত হয়ে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে না পারে এজন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় উত্তর কোরিয়া। এমন কী চীনও তাদের এই পরিকল্পনার বাইরে নয়। নিজের দেশে কার্যত বন্দি হয়ে থাকা জনসাধারণের কাছে দেশকে একটি শক্তিশালী, ধনী এবং অসামান্য রাষ্ট্র হিসেবে প্রচার করে উত্তর কোরিয়ার সরকার। শয়তান বিদেশিদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে তারা প্রস্তুত বলেও তারা প্রচার করে। দেশের নাম তারা রেখেছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কোরিয়া (ডিপিআরকে)। তাদের রাজনৈতিক মতবাদটাকে বেশ অনন্যই বলা যায়। তারা একে বলে 'জুকে'। উগ্র

জাতীয়তাবাদের সাথে কমিউনিজম এবং জাতীয় স্বনির্ভরতার খিচুড়ি পাকিয়ে এই মতবাদ তৈরি করা হয়েছে।

নামে গণতান্ত্রিক হলেও তারা পৃথিবীর সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক দেশ। রাষ্ট্রক্ষমতায় জনগণের কোনো অংশীদারিত্বই নেই এখানে। এমনকি এটি কোনো প্রজাতন্ত্রও না। উত্তর কোরিয়া মূলত একটি পরিবারতান্ত্রিক দেশ। একটি রাজনৈতিক দল এবং একটি পরিবারই বংশানুক্রমিকভাবে দেশটিতে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। একনায়কতন্ত্রের সব লক্ষণ একদম দাঁড়ি-কমাসহ হুবহু মিলে যাবে দেশটির সাথে। যাকে তাকে যখন তখন গ্রেফতার, নির্যাতন, প্রহসনের বিচার, বন্দি শিবির, সেন্সরশিপ, দুর্নীতিসহ সব মিলিয়ে তারা এখানে একটা ভয়ের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। একবিংশ শতকের আধুনিক পৃথিবীর সাথে উত্তর কোরিয়ার কোনো মিল নেই। এই দেশের জনগণ যেন এক সমান্তরাল অলীক বাস্তবতায় বসবাস করছে। উত্তর কোরিয়ার ভেতরের খবর জানা খুব কঠিন। স্যাটেলাইট ইমেজ এবং যারা উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে তাদের বরাতে জানা যায় যে- উত্তর কোরিয়ায় অন্তত ১,৫০,০০০ রাজনৈতিক বন্দি আছে। "পুনঃশিক্ষা" শিবিরে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয় তাদেরকে। পৃথিবীর বিবেকের বুকে উত্তর কোরিয়া একটা ক্ষতচিহ্ন যেন। পরিস্থিতি আসলে ঠিক কতটা ভয়াবহ তার পুরোটা এখনো জানে না পৃথিবীবাসী, জানার উপায়ও নেই।

উচ্চপদস্থ কারো প্রতি নাখোশ হলে তাকে এন্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া বা একপাল ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়ার যে গল্পগুলো প্রচলিত আছে, সেসব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে দেশবাসীর ওপর যে বিভীষিকা কায়েম করে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। স্বৈরাচারী শাসন মানেই কথায় কথায় মারধর, নির্যাতন, বন্দি শিবির এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড।

উত্তর কোরিয়া সাফল্যের সাথে নিজেদেরকে পুরো বিশ্ব থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই দেশের সম্পর্কে সকল জ্ঞানই সরকারের নিয়ন্ত্রণে। মানুষ তাদের দেশ, শাসনপদ্ধতি বা নেতাদের সম্পর্কে কী ভাবে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন আছে কি নেই, তাও জানা সম্ভব

না। শুধু অনুমান করা সম্ভব। উত্তর কোরিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে যাওয়াটাকে তুলনা করা যায় গাঢ় সানগ্লাস পরে অস্বচ্ছ জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর সাথে।

কোরিয়া কীভাবে গঠিত হয়েছিল সেটার প্রচলিত গল্পটা এমন: খ্রিস্টপূর্ব ২৩৩৩ সালে স্বর্গ থেকেই এই অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। স্বর্গের সম্রাট তার সন্তান হুয়ানুংকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখানে গিয়ে পায়েকতু বা বায়েকদু পর্বতে বসতি গড়েন এবং এক নারীকে বিয়ে করেন। এই নারী আগে ছিল একটি ভালুক। তাদের সন্তান ডাংগুন দেশ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। এই পৌরাণিক ঘটনার বিবরণসমৃদ্ধ সবচেয়ে পুরনো গ্রন্থ পাওয়া গেছে ত্রয়োদশ শতকে। একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কীভাবে পারিবারিক একনায়কতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তার খানিকটা ব্যাখ্যা এই কাহিনি থেকে পাওয়া সম্ভব। পরিবারটির ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উদাহরণ চান? প্রয়াত নেতা কিম জং ইলকে পিয়ং ইয়ংয়ের প্রোপাগান্ডা মেশিন কীভাবে উপস্থাপন করে, সেটা জানলেই হবে। তাদের ভাষায় "আমাদের প্রিয় নেতা হলেন একজন উপযুক্ত অবতার। একজন নেতার যেমন হওয়ার কথা, তিনি ঠিক তেমনই।" তাকে আরো বলা হয়, "দিকনির্দেশকারী সূর্যের রশ্মি", "পায়েকতু পর্বতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র", "একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বনেতা" এবং "স্বর্গ থেকে আগত মহান পুরুষ"। এছাড়া তার "উষ্ণ প্রেম প্রদানকারী বক্ষ" নিয়েও স্তুতির কোনো সীমা নেই। তার বাবারও এমন অনেক উপাধি ছিল, তার সন্তানও বর্তমানে এমন অনেক স্তুতিবাক্য ধারণ করছেন।

ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা এই বচনগুলোকে জনগণ কীভাবে নেয়? এমনকি বিশেষজ্ঞরাও তা সঠিকভাবে বলতে পারবেন না। ২০১১ সালে কিম জং ইল মারা যাওয়ার পরে তার শেষকৃত্যের ফুটেজে জনগণকে উন্মাদের মতো শোক প্রকাশ করতে দেখা গেছে। তবে, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথম কয়েক সারির পর শোকপ্রকাশ স্তিমিত হয়ে আসছে। তাহলে প্রথম সারির জনগণের এত শোকপ্রকাশের কারণ কী? ক্যামেরায় মূলত তাদেরকেই দেখাবে, এই জন্য? নাকি সঠিকভাবে শোক প্রকাশ করতে না পারলে খারাপ পরিণতির আশঙ্কায় এমন করছিল তারা? নাকি, পার্টির সবচেয়ে অনুগত

মানুষদেরই প্রথমে রাখা হয়েছিল? এমন কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে তারা আসলেই শোকসন্তপ্ত সাধারণ মানুষ? উত্তর কোরিয়ায় সে-সময় যে ধরনের "শোকবিধূর" পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল, যুক্তরাজ্যে প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর পর সেরকমটা দেখা গেছে। এসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই।

উত্তর কোরিয়া সবসময়ই কমবেশি ক্ষ্যাপাটে আচরণ করে। এটা আসলে এক ধরনের কৌশল। এই কৌশল তারা কেন অবলম্বন করছে, তার উত্তর লুকিয়ে আছে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানে। কোরিয়া সবসময় চীন এবং জাপান নামক দুই শক্তিশালী দেশের মাঝখানে থেকেছে।

অষ্টাদশ শতকে তারা "সন্ন্যাসী সাম্রাজ্য (Hermit Kingdom)" নামে পরিচিতি পায়। কারণ, সে সময় তারা বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করত। এই বিচ্ছিন্নতার প্রচেষ্টার পিছনে কারণও আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা বাইরের দেশের আগ্রাসন, দখল ও লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে। কখনো কখনো তাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে অন্য কোথাও যাওয়ার পথ হিসেবে। উত্তর থেকে যারা আসবে, ইয়ালু নদী অতিক্রম করতে পারলেই সাগর পর্যন্ত আর কোনো প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। আবার সমুদ্রপথে আসলে বিপরীত দিকেও একই অবস্থা। মঙ্গোলরা এভাবেই এসেছে আর গিয়েছে। চাইনিজ মিং সাম্রাজ্য, মাঞ্চুরিয়া আর জাপানও এমনটা করেছে বেশ কয়েকবার। এসব কারণে দেশটি কিছু সময়ের জন্য সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চেয়েছে। এমন কি তারা বাইরের বিশ্বের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের কার্যক্রমও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল, যেন কেউ নজর না দেয় তাদের ওপর।

তবে তাতে লাভ হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে জাপান সেখানে ফিরে আসে প্রবল পরাক্রমে। ১৯১০ সালে তারা পুরো দেশটাই দখল করে নেয়। পরবর্তীতে তারা ব্যাপক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। কোরিয়ান ভাষাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কোরিয়ান ইতিহাস পড়ানোও নিষিদ্ধ করা হয়। "শিনতো" মন্দিরে উপাসনা বাধ্যতামূলক করা হয়। কয়েক দশকব্যাপী চালানো এই আগ্রাসনের ছাপ এখনো রয়ে গেছে কোরিয়া আর জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর কোরিয়াকে ৩৮তম অক্ষরেখা বরাবর বিভক্ত করা হয়। এর উত্তর অংশে ছিল কমিউনিস্ট শাসন। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরে কমিউনিস্ট চীন এর কর্তৃত্ব নেয়। আর দক্ষিণ অংশটিতে ছিল মার্কিনপন্থী একনায়কতন্ত্র। এই অংশটির নাম ছিল রিপাবলিক অফ কোরিয়া। এই সময় থেকেই শুরু হয় একটা শীতল যুদ্ধ। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য তখন লড়াই চলছিল। দুই পক্ষই চাইছিল অন্যকে পুরোপুরিভাবে উৎখাত করে বিশ্বের বুকে নিজেদের উপস্থিতি জোরালো করতে।

৩৮তম সমান্তরাল রেখা অনুযায়ী দুই দেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তটা একেবারেই সঠিক ছিল না। এর ফলে নানারকম জটিলতা এবং দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। অ্যামেরিকান ইতিহাসবিদ ডন ওবারডারফার তো এই বিভক্তিকে একদমই ফালতু বলে অভিহিত করেন। তার মতে, ১৯৪৫ সালের ১০ আগস্টে জাপানের আত্মসমর্পণ নিয়ে ওয়াশিংটন এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, কোরিয়া নিয়ে তাদের সত্যিকারের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সোভিয়েত সেনারা যখন উপদ্বীপের উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে, হোয়াইট হাউজে তখন রাতভর চলছে জাপান নিয়ে অতি জরুরি মিটিং। সে সময় দুইজন জুনিয়র অফিসার তড়িঘড়ি করে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটা ম্যাপ নিয়ে বসে, ৩৮তম অক্ষরেখা বরাবর একটা জায়গায় সোভিয়েত বাহিনীকে থেমে যেতে বললেন। এর পিছনে তারা যুক্তি দেখালেন যে এই রেখা বরাবর দেশটা একদম আড়াআড়ি দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই অফিসারদের একজন ছিলেন ডিন রাস্ক। তিনি পরবর্তীকালে কোরিয়ান যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অধীনে সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনো কোরিয়ান বা কোনো কোরিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন না। ঐ সময় বিজ্ঞ কেউ থাকলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বা সে সময়ের সেক্রেটারি অব স্টেট জেমস ফ্রান্সিস বাইরনেসকে বলতে পারতেন যে, এই রেখাটি নিয়ে এর আগেও বিবাদ ছিল। ১৯০৪-৫ সালে সংঘটিত রুশ-জাপান যুদ্ধের পর তাদের মধ্যে আলোচনা হয় এই জায়গাটি নিয়ে। অর্ধ শতাব্দী আগের সেই আলোচনায় তারা নির্ধারণ করতে চেয়েছিল,

এই এলাকায় কার কতটা প্রভাব থাকবে। মস্কোর কোনো ধারণাই ছিল না যে যুক্তরাষ্ট্র এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিছুই না ভেবে, একদম হুট করে। ফলে তারা ধরে নেয় যে, কোরিয়ার এই বিভক্তি যুক্তরাষ্ট্রই চাইছে এবং উত্তরে কমিউনিস্ট শাসন তারা নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। কোরিয়া ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেল। শুরু হলো সমাধানের অযোগ্য এক বিবাদ।

সোভিয়েতরা ১৯৪৮ সালে উত্তর কোরিয়া থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রও দক্ষিণ থেকে বাহিনী সরিয়ে নেয়। এরপর ১৯৫০-এর জুনে উত্তর কোরিয়া এক কাণ্ড করে বসে। কোল্ড ওয়ারকে মাথায় রেখে নেওয়া মার্কিন কৌশলকে তারা মার্কিনিদের দুর্বলতা ভেবে বসে। আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করে। উপদ্বীপটিকে একীভূত করে কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে নিয়ে আসাই ছিল তাদের লক্ষ্য। উত্তরের বাহিনী পৌঁছে যায় দক্ষিণের উপকূল পর্যন্ত। ওয়াশিংটনের দফতরে বেজে ওঠে বিপদঘণ্টা।

উত্তর কোরিয়া আর তাদের মদদদাতা চীন ভেবেছিল সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোরিয়ার তেমন একটা গুরুত্ব নেই। তাদেরকে খুব ভুল বলা যায় না এক্ষেত্রে। কিন্তু একটা বিষয় তারা বুঝতে ভুল করেছিল। তা হলো, অ্যামেরিকা যদি তাদের মিত্র দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে না দাঁড়ায়, তাহলে অন্যান্য মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাবে। কোল্ড ওয়ারের এই কঠিন সময়ে যদি তারা সমর্থন প্রত্যাহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে চলে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পুরো বৈশ্বিক কৌশলই গড়বড় হয়ে যাবে। পূর্ব এশিয়া আর পূর্ব ইউরোপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। নীতি অনুযায়ী- পোল্যান্ডসহ অন্যান্য বাল্টিক দেশ, পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন, জাপান এবং অন্য দেশগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে রাশিয়া বা চীনের সাথে যে কোনো ঝামেলায় যুক্তরাষ্ট্র তাদের পাশে থাকবে।

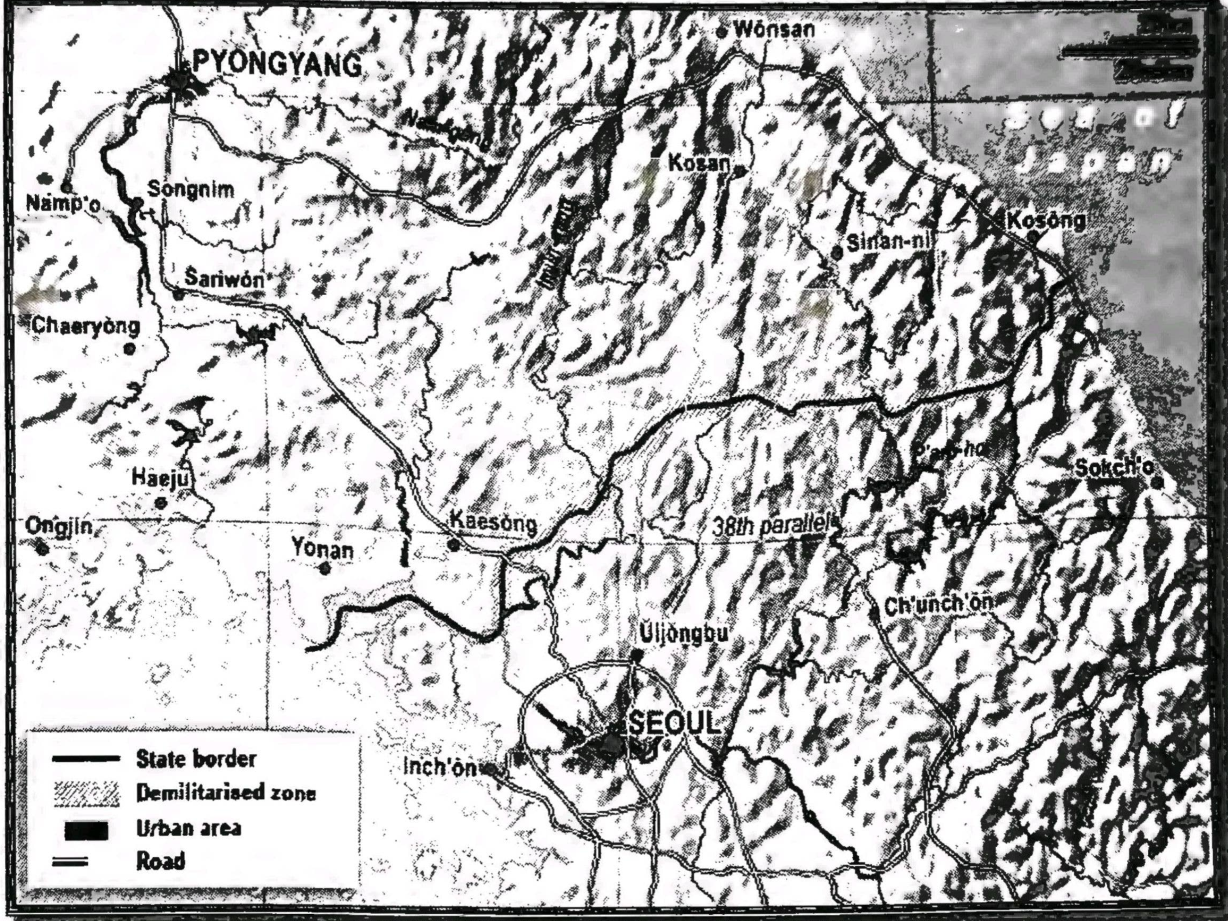
১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জাতিসংঘের বাহিনী এসে পৌঁছায় কোরিয়া উপকূলে। উত্তর কোরিয়ার বাহিনীকে পিছু হটিয়ে ৩৮তম অক্ষরেখার ওপারে পাঠিয়ে একেবারে ইয়ালু নদীর পাড়ে চীনের সীমানায় নিয়ে

দাঁড় করায়। এইবার বেইজিং-এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। উপদ্বীপে মার্কিন সেনা উপস্থিতি থাকা আর বিভাজনরেখা পার হয়ে মার্কিন বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। মার্কিন বাহিনী হ্যামহাং পার হয়ে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে চীনের দুরত্ব খুব বেশি নয়। ফলে, চাইনিজ সৈন্যরাও ইয়ালু নদী পার হয়ে এগুতে থাকে, শুরু হয় কোরিয়ার যুদ্ধ। ৩৬ মাস ধরে চলা প্রচণ্ড যুদ্ধে দুই পক্ষই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মারা যায় অসংখ্য মানুষ। শেষ পর্যন্ত বর্তমান সীমান্তের কাছে এসে থামে উভয়পক্ষ। উভয়পক্ষই যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এত ভয়াবহ যুদ্ধের পরেও দুই দেশের মধ্যে কোনো চুক্তি হয়নি, শুধু যুদ্ধবিরতি চলছে। এরপর থেকে দুই পক্ষই ৩৮তম রেখার দুই পাশে অবিচলভাবে রয়ে গেছে।

এই উপদ্বীপের ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে তেমন কোনো জটিলতা নেই। ভূগোলের দিকে তাকালেই বুঝা যায় উত্তর আর দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বিভাজন কতটা কৃত্রিম। তবে নিতান্তই বিভাজন করতে চাইলে, পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝে এক ধরনের বিভাজন আছে বলা যায়। এই উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল অনেকটাই সমতল, আর এদিকেই অধিকাংশ মানুষের বাস। পূর্বাঞ্চলের উত্তর অংশে আছে হ্যামগিয়ং পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণে নিচু এলাকা। দুই কোরিয়ার মাঝে আছে একটি সামরিক শক্তিমুক্ত অঞ্চল বা Demiltarized Zone (DMZ)। DMZ এর মাধ্যমেই কোরিয়াকে দুইভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছে। এখানে প্রবাহিত হচ্ছে ইমজিন-গ্যাং নদী। প্রাকৃতিক সীমানা হিসেবে এই নদীটা মোটেও উপযুক্ত না। অবিভাজিত ভৌগোলিক একটা স্থানে প্রবহমান একটা নদী বলা চলে একে।

দুই কোরিয়া এখনো যুদ্ধের মধ্যেই আছে বলা যায়। এই বিবদমান পরিস্থিতিতে বড় ধরনের যুদ্ধ বেধে যেতে কয়েক রাউন্ড ভারী গোলাবর্ষণই যথেষ্ট। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া- এই তিনটি দেশই উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার আরো কারণ আছে। এমনিতে, পরমাণু অস্ত্রের আকৃতি কমিয়ে এনে তা মিসাইল ওয়ারহেড হিসেবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উত্তর কোরিয়ার সাফল্য এখনো অনিশ্চিত। কিন্তু প্রথাগত আক্রমণ করার সামর্থ্য তাদের আছে নিশ্চিতভাবেই।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহরটি ৩৮তম অক্ষরেখা থেকে থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণ কোরিয়ার ৫০ মিলিয়ন নাগরিকের অর্ধেকেই বাস করে বৃহত্তর সিউল অঞ্চলে। দেশটির বেশিরভাগ কলকারখানা এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র এই অঞ্চলে অবস্থিত বলেই চিন্তাটা আরো বেশি। আর এই সবকিছুই আছে উত্তর কোরিয়ান আর্টিলারির নাগালের মধ্যে।



চিত্র- সিউল এবং আশেপাশের নগরাঞ্চল উত্তর কোরিয়ার সীমান্তের খুব কাছাকাছি হওয়াটা দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য চিন্তার বিষয়। যে কোনো মুহূর্তে আচমকা আঘাত আসতে পারে উত্তর কোরিয়া থেকে। অপরদিকে উত্তর কোরিয়ার রাজধানী সীমান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত।

১৪৮ মাইল দীর্ঘ DMZ -এর উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় প্রায় ১০,০০০ কামান মোতায়েন করে রেখেছে উত্তর কোরিয়া। এর বেশিরভাগই গুহা এবং সুরক্ষিত বাংকারের মধ্যে বেশ পোক্তভাবে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কামানের গোলা সিউল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। বাকিগুলো থেকে রাজধানীর কেন্দ্র হেফাজতে থাকলেও বৃহত্তর সিউল অঞ্চল এই কামানগুলোর রেঞ্জের

মধ্যেই। দক্ষিণ কোরিয়া আর যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত বাহিনী দুই/তিন দিনের ভেতরেই এসবের অধিকাংশই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সিউলের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যাবে। সিউলের মতো একটা জনবহুল এলাকায় যদি একসাথে ১০,০০০ গোলা এসে পড়ে, তাহলে কী যে হবে তা ভাবাও যায় না! আর যদি তারা ১০/১২ বারও গোলা ছোঁড়ার সুযোগ পায়, একেবারে ধ্বংসযজ্ঞ হয়ে যাবে। ভিক্টর চা এবং ডেভিড চ্যাং নামে উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে দুইজন বিশেষজ্ঞ ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখালেখি করেন। তাঁদের হিসাব মতে, আক্রমণের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যেই ৫ লক্ষ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করতে সক্ষম উত্তর কোরিয়া। সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে অনেক বড়। কিন্তু আমরা যদি কমিয়ে এর পাঁচ ভাগের একভাগও ধরি তাতেও ফলাফল হবে বিধ্বংসী। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারকে তখন একটা বিশাল এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাতে হবে। একদিকে দক্ষিণ বরাবর ছুটতে থাকা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের বিশৃংখলা সামলাতে হবে। অপরদিকে সীমান্তে মোতায়েন করা সেনাসংখ্যাও বাড়াতে হবে।

সীমান্তরেখার উত্তরের পাহাড়গুলো এতটা উঁচু নয়। তার ওপর এই পাহাড়ি এলাকা আর সিউলের মাঝখানে আছে যথেষ্ট পরিমাণে সমতল ভূমি। তাই উত্তর কোরিয়া যদি হঠাৎ আক্রমণ করেই বসে, তাহলে সিউলের দিকে খুব দ্রুতই এগিয়ে যেতে পারবে। সাধারণ বাহিনী ছাড়াও তাদের আছে বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনী, যারা ভূগর্ভস্থ টানেল ধরে এগিয়ে যেতে সক্ষম। দক্ষিণ কোরিয়া মনে করে, উত্তর কোরিয়ানরা ইতোমধ্যেই এরকম টানেল বানিয়ে রেখেছে। যুদ্ধ লাগলে উত্তর কোরিয়া সাবমেরিন নিয়ে দক্ষিণ উপকূলে এসেও সেনা নামাতে পারে। এছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণ মানুষের ভেতরে লুকিয়ে আছে অনেক উত্তর কোরিয়ান গুপ্তচর। যুদ্ধের সময় তারাও কাজে নেমে পড়বে। উত্তর কোরিয়ার বিশেষ বাহিনীতে প্রায় এক লাখ দক্ষ সেনা আছে বলে ধারণা করা হয়।

উত্তর কোরিয়া ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকবার জাপান সাগর পার করে প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যালিস্টিক মিসাইল পাঠিয়েছে। যে পথে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে, তা জাপানের সীমানার মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ, টোকিও যে তাদের

ব্যালাস্টিক মিসাইলের নাগালের মধ্যে, তা এখন প্রমাণিত। উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনীকে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ সামরিক বাহিনী হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বাহিনীতে দশ লক্ষ প্রশিক্ষিত নিয়মিত সদস্য আছে। এমনকি তাদের দক্ষতায় যদি ঘাটতিও থাকে প্রতিরক্ষা বর্ম হিসেবে তাদের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ নেবে। চীনের সামরিক বাহিনীও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ইয়ালু নদীর দিকে এগোতে থাকবে। রাশিয়া আর জাপান উদ্বিগ্ন হয়ে সব দেখতে থাকবে। তাদের কেউই এই দুই দেশের মধ্যে বড় আর কোনো যুদ্ধ চায় না। এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কেমন হতে পারে, তা আগেই দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও যুদ্ধ রুখে দেওয়া যায়নি। ১৯৫০ সালে যখন উত্তর কোরিয়া ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করে, তখন তিন বছর ধরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মারা যায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ। এই আধুনিক সময়ে এসেও যদি সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে ক্ষয়-ক্ষতি হবে আরো ভয়াবহ। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি উত্তর কোরিয়ার চেয়ে ৮০ গুণ বড়, আর জনসংখ্যাও উত্তর কোরিয়ার দ্বিগুণ। চীন হস্তক্ষেপ না করলে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সম্মিলিত আক্রমণ রুখে দেওয়া উত্তর কোরিয়ার জন্য কঠিন হবে।

কিন্তু তারপর কী হবে? এরকম পরিস্থিতি হলে কী করা হবে তা নিয়ে তেমন কোনো পরিকল্পনা আসলে কেউই করেনি। এমন পরিস্থিতির ফলাফল কী হবে, তা কম্পিউটার মডেলিংয়ের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করেছিল দক্ষিণ কোরিয়া। কিন্তু, এটা সবাই জানে যে বাস্তবে পরিস্থিতি হবে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। যে ফলাফলই হোক না কেন, এর সাথে অনেক দেশেরই ভাগ্য জড়িয়ে যাবে। অনেক বিষয়েই তখন নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই দেশগুলোকে। চীন যদি যুদ্ধে নাও জড়াতে চায়, তার পরেও তাদেরকে উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত পার হয়ে আসতে হবে। কারণ মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি থাকলে উত্তরে একটা বাফার অঞ্চল তাদেরকে রাখতেই হবে। দুই কোরিয়া এক হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জোট বাঁধতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র আবার জাপানের মিত্র দেশ। সবমিলে এই

জোট চীনের জন্য বিশাল হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। আর সে পরিস্থিতি কিছুতেই বরদাশত করবে না তারা।

যুক্তরাষ্ট্রকেও নতুন করে ভাবতে হবে অনেক কিছু। সীমান্তরেখা পার হয়ে আর কতদূর এগিয়ে যাবে, সেই সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হবে। তারা সম্ভবত চাইবে উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্রসহ অন্যান্য বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ঘাঁটিগুলোর দখল নিশ্চিত করতে। চীনও সম্ভবত একই চিন্তা করবে। কারণ উত্তর কোরিয়ার কয়েকটি পরমাণু কেন্দ্র তাদের সীমান্ত থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

জাপানের সামনে তৈরি হবে নতুন এবং জটিল এক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। জাপান সাগরের অপর পারে তারা আরো শক্তিশালী একীভূত কোরিয়া দেখতে চায় কিনা সে ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জাপান আর সিউলের সম্পর্ক যথেষ্ট তিক্ত। এই কারণে জাপানের উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। তবে তাদের চিন্তার মূল কারণ চীন। চীনের বিপক্ষে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার জন্যই হয়তো তারা দুই কোরিয়ার একত্রীকরণে সহায়তা করবে। তবে এই সিদ্ধান্ত তাদের অর্থনীতিতে বেশ প্রভাব ফেলবে। বিগত শতকে কোরিয়ান উপদ্বীপ দখল করার কারণে এখানকার ঘটনাপ্রবাহের দায় তাদের না নিয়ে উপায় নেই। জাপান ভালোভাবেই জানে যে একত্রীকরণ হলে অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে তারা বাধ্য হবে। যদিও টোকিও এবং সিউল উভয়পক্ষই জানে যে বেশিরভাগ খরচ দক্ষিণ কোরিয়াকেই বহন করতে হবে। এই খরচ এমনকি দুই জার্মানির একত্রীকরণের খরচকেও ছাপিয়ে যাবে। পশ্চিম জার্মানির চেয়ে পূর্ব জার্মানি পিছিয়ে ছিল বটে, কিন্তু তাদের উন্নয়নের ইতিহাস ছিল, ছিল শিল্প কলকারখানা। সেইসাথে ছিল শিক্ষিত জনসাধারণ। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার ক্ষেত্রে উন্নয়ন শুরু করতে হবে একদম শূন্য থেকে। এই ব্যয়ভার মেটাতে গিয়ে অন্তত এক দশক পিছিয়ে যাবে কোরিয়ান উপদ্বীপ। এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর হয়তো তারা উত্তরের খনিজ সম্পদ উত্তোলন নিয়ে কাজ শুরু করার কথা ভাবতে পারে। সেখানে কয়লা, জিংক, কপার ও লোহা ছাড়াও আছে আরো অনেক দুষ্প্রাপ্য মৌল। ফলে উন্নয়ন একেবারে থমকে থাকবে না। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ দক্ষিণ কোরিয়া কি

নিজেদের অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেওয়ার এই ঝুঁকিটা নেবে? এই প্রশ্ন থেকেই যায়।

ভবিষ্যতে কী হবে সেটা সময়ই বলে দেবে। তবে এই মুহূর্তে দুই দেশই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। পাকিস্তান ও ভারতের মতো তারাও পরস্পরের প্রতি সার্বক্ষণিক সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ভীতি নিয়ে বাস করে।

দক্ষিণ কোরিয়া বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রাণবন্ত ও সুসংহত দেশ। দেশটির পররাষ্ট্রনীতিও বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতোই। পশ্চিম, পূর্ব আর দক্ষিণের উন্মুক্ত জলরাশি আর প্রাকৃতিক সম্পদের সহায়তায় বিগত তিন দশকের মধ্যে একটা আধুনিক নৌ-বাহিনী গড়ে তুলেছে তারা। এই বাহিনী এখন দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে জাপান সাগর আর পূর্ব চীন সাগরে পাড়ি জমানোর ক্ষমতা অর্জন করেছে। জাপানের মতো তারাও জ্বালানিশক্তির জন্য বাইরের বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল। তাই গোটা অঞ্চলের সমুদ্রপথের দিকে তাদের খুব সতর্ক নজরে রাখতে হয়। তারা দীর্ঘ সময় নিয়ে চীন আর রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কোনো এক পক্ষ থেকে হিসাবের সামান্য ভুল হলেই দুর্যোগময় পরিস্থিতি নেমে আসতে পারে কোরীয় উপদ্বীপের মানুষের ওপর। তাদের অর্থনীতিতে তো ধ্বস নামবেই, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিও এর প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না। এর শুরু হয়েছিল রাশিয়ার সাথে শীতল যুদ্ধ চলাকালীন নেওয়া পদক্ষেপ থেকে। সেই যুদ্ধ কবেই শেষ, কিন্তু সেই সময়ের সিদ্ধান্তের ফলে এই অঞ্চলের সাথে জড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো বেশ কিছু দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা।

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জাপানের সম্পর্ক ঐতিহাসিক কারণেই তিক্ত। জাপানের দখলদারি আচরণের কথা তারা ভোলেনি এখনো। এখন পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। হঠাৎ হঠাৎ দুই পক্ষ হৃদ্যতা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এখনো রয়ে গেছে বিরোধের আঁচ। ২০১৫ সালের শুরুর দিকে সামরিক কৌশলগত মতৈক্যে পৌঁছায় যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, উত্তর কোরিয়া নিয়ে যে সামরিক গোয়েন্দা তথ্য প্রত্যেকের কাছে আছে, তা পরস্পরের সাথে বিনিময় করবে। সেই সময়ে টোকিওর কাছে স্পর্শকাতর

তথ্য দেওয়ার অভিনব এক নীতি নিয়েছিল সিউল। তারা জানায়, টোকিওকে তারা শুধু সীমিত তথ্য দেবে এবং তা দেবে ওয়াশিংটনের মাধ্যমে। জাপানের সাথে সরাসরি কাজ করবে না তারা।

এই দুই দেশের মধ্যে এখনো আঞ্চলিক বিরোধ আছে। আঞ্চলিক এই বিরোধটি মূলত একটি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে। কোরিয়ানরা এই দ্বীপপুঞ্জকে বলে দোকদো (নির্জন) আর জাপানিজরা বলে তাকেশিমা (বাঁশ)। এই মুহূর্তে এখানকার পাথুরে ভূমির নিয়ন্ত্রণে আছে দক্ষিণ কোরিয়া। সামুদ্রিক মৎস আহরণের জন্য এই জায়গাটা চমৎকার। এখানে গ্যাস থাকার সম্ভাবনাও আছে। তবে এসব দ্বন্দ্ব এবং জাপানি দখলদারিত্বের ইতিহাস সত্ত্বেও নানা কারণে তারা বর্তমানে একসাথে কাজ করছে।

জাপানের ইতিহাস কোরিয়ার চেয়ে একেবারেই আলাদা। এর পেছনে ভৌগোলিক অবস্থানের বড় ভূমিকা আছে। জাপান একটি দ্বীপরাষ্ট্র। দেশটির ১২.৭ কোটি জনসংখ্যার বেশিরভাগই বাস করে জাপান সাগরের বুকে অবস্থিত প্রধান চারটি দ্বীপে। বাকি লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ৬,৮৪৮টি ছোট ছোট দ্বীপ জুড়ে। সবচেয়ে বড় দ্বীপটির নাম হোনশু। হোনশুতে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম মহানগরী, টোকিও। টোকিওতে প্রায় চার কোটি মানুষের বাস।

জাপান থেকে ইউরেশিয়া ভূখণ্ডের ন্যূনতম দূরত্ব ১২০ মাইল। জাপান কখনো বহিঃশত্রুর দখলে না যাওয়ার পিছনে এটা অন্যতম কারণ। চীনারা আছে তাদের থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে। চীন আর জাপানের মাঝে আছে পূর্ব চীন সাগর। চীনের তুলনায় রাশিয়াই জাপানের কাছাকাছি অবস্থিত বলা যায়। কিন্তু রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর অবস্থান জাপান থেকে অনেক দূরে। কারণ, জাপানের নিকটবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া প্রচণ্ড প্রতিকূল। ওখটস্ক সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলেই শুধু সামান্য কিছু মানুষ বাস করে।

মঙ্গোলরা ত্রয়োদশ শতকে চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়া অতিক্রম করে কয়েকবার জাপানে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। প্রথম দফায় তারা পরাজিত হয়ে চলে যায়, আর দ্বিতীয়বার প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে তাদের নৌবহর ডুবে যায়। কোরিয়া প্রণালি জুড়ে সাগর উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেই প্রবল ঝড়ে।

জাপানিরা এই ঝড়ের নাম দিয়েছিল "স্বর্গীয় হাওয়া", জাপানি ভাষায় "কামিকাজে"।

এসব কারণে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা খুবই কম। আর পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে বিস্তীর্ণ প্রশান্ত মহাসাগর। এই কারণে জাপান নিজেদের নাম দিয়েছে "নিপ্পন" বা সূর্য থেকে উৎপন্ন। পূর্ব দিকে তাকালে তারা শুধুই দিগন্তরেখা দেখতে পায়। আর সেই দিগন্তরেখা থেকেই প্রতিটি সকালে সূর্য ওঠে। কোরিয়ায় কিছু বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চলানো বাদ দিলে, বেশিরভাগ সময়ই তারা নিজেদের মতো ছিল। কিন্তু সময় বদলাতে লাগল। এল আধুনিক যুগ। প্রথম প্রথম তারা আধুনিক যুগকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এরপর ভাবল, নাহ আধুনিক যুগের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যাক!

পূর্ব দিকের এই দ্বীপরাজ্যটি কখন থেকে 'জাপান' হয়ে উঠল এই নিয়ে বিভিন্ন রকম মত আছে। তবে, ৬১৭ সালে চীনের সম্রাটের কাছে বর্তমান জাপান থেকে একজন অভিজাত ব্যক্তির পাঠানো একটি চিঠি বিখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে লেখা ছিল "আমি, সুর্যোদয়ের দেশের সম্রাট, চিঠি পাঠাচ্ছি সেই দেশের সম্রাটের কাছে, যেখানে সূর্য অস্ত যায়। আপনি সুস্থ আছেন তো?" ইতিহাস বলছে, এই চিঠির ধরনটা একেবারেই পছন্দ করেননি চীনের সম্রাট। কারণ, তার সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। অপরদিকে জাপানের দ্বীপগুলো তখনও সেভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। জাপানের পরিস্থিতি ষোড়শ শতক পর্যন্ত একই রকম ছিল। এরপরে টোকুগাওয়া শোগুনেটের হাতে জাপান ঐক্যবদ্ধ হয়।

জাপানের দ্বীপগুলো একত্র করলে তা আয়তনে হবে দুই কোরিয়ার চাইতেও বড়। ইউরোপীয় দেশের হিসেবে আনলে জার্মানির চেয়ে বড় হবে। এত বড় দেশ হলেও এর তিন-চতুর্থাংশই মানুষ বসবাসের অনুপযোগী। দেশটিতে আছে বেশকিছু দুর্গম পার্বত্য এলাকা। মাত্র ১৩ শতাংশ অঞ্চল চাষাবাদ করার উপযুক্ত। এসব কারণে জাপানে জনবসতি গড়ে উঠেছে উপকূলীয় সমভূমি বরাবর। তবে অনেক জায়গায় পাহাড়ি উঁচু ভূমিতেও কয়েকটি স্তর তৈরি করে ধান চাষ করা হয়। পর্বতমালা থাকার কারণে পানীয় জলের অভাব নেই জাপানে। কিন্তু সমভূমি কম থাকায় নদীগুলো পণ্য

পরিবহনের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয়। তাছাড়া জাপানের অধিকাংশ নদীই পরস্পর সংযুক্ত নয়। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপানকে বেশ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

এসব কারণে জাপান একটি সমুদ্রনির্ভর জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। দ্বীপগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছে সাগরপথে। কখনো কখনো তারা কোরিয়ায় অভিযান চালিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্ন থাকার পর হঠাৎ করে তারা চেষ্টা করেছে পুরো অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাপান একটি শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের নৌ-বাহিনী তখন ছিল পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে জল এবং স্থল দুই জায়গাতেই তাদেরকে পরাজিত করে জাপান। যে ভৌগোলিক পরিস্থিতি এতকাল তাদেরকে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সেই একই পরিস্থিতি তাদেরকে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনে বাধ্য করল। সমস্যা হলো, এই কাজটি করতে তারা বেছে নিল সামরিক শক্তি।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ এবং প্রথম রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের পিছনে কারণ ছিল একটিই। কোরিয়াতে এই দুই দেশের আধিপত্য বিস্তার রোধ করতে চেয়েছিল জাপান। কোরিয়া সম্পর্কে জাপানের মনোভাব বুঝা যায় তাদের সে সময়ের প্রুসিয়ান সামরিক উপদেষ্টা মেজর ক্লেমেন্স মিকেল এর ভাষ্যে, “কোরিয়া হলো জাপানের বুকের দিকে তাক করে রাখা একটি ছুরি।" জাপান সবসময় কোরিয়াকে তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করত। তারা কোরিয়ান উপদ্বীপের দখল নিয়ে নিল, যেন সেই হুমকি আর না থাকে। এর পরে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল দখল করল, যেন চীন বা রাশিয়া কোরিয়া উপদ্বীপে আর না পৌঁছাতে পারে। কোরিয়ার কয়লা আর লৌহ আকরিকও তাদের কাজে আসলো।

শিল্পোন্নত দেশ হওয়ার জন্য যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ দরকার, তা জাপানের ছিল না। সামান্য পরিমাণে নিম্নমানের কয়লা, সামান্য তেল, অতি সামান্য প্রাকৃতিক গ্যাস আর সামান্য রাবার- এই ছিল তাদের সম্বল। প্রয়োজনীয় ধাতুগুলোও ছিল না তাদের কাছে। ১০০ বছর আগে এই পরিস্থিতি

ছিল, এখনো তাই আছে। এখন অবশ্য সমুদ্রের নিচে মূল্যবান ধাতু এবং গ্যাসক্ষেত্র খুঁজছে তারা। তবে সেখান থেকে তেমন কোনো সুখবর আসেনি এখনো। বাস্তবতা হলো, জাপান বর্তমানে বিশ্বের প্রধান গ্যাস আমদানিকারক দেশ। তেল আমদানির ক্ষেত্রেও তারা তৃতীয় অবস্থানে আছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মরিয়া হয়ে ১৯৩০-এর দশকে চীন জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তারা। ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও তারা একই কাজ করে। এর আগে, ১৮৯৫ সালে তারা তাইওয়ান দখল করে, আর ১৯১০ সালে কোরিয়াকে অধিগ্রহণ করে নেয়। ১৯৩২ সালে তারা মাঞ্চুরিয়া দখল করে। চীনের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালানো শুরু করে ১৯৩৭ সালে। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে জাপানের আরো বেশি করে তেল, গ্যাস, ধাতু এবং রাবার প্রয়োজন হতে থাকে, প্রয়োজন পড়ে আরো বেশি খাদ্যের।

ইউরোপীয় শক্তিগুলো যখন ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সুযোগে ইন্দো-চীন অঞ্চলের উত্তরদিকে হামলা চালায় জাপান। জাপানের তেল তখন আসত মূলত যুক্তরাষ্ট্র থেকে। জাপানের এই আগ্রাসনের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিল, এসব অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার না করলে তেলের নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হবে। জবাবে জাপান পার্ল হারবারে আক্রমণ চালাল এবং তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। বার্মা, সিঙ্গাপুর এবং ফিলিপাইনকে নিজেদের দখলে নিয়ে নিল।

এই দখলদারিত্বের প্রভাব ছিল ব্যাপক। যুক্তরাষ্ট্র নিজে তো আক্রমণের শিকার হলোই, পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাবার যারা যোগান দিত, সেই দেশগুলোও জাপানের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। বিংশ শতাব্দীর দানব দেশটি তখন সর্বাত্মক যুদ্ধে নামল।

প্রশান্ত মহাসাগর ধরে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকল মার্কিনিরা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হলো তাদের। অবশেষে তারা এসে পৌঁছালো তাইওয়ান ও জাপানের মাঝখানে থাকা রাইয়ুকাইয়ু দ্বীপপুঞ্জের ওকিনাওয়া দ্বীপে। তাদের সামনে তখন নিজেদের মূলভূমিকে রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উন্মত্ত

জাপানি বাহিনী। সবাই ধরে নিয়েছিল, প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। জাপানের ভূ-প্রকৃতি যদি সহজ-সরল হতো, তাহলে মার্কিনিরা সহজেই টোকিও পর্যন্ত চলে যেতে পারত। কিন্তু তা অসম্ভব হওয়ায় অন্য পথ ধরল তারা। জাপানের অন্যতম প্রধান দুই শহর হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলা হলো। জাপানসহ পুরো পৃথিবীকে হতবিহ্বল করে দিয়ে তারা নতুন শতাব্দীর জন্য নিয়ে এল নতুন এক দুর্ভাবনা আর আতঙ্ক।

এই হামলার পরে জাপান পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। তেজস্ক্রিয় ধূলো থিতিয়ে আসার পরে জাপানকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করল যুক্তরাষ্ট্রই। এর অন্যতম কারণ ছিল কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর মত একটি মিত্র তৈরি করা। উদ্ভাবনশীলতা দেখিয়ে পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হলো নতুন জাপান।

যদিও তাদের পুরোনো দিনের যুদ্ধবাজ মানসিকতা তখনো পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। শুধু চাপা পড়ে ছিল হিরোশিমা আর নাগাসাকির ধ্বংস্তূপের নিচে। তাদের মনোবলও ভেঙে গিয়েছিল। যুদ্ধপরবর্তী জাপানের সংবিধান অনুযায়ী সেখানে কোনো সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী বা নৌ-বাহিনী থাকতে পারবে না। শুধু প্রতিরক্ষার জন্য একটি বাহিনী থাকবে। কয়েক দশক ধরে এই প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের সাবেকি সামরিক শক্তির ছায়া হয়ে ছিল। যুদ্ধের পরে জাপানকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতেও বাধ্য করে যুক্তরাষ্ট্র। সেই চুক্তি অনুসারে জাপানের প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপির এক শতাংশের বেশি ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। জাপানে কয়েক হাজার মার্কিন সৈন্যের একটি বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। এখনো সেখানে ৩২,০০০ মার্কিন সৈন্য আছে।

১৯৮০'র দশকের শুরুর দিকে জাপানে আবারও জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। বয়স্ক এবং পুরোনো প্রজন্মের মানুষদের একাংশ কখনোই সেভাবে নিজেদের যুদ্ধাপরাধ স্বীকার করেনি। আর নতুন প্রজন্মের একাংশ আগের প্রজন্মের অপরাধের দায় নিজেদের ওপর নিতে অস্বীকৃতি জানায়। উদীয়মান সূর্যের দেশের নতুন প্রজন্ম যুদ্ধপরবর্তী বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে জাপানকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। সংবিধান লঙ্ঘন করার প্রবণতাও বাড়তে থাকে। জাপানের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ধীরে

ধীরে আবারও একটি আধুনিক মানের সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়। চীন যখন পরাশক্তি হয়ে উঠছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রও ভেবে দেখল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের মিত্র দেশগুলোর শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। তাই জাপানের সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর এই নীতিকে সমর্থন করল তারা।

বর্তমান সময়ে এসে প্রতিরক্ষানীতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে জাপান। তারা এখন তাদের মিত্র দেশের সাথে মিলে বাইরের দেশেও যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে। সংবিধানেও এই সংক্রান্ত আইনগুলোতে পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে তারা। ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো প্রতিরক্ষাকৌশল-বিষয়ক দলিলে কাউকে স্পষ্টভাবে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তারা। আর সেই শত্রুর নাম হলো চীন। সেখানে বলা হয়- "চীন এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যাকে জবরদস্তির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ অবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে"।

২০১৫ সালে ৪২ বিলিয়ন ডলারের বিশাল এক প্রতিরক্ষা বাজেট প্রণয়ন করে জাপান। এই খাতে এর আগে এত বড় বাজেট কখনোই দেয়নি তারা। এই বাজেটের বেশিরভাগই বরাদ্দ ছিল বিমানবাহিনী আর নৌবাহিনীর সরঞ্জাম কেনার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৬টি সর্বাধুনিক এফ-৩৫ স্টিলথ ফাইটার কেনে তারা। সেই বছরের বসন্তে নৌবাহিনীতে যুক্ত করা হয় একটি বিশেষ হেলিকপ্টারবাহী ডেস্ট্রয়ার। এই যুদ্ধযানটি বিশাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ব্যবহার করেছিল, তার চেয়েও বড় এই জাহাজটি। অথচ ১৯৪৫ সালে আত্মসমর্পণের সময়কার চুক্তি অনুযায়ী এই ধরনের জাহাজ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। চাইলে এই জাহাজটিকে বিমান বহনের জন্য প্রস্তুত করাও সম্ভব। সেসময় জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, "আমরা এই জাহাজকে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবছি না"। ঠিক যেন মোটরবাইক কিনে কেউ বলছে যে আমি সেটা চালাব না, ঠেলব। জাহাজটিকে ২০২৭ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারে রূপান্তরের কাজ চলমান আছে।

এত এত টাকা খরচ করে নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র কেনা এবং তা মোতায়েনের মাধ্যমে জাপান একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে। তারা বুঝাতে চায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তারা যে রক্ষণাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে, তাতে বদল আসতে যাচ্ছে। ওকিনাওয়া দ্বীপে তাদের যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে তাও উন্নত করা হচ্ছে, যেন তাদের মূল দ্বীপগুলোর দিকে এগোনোর পথে প্রতিবন্ধকতা বাড়ানো যায়। এর ফলে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা অঞ্চলের টহলও আগের চাইতে জোরদার করা সম্ভব হবে। জাপানের আকাশ প্রতিরক্ষা অঞ্চলের কিছু অংশকে চীনও তাদের প্রতিরক্ষা অঞ্চল হিসেবে দাবি করে। ২০১৩ সালে বেইজিং আকাশ প্রতিরক্ষা অঞ্চল সম্প্রসারণের ঘোষণা দেওয়ার পরে উভয় দেশ বিরোধের পর্যায়ে চলে আসে।

সেনকাকু (জাপানিজ ভাষায়) বা দিয়ায়ু (চাইনিজ ভাষায়) দ্বীপপুঞ্জ পড়েছে এই বিরোধিতাপূর্ণ প্রতিরক্ষা অঞ্চলের মধ্যে। বর্তমানে দ্বীপপুঞ্জটি জাপানের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও চীন একে নিজেদের বলে দাবি করছে। এই দ্বীপটি রাইয়ুকাইয়ু দ্বীপমালার অংশ। এলাকাটি খুব স্পর্শকাতর। জাপানের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকতে চাইলে শত্রুদেশকে এই দ্বীপপুঞ্জ পার হতে হবে। তাছাড়া এই এলাকার দখল থাকায় জাপানের সমুদ্রসীমা আর আকাশসীমাও বিস্তৃত হয়েছে। এখানে পানির নিচে তেল এবং গ্যাস থাকারও সম্ভাবনা আছে। তাই টোকিও কিছুতেই এর নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া করতে চাইবে না।

পূর্ব চীন সাগরের যে অংশকে বেইজিং “আকাশ প্রতিরক্ষা চিহ্নিতকরণ এলাকা” হিসেবে দাবি করছে, সেই এলাকাকে জাপান, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের বলে দাবি করে। বেইজিং ঘোষণা দিয়েছিল যে এই অঞ্চল দিয়ে বিমান চালাতে চাইলে অবশ্যই তাদেরকে আগে থেকে অবহিত করতে হবে। নাহলে “আত্মরক্ষার তাগিদে” যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে তারা। এর জবাবে তাদের না জানিয়েই জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র ঐ এলাকা দিয়ে বিমান চালিয়ে থাকে। চীন এর জবাবে এখনো পর্যন্ত কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়নি। তবে ভবিষ্যতে কাউকে হুমকি দিতে চাইলে এই ইস্যুকে ব্যবহার করতেই পারে তারা।

হোক্কাইডোর উত্তরে অবস্থিত কুরিল দ্বীপপুঞ্জকেও নিজেদের বলে দাবি করে জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার কাছে এই দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে তারা। এখনো তা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণেই আছে। এই ব্যাপারটা রাশিয়া এড়িয়ে যেতে চায়। অবশ্য অধিকৃত এলাকা নিয়ে চীন বনাম জাপান দ্বন্দ্বের মতো এতটা জ্বালাময়ী বিষয় নয় কুরিল। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১৯,০০০ মানুষের বাস। মৎস আহরণের জন্যও অঞ্চলটি বেশ উপযুক্ত। তারপরেও কৌশলগত দিক বিবেচনা করে এই অঞ্চলটিকে এতটা গুরুত্ব দেয় না জাপান। তাই এই দ্বীপপুঞ্জকে ঘিরে দুই দেশের মধ্যে শীতল সম্পর্ক থাকলেও বিষয়টি নিয়ে কেউই বাড়াবাড়ি করে না।

জাপানের মূল ভাবনা আসলে চীনকে নিয়ে। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক এবং সামরিক মৈত্রী বজায় রাখতে হচ্ছে তাদেরকে। কিন্তু জাপানের অনেক অঞ্চলের মানুষই জাপানের মাটিতে মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতি পছন্দ করে না। বিশেষ করে ওকিনাওয়ার মানুষরা এটা একদমই পছন্দ করে না। কিন্তু একদিকে চীন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, বিপরীতে জাপানের জনসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিত্রতা বজায় রাখতে বাধ্য হচ্ছে তারা। তবে ধীরে ধীরে এই মিত্রতা সমকক্ষ শক্তির মিত্রতায় পরিণত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ পরিসংখ্যানবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে এই শতাব্দীর মাঝামাঝিতে জাপানের জনসংখ্যা ১০ কোটির নিচে চলে যেতে পারে। আর ২১১০ সালের মধ্যে তা নেমে যেতে পারে ৫ কোটির নিচে। জনসংখ্যার হ্রাস কমাতে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে জাপানি সরকার। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সরকারি খরচে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করা। সরকারি উদ্যোগে 'কোনকাতসু' পার্টির আয়োজন করা হচ্ছে, যেন অবিবাহিত তরুণ তরুণীরা সেখানে গিয়ে পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারে, আর সেখান থেকে যেন সন্তান জন্মদানের সুযোগ তৈরি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি বহুল প্রচলিত মাধ্যম অভিবাসন। কিন্তু জাপানি সমাজ এখনো খানিকটা আত্মকেন্দ্রিক। অভিবাসনকে এই দেশের জনগণ তেমন একটা পছন্দ করে না। ১৩০ কোটি জনসংখ্যার চীনের সাথে কুলিয়ে উঠতে জাপান একদিকে যেমন নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথেও মিত্রতায়ও আবদ্ধ হচ্ছে।

ফলে, জাপান আর কোরিয়া, দুই জায়গাতেই জেঁকে বসেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই তিনটি দেশের মধ্যে এখন এক ত্রিভূজ সম্পর্ক বিদ্যমান। গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের বিষয়ে তো ওপরেই আলোচনা করা হয়েছে। জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অনেক বিষয় নিয়েই বিবাদ আছে, কিন্তু দুই দেশই চীন আর উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। সবাই মিলে উত্তর কোরিয়া সমস্যার সমাধান যদি করেও ফেলে, তার পরেও চীন রয়েই যাবে মাথার ওপরে। এর অর্থ হলো, টোকিও উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর আর ওকিনাওয়াতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকেই যাবে। এর মাধ্যমে তারা প্রশান্ত মহাসাগর এবং দুই চীন সাগরে নজরদারি চালাবে। এই অঞ্চলের জল তাই বিক্ষুব্ধই থেকে যাবে।

অধ্যায় নয়



লাতিন অ্যামেরিকা

"এই অঞ্চলটিকে আমরা বলতে চেয়েছিলাম "আশার মহাদেশ"। এই আশা আমাদের কাছে ছিল স্বর্গের হাতছানি। এ এমন এক পাওনাপত্র, যে পাওনা কখনোই আদায় করা যায়নি"।

-পাবলো নেরুদা, চিলির নোবেল বিজয়ী কবি।





লাতিন অ্যামেরিকা

লাতিন অ্যামেরিকা! প্রাচীন জ্ঞান আর ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি মহাদেশ। কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকার দক্ষিণের অংশটা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করলে একটা ব্যাপার বুঝতে পারবেন। তা হলো, পুরনো পৃথিবীর জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নতুন পৃথিবীতে নিয়ে গেলেও ভৌগোলিক পরিস্থিতি যদি বিপক্ষে থাকে, তবে খুব একটা লাভ হয় না। তার ওপর যদি একের পর এক ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে এমনিতেও আর বিশেষ কিছু করার থাকে না! যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হয়ে উঠেছে ভৌগোলিক পরিস্থিতির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে। আর লাতিন অ্যামেরিকায় ঘটেছে ঠিক তার বিপরীত। শুধু ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চলের ২০টি দেশের পক্ষে এককভাবে অথবা জোটবদ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

লাতিন অ্যামেরিকায় জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই অঞ্চলের ভৌগোলিক জটিলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে আদিবাসীদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার পরে সেই জমি দিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকায় এই ঘটনা ঘটেনি। লাতিন অ্যামেরিকাতে চাপিয়ে দেওয়া হয় পুরনো আমলের সামন্ততন্ত্র। ফলে সামান্য কিছু মানুষ হয়ে ওঠে জমিদার, আর বাকি বিপুলসংখ্যক মানুষ হয়ে যায় প্রজা। আর এর ফলে তৈরি হয় তীব্র বৈষম্য। তাছাড়া, লাতিন অ্যামেরিকা দখল করার পর ইউরোপীয়রা তৈরি করে আরেক রকম ভৌগোলিক জটিলতা। এই জটিলতার কারণে এই মহাদেশের কোনো দেশই আজ পর্যন্ত পূর্ণ উদ্যমে উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। লাতিন অ্যামেরিকাতে ইউরোপিয়ানরা বসতি গড়েছিল উপকূলের কাছাকাছি এলাকায়। আফ্রিকাতেও তারা এই একই কাজ করেছিল। মূলত ভেতরের দিকে মশা আর বিভিন্ন রোগের প্রকোপ থাকায় তারা উপকূল অঞ্চল বেছে নেয়। দেশগুলোর রাজধানীসহ সব বড় শহরই স্থাপন করা হয় সমুদ্রের তীরে। সব

অঞ্চল থেকেই রাস্তা এসে রাজধানী শহরে মিলেছে। কিন্তু, এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের আন্তঃসংযোগ তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। একটি দেশের উন্নয়নের পথে এটি একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পেরু আর আর্জেন্টিনার উদাহরণ দেওয়া যায়। এই দেশ দুইটিতে রাজধানী শহরের মেট্রোপলিটন এলাকায় বাস করে পুরো দেশের ৩০ ভাগেরও বেশি মানুষ। এই দেশ দুইটিতে নানা প্রান্ত থেকে সম্পদ এনে দখলদাররা জড়ো করত রাজধানীতে। তারপর সমুদ্রপথে বাইরে পাঠিয়ে দিত। স্বাধীনতা লাভের পরেও একই ধারা অব্যাহত থাকে দেশগুলোতে। উপকূলীয় শহরগুলোতে থাকা ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত অভিজাতরা নিজেদের শহরকে আরো সমৃদ্ধশালী করার কাজে মন দেয়। অপরদিকে, দেশের ভেতরের এলাকাগুলো রয়ে যায় অবহেলিত এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন।

শিক্ষা-দীক্ষা এবং ব্যবসায় নেতৃত্ব দেওয়া জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিকে আবেগঘন ভাষায় লাতিন অ্যামেরিকা সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতেন। তারা বলতেন যে, তারা এখন "লাতিন অ্যামেরিকান দশকের" উষালগ্নে দাঁড়িয়ে। সেই ঊষালগ্ন এখনো চলছেই! কবে শেষ হবে, কেউ জানে না। এই অঞ্চলের অপরিসীম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখনো তাদেরকে লড়তে হচ্ছে ইতিহাস এবং প্রকৃতির সাথে।

অবশ্য মেক্সিকো ধীরে ধীরে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে এগোচ্ছে। কিন্তু, দেশটির উত্তরদিকে বসবাসের অযোগ্য মরুভূমি সবসময়ই রয়ে যাবে! দেশটির পূর্ব ও পশ্চিমে আছে পর্বতমালা, আর দক্ষিণে আছে জঙ্গল। এসব কারণে অর্থনৈতিকভাবে সেভাবে এগুতে পারছে না তারা। ব্রাজিল বর্তমানে বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু দেশটির অভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক কারণেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে যাবে। লাতিন অ্যামেরিকার অনেক দেশেই প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু শুধু ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের কাছে লন্ডন বা প্যারিসের চাইতেও দূরবর্তী জায়গা হয়ে রয়ে যাবে আর্জেন্টিনা বা চিলি।

লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলো স্বাধীন হওয়ার প্রায় ২০০ বছর হয়ে গেল। এতদিনেও তারা উত্তর অ্যামেরিকা বা ইউরোপের দেশগুলোর কাছাকাছি

পৌঁছাতে পারেনি। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলকে ধরলে লাতিন অ্যামেরিকার মোট জনসংখ্যা হয় ৬০ কোটিরও বেশি। এদিকে, লাতিন অ্যামেরিকার সম্মিলিত জিডিপি সর্বসাকুল্যে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের মিলিত জিডিপির সমান। অথচ, ঐ দুই দেশের মোট জনসংখ্যা মাত্র ১২.৫ কোটি। ঔপনিবেশিক শাসন আর দাসত্বের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে লাতিন অ্যামেরিকা। কিন্তু, সামনে বাকি আছে আরো অনেক পথ।

লাতিন অ্যামেরিকা শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকোর সীমান্ত থেকে। এরপর তা দক্ষিণে চলে গেছে ৭০০০ মাইল পর্যন্ত। এর মাঝে পার হয়েছে মধ্য অ্যামেরিকা এবং দক্ষিণ অ্যামেরিকা। কেপ হর্নের তিয়েরা দেল ফুয়েগো এর শেষ সীমানা। এখানে মিলিত হয়েছে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। লাতিন অ্যামেরিকার প্রশস্ততম অংশ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ব্রাজিল থেকে পেরু পর্যন্ত প্রায় ৩২০০ মাইল চওড়া। এই অঞ্চলের পশ্চিমে আছে প্রশান্ত মহাসাগর, আর পুর্ব দিকে মেক্সিকো উপসাগর, ক্যারাবিয়ান সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর। এখানের কোনো উপকূলেই প্রাকৃতিক গভীর পানির বন্দর নেই। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এটা একটা বড় অসুবিধা।

মধ্য অ্যামেরিকা এলাকাটি পর্বতবেষ্টিত। এখানে আছে গভীর সব উপত্যকা। এর সংকীর্ণতম অংশটি মাত্র ১২০ মাইল প্রশস্ত। এর দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের সমান্তরালে আন্দিজ নামে যে পর্বতমালা আছে, তার দৈর্ঘ্য ৪৫০০ মাইল। পৃথিবীতে আর কোথাও আন্দিজের মতো এত বড় এলাকা জুড়ে এমন নিরবচ্ছিন্ন পর্বতমালা নেই। তুষার ঢাকা এই পর্বতমালা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে মহাদেশটির পশ্চিমের অনেক এলাকা পূর্বাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পশ্চিম গোলার্ধের উচ্চতম বিন্দুটি এখানেই। আর তা হলো ২২,৮৪৩ ফুট উঁচু আকোনকাগুয়া পর্বত। এই পর্বতমালা থেকে থেকে জল প্রবাহিত হয়েছে নিম্নাঞ্চলে। এই প্রবাহ ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করছে চিলি, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলা । অবশেষে পর্বতাঞ্চল শেষ হয়ে যখন সমতল এলাকা শুরু হয়, সেখানে দেখা যায় বন এবং হিমবাহ। এই জায়গাটা চিলির নিয়ন্ত্রণাধীন দ্বীপপূঞ্জ, আর এখানেই এই মহাদেশের ভূমির শেষ সীমানা।

লাতিন অ্যামেরিকার পূর্বাঞ্চল জুড়ে আছে ব্রাজিল ও আমাজন নদী। আমাজন পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী।

লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলোর মধ্যে সামান্য যেসব মিল আছে তার একটি হলো, সবগুলো দেশের ভাষাই লাতিন থেকে উদ্ভূত। ব্রাজিল আর ফ্রেঞ্চ গায়ানা বাদে বাকিরা সবাই স্প্যানিশ ভাষাভাষী। ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগিজ আর ফ্রেঞ্চ গায়ানার ভাষা ফরাসি। ভাষাগত এই সামঞ্জস্যের কারণে বেশিরভাগ মানুষই মনে করে যে লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলো সব একই রকম। এর আড়ালে একটা ব্যাপার প্রায়শই হারিয়ে যায়। আর তা হলো, এই এলাকার নানা অঞ্চলে আবহাওয়ার ভিন্নতা। এই বিশাল মহাদেশে পাঁচটি ভিন্নরকম আবহাওয়া বিদ্যমান। আন্দিজের পূর্বদিকে দক্ষিণ অ্যামেরিকার নিচের দিকের এক-তৃতীয়াংশের ভূমি তুলনামূলক সমতল এবং আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এই এলাকাকে বলা হয় "সাউদার্ন কোন"। উত্তরের পর্বত এবং জঙ্গলপূর্ণ এলাকার সাথে এই অঞ্চলের আবহাওয়ার কোনো মিলই নেই। আবহাওয়ার এই ভিন্নতা তাদেরকে দিয়েছে চাষযোগ্য জমি। চাষের খরচ এখানে যেমন কম, তেমনি নির্মাণ কাজের খরচও কম। অন্যদিকে ব্রাজিলকে নিজের দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে মালামাল পরিবহণ করতেই বেগ পেতে হয়।

এত প্রতিবন্ধকতা থাকার পরেও অনেক বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিকরা এখন লাতিন অ্যামেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলছেন। তাদের মতে, এই মহাদেশটি উন্নয়নের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। খুব শীঘ্রই নাকি এই অঞ্চলের যাত্রা শুরু হবে উন্নয়নের পথে। এই মতবাদ নিয়ে আমার বেশ আপত্তি আছে। লাতিন অ্যামেরিকার যে ভৌগোলিক পরিস্থিতি, তাতে এই এলাকা চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার বদলে পৃথিবীর এক প্রান্তে পড়ে আছে বলাই শ্রেয় হবে। এই বিশাল মহাদেশ জুড়ে অনেক কিছুই ঘটে চলেছে। সমস্যা হলো, এই অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ সীমাবদ্ধ আছে নিজেদের মধ্যেই, পৃথিবীতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না। মনে হতে পারে যে, এটা একান্তই উত্তর গোলার্ধ প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এটাও ঠিক যে, পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক শক্তিগুলো উত্তর গোলার্ধেই অবস্থিত।

লাতিন অ্যামেরিকা পৃথিবীর অন্য অংশ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এই কথা সত্যি। তবে এটাও সত্যি যে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের দক্ষিণে, অর্থাৎ এই লাতিন অ্যামেরিকায় মানুষ বসবাস করছে বিগত ১৫০০০ বছর ধরে। ধারণা করা হয় তাদের উদ্ভব রাশিয়ায়। একটা সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতা কমে গিয়ে বেরিং প্রণালি সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছিল। তখন পায়ে হেটেই বেরিং প্রণালি পার হওয়া যেত। বিজ্ঞানীদের ধারণা লাতিন অ্যামেরিকার প্রথম বাসিন্দারা রাশিয়া থেকে পায়ে হেঁটে বেরিং প্রণালি অতিক্রম করে অ্যামেরিকা মহাদেশে ঢুকেছিল। লাতিন অ্যামেরিকার বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে আছে ইউরোপীয়, আফ্রিকান, আদিবাসী এবং মেসতিজো জনগোষ্ঠী। মেসতিজোরা ইউরোপীয় এবং আদিবাসী অ্যামেরিকানদের মিশ্র বংশোদ্ভূত।

নানা জনগোষ্ঠীর মিশ্রণের এই উৎস খুঁজতে আমাদের পিছিয়ে যেতে যেতে হবে ১৪৯৪ সালে, স্পেন আর পর্তুগালের মধ্যে সম্পাদিত টরডিসিল্লাস চুক্তির সময়ে। শুধু ম্যাপ ধরে দূরবর্তী অচেনা অজানা জায়গায় লাইন টানার ইউরোপীয় প্রবণতা এখান থেকেই শুরু। বিশেষ করে লাতিন অ্যামেরিকা সম্পর্কে তো ইউরোপীয়রা কিছুই জানত না তখন। এই দুই ইউরোপীয় নৌশক্তি সে সময় জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে পশ্চিমে অভিযান চালাতে শুরু করেছে। নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে ইউরোপের বাইরের নতুন আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় তারা। রোমে বসে পোপও এতে সম্মতি দেন। এর পরের ইতিহাস খুবই মর্মান্তিক। ইউরোপীয়রা এখানে যা যা করে তার ফলে বর্তমান দক্ষিণ অ্যামেরিকার আদি অধিবাসীদের অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই।

১৮০০'র প্রথম দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয় লাতিন অ্যামেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। এতে নেতৃত্ব দেন ভেনিজুয়েলার সিমোন বলিভার এবং আর্জেন্টিনার হোসে ডি স্যান মার্টিন। দক্ষিণ অ্যামেরিকার মানুষের সামষ্টিক চেতনায় বলিভারের নামটা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে আছে। বলিভিয়া দেশটির নাম দেওয়া হয়েছে তার নাম অনুসারেই। বলিভারের জাতীয়তাবাদী নীতি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী। এই অঞ্চলের বামপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলিভিয়ার এই নীতিকেই যথাযথ মনে

করে। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সমাজতন্ত্রঘেঁষা এই মতবাদটি অনেকক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদে রূপ নিচ্ছে। মূলত রাজনীতিবিদরাই তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য যখন যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে মতবাদটি ব্যবহার করছেন।

নতুন জন্ম নেওয়া দেশগুলো ঊনবিংশ শতক জুড়ে গৃহযুদ্ধ এবং সীমান্তে সংঘাতে লিপ্ত ছিল। তবে সে শতকের শেষভাগে এসে রাষ্ট্রগুলোর সীমানা মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে যায়। সবচেয়ে ধনী তিন দেশ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও চিলি তখন নিজেদের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু করে। সামরিক দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কারণে এই তিন দেশেরই উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। সীমান্ত নিয়ে বিরোধ এই মহাদেশ জুড়ে এখনো রয়ে গেছে। তবে দেশগুলো যতই গণতন্ত্রের পথে এগোচ্ছে, ততই বিরোধগুলো স্তিমিত হয়ে আসছে। কিছু কিছু বিরোধ কূটনৈতিকভাবেও মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

তবে এসবের মধ্যে বলিভিয়া আর চিলির বিরোধটা হলো সবচেয়ে তিক্ত। ১৮৭৯ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ থেকে এই তিক্ততার সূত্রপাত। এই সময় চিলির কাছে তাদের ভূমির একটা বড় অংশ হারায় বলিভিয়া। এর মধ্যে ছিল ২৫০ মাইল দীর্ঘ উপকূলরেখা। সে-সময় থেকেই দেশটি ভূমিবেষ্টিত হয়ে আছে। এই ধাক্কা তারা আজো সামলে উঠতে পারেনি। এই কারণেই বলিভিয়া দক্ষিণ অ্যামেরিকার দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। আর এর ফলে নিম্নভূমিতে বসবাসরত ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত আর উচ্চভূমিতে বসবাসরত আদিবাসীদের মধ্যে ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে চলেছে। বলিভিয়ার অধিবাসীদের ৮৮ শতাংশই মেসতিজো ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর।

সময় এই ক্ষত শুকাতে পারেনি। শেতাঙ্গ ও বাদামি জনগোষ্ঠী একে অপরের বন্ধু হয়নি। দুই দেশের মধ্যে তিক্ততাও কমেনি। বলিভিয়াতে আছে দক্ষিণ অ্যামেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ। কিন্তু তারা এই গ্যাস চিলির কাছে বিক্রি করবে না। এদিকে চিলির দরকার নির্ভরযোগ্য বিক্রেতা। দুইজন বলিভিয়ান প্রেসিডেন্ট এই নীতির বাইরে গিয়ে চিলির কাছে গ্যাস বিক্রির কথা ভেবেছিলেন। তারা আর ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্ট ইভা মোরালেস চিলিকে গ্যাস দেওয়ার জন্য নতুন

একটি নীতির খসড়া করেছিলেন। কিন্তু বিনিময়ে তিনি চিলির কাছে তাদের হারানো উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবহারের অধিকার চান। গ্যাসের প্রবল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে চিলি। দুই পক্ষের জাতীয়তাবাদী অহংকার আর ভৌগোলিক চাহিদার কাছে কূটনৈতিক কার্যক্রম পরাভূত হচ্ছে।

এই অঞ্চলে এরকম নানান বিবাদ চলে আসছে অনেকদিন ধরেই। ব্রিটিশ আওতাধীন দেশ বেলিজ আর প্রতিবেশী গুয়াতেমালার মধ্যে ঊনবিংশ শতকে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছিল। আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের মত এই দুই দেশকেও সরলরেখা বরাবর বিভক্ত করেছিল ব্রিটিশরা। গুয়াতেমালা বেলিজকে নিজেদের সার্বভৌম এলাকার অংশ হিসেবেই দাবি করে। তবে বলিভিয়ার মতো তারা এই বিষয়টি নিয়ে এতটা শোরগোল তুলতে ইচ্ছুক না। চিলি আর আর্জেন্টিনার মধ্যে বিবাদ আছে বিগল চ্যানেলের পানিপথ নিয়ে। গায়ানার অর্ধেক অংশকে নিজেদের বলে দাবি করে ভেনিজুয়েলা। ইকুয়েডর এমন দাবি করে পেরুকে নিয়ে। ইকুয়েডর আর পেরুর মধ্যেকার এই বিরোধটা এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিরোধগুলোর একটি। এই বিষয়টি নিয়ে গত ৭৫ বছরে তিনটি সীমান্ত-সংঘর্ষ হয়ে গেছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিকতমটি ঘটেছে ১৯৯৫ সালে। তবে গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে এসব দ্বন্দ্ব কিছুটা হলেও কমেছে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মধ্য অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলো পরিণত হয় শীতল যুদ্ধের প্রতিনিধিত্বমূলক যুদ্ধক্ষেত্রে। এর প্রভাবে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। লাতিন অ্যামেরিকার অনেক দেশই দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। তখন ব্যাপক আকারে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। নিকারাগুয়া এর একটি বড় উদাহরণ। শীতল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হলে অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিংশ শতকের তুলনায় বর্তমানে দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বেশ স্থিতিশীল হয়েছে।

দক্ষিণ অ্যামেরিকার অধিকাংশ মানুষ বসবাস করে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে। মহাদেশের ভেতরের দিকে বা একদম দক্ষিণের হিমশীতল অঞ্চলে খুব কম মানুষের বসবাস। এই কারণে দক্ষিণ অ্যামেরিকাকে ফাঁপা মহাদেশও বলা হয়ে থাকে। মধ্য অ্যামেরিকা আর মেক্সিকোর ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা এমন নয়। এসব জায়গায় জনসংখ্যা সুষমভাবেই বন্টিত

হয়েছে। তবে মেক্সিকোর ক্ষেত্রে ভূমির কঠোর প্রকৃতি তাদের উন্নয়ন এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক বিস্তারের পথকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।

একদম উত্তর প্রান্তে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মেক্সিকোর সীমান্তের দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল। এর বেশিরভাগ অংশই মরুভূমি। এই এলাকাটি এতই রুক্ষ যে খুব কম জায়গাতেই মানুষ বাস করতে পারে। দুর্গম এই এলাকাটি যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর মধ্যে বাফার এলাকা হিসেবে কাজ করে। তবে, প্রযুক্তি আর সামরিক দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্রই মূলত এই বাফার অঞ্চলের সুবিধা পায়। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয়, মার্কিন সেনাবাহিনী চাইলেই এই সীমানা অতিক্রম করে মেক্সিকোতে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু মেক্সিকোর সামরিক বাহিনী এই চেষ্টা করলে স্রেফ ধ্বংস হয়ে যাবে। মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এই দুর্গম এলাকা বেশ কার্যকরী একটা প্রতিবন্ধক। কিন্তু, এই প্রতিবন্ধকের মধ্যে মধ্যে আছে অসংখ্য ছিদ্র। ফলে মার্কিন প্রশাসনকে সবসময়ই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। আর এই সমস্যা ভবিষ্যতেও থাকবে।

মেক্সিকানরা সবাই জানে- এখন যেসব জায়গা টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো এবং অ্যারিজোনা নামে পরিচিত, তার সবই ১৮৪৬-৪৮ সালের যুদ্ধের আগে মেক্সিকোর অংশ ছিল। সেই যুদ্ধে মেক্সিকোর প্রায় অর্ধেক অংশ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হয়। তবে এইসব অঞ্চলকে আবার অধিগ্রহণ করে নিতে আন্দোলন জাতীয় তেমন কিছু মেক্সিকোতে হচ্ছে না। সীমান্ত নিয়েও দুই দেশের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এক সময় মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ছিল রিও গ্রান্দে উপত্যকার ছোট্ট একখণ্ড ভূমি নিয়ে। ১৮৫০-এর দশকে রিও গ্রান্দে নদীর গতিপথ বদলে গেলে এই বিরোধের সূচনা হয়। বিংশ শতকের বেশিরভাগ সময় ধরে এই বিরোধ চলেছে। তবে ১৯৬৭ সালে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং তারা ঐক্যমতে পৌঁছায় যে এটি মেক্সিকোরই অংশ।

একবিংশ শতকের মাঝামাঝি গিয়ে ওপরে উল্লিখিত চারটি রাষ্ট্রে হিস্পানিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। আর তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হবে মেক্সিকান বংশোদ্ভুত। তখন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের

দুইপাশের স্প্যানিশ ভাষাভাষীরা এক হওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করতে পারে। তবে এই ধরনের আন্দোলনের হালে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ মার্কিন ল্যাটিনোদের অনেকেই মেক্সিকান বংশোদ্ভুত নয়। আর মেক্সিকোর পক্ষেও এত সহজে যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রার মানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। মেক্সিকান সরকার তার নিজের অঞ্চলকে সামলাতেই হিমশিম খায়। বাড়তি ঝামেলা কাঁধে নিতে চাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাদের আছে বলে মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের ছায়াতলে থাকাই মেক্সিকোর নিয়তি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদেরকেই নমনীয় থাকতে হবে সবসময়। মেক্সিকো উপসাগর নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো শক্তিশালী নৌবাহিনী তাদের নেই। আটলান্টিকে যাওয়ার সামর্থ্যও তারা রাখে না। তাই নিজেদের সমুদ্রপথকে সুরক্ষিত রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপরই তাদের নির্ভর করতে হয়।

দুই দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছে সীমান্তের দক্ষিণে। পরিবহন এবং শ্রমিক খরচ কমানোর জন্যই এই দুর্গম অঞ্চলে বিনিয়োগ করছে তারা। কিন্তু এই এলাকা মানুষের বসবাসের জন্য প্রতিকূল হওয়ায় বাফার জোন হিসেবেই থেকে যাবে। আর এই অঞ্চল পার হয়ে লাতিন অ্যামেরিকার দরিদ্র মানুষেরা উত্তরের দিকে যাওয়া অব্যাহত রাখবে। অ্যামেরিকা তাদের কাছে এক পরম আরাধ্য ভূমি।

মেক্সিকোর পূর্ব দিকে "সিয়েরা মাদ্রে ওরিয়েন্টাল", আর পশ্চিমে "সিয়েরা মাদ্রে অক্সিডেন্টাল" পার্বত্য অঞ্চল। এর মাঝখানে আছে মালভূমি। আর দক্ষিণে মেক্সিকো উপত্যকায় অবস্থিত রাজধানী শহর, মেক্সিকো সিটি। মেক্সিকো সিটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ মহানগরীগুলোর একটি। এর জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি।

পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল এবং উপত্যকাগুলোর জমি চাষাবাদের জন্য একেবারেই উপযোগী নয়। নদীগুলোও পণ্য পরিবহনের জন্য অনুপযুক্ত। পূর্ব দিকের মাটি অপেক্ষাকৃত উর্বর। কিন্তু সার্বিকভাবে দেশটির ভূপ্রকৃতি যথেষ্ট রুক্ষ। এসব কারণে চাইলেও সেভাবে উন্নতি করতে পারছে না মেক্সিকো। দক্ষিণ দিকে ছোট দুইটি দেশ বেলিজ আর গুয়াতেমালার সাথে তাদের সীমান্ত আছে। কিন্তু দক্ষিণমুখী আগ্রাসনের কোনো ইচ্ছা মেক্সিকোর নেই। কারণ,

দক্ষিণদিকে ভূমি ক্রমেই উঁচু হতে হতে পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ফলে তা দখল করে নিয়ন্ত্রণে রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া এই এলাকা দখল করেও তেমন কোনো সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। কারণ এই দুই দেশের ভূমিও উর্বর নয়। মেক্সিকোর আসলে দখলদারিত্বের মনোভাবই নেই। তার বদলে তারা অন্যদিকে মনোযোগ দিতে আগ্রহী। মেক্সিকো চাইছে তাদের তেল উৎপাদন শিল্পকে আরো উন্নত করতে এবং কারখানাগুলোতে আরো বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসতে। এছাড়া তাদের অনেক অভ্যন্তরীণ সংকটও আছে। সে বিষয়গুলোর সমাধান করা তাদের কাছে বেশি জরুরি। মাদক ব্যবসাজনিত সহিংসতা আর বিরোধ নিয়ে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মাদকসেবীদের চাহিদা বিপুল। এই চাহিদার একটা বড় অংশের যোগান যায় মেক্সিকো থেকে।

মেক্সিকান সীমান্ত পাচারকারীদের জন্য একটা আদর্শ জায়গা। বিশেষ করে গত ২০ বছরে এই সীমান্ত অঞ্চল পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্য কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া নীতি। কলম্বিয়া দেশটির অবস্থান মেক্সিকো থেকে ১৫০০ মাইল দক্ষিণে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭০-এর দশকে "মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ঘোষণা করেন। অনেকটা ইদানিংকালের "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"র মতোই। কিন্তু এটি এমন এক যুদ্ধ, যেখানে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে কলম্বিয়ার ড্রাগ কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযানে নামে ওয়াশিংটন। কলম্বিয়ার সরকারও প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল। তখন কলম্বিয়া থেকে আকাশ ও সাগরপথে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক চোরাচালানের অনেক রুট বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয় তারা।

জবাবে কার্টেলগুলো স্থলপথে নতুন রুট তৈরি করে নেয়। মধ্য অ্যামেরিকা ও মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে তাদের চোরাচালান কার্যক্রম জোরদার হতে থাকে। যে পথ তারা ব্যবহার করছে সেটি আসলে যুক্তরাষ্ট্রেরই তৈরি করা প্যান-অ্যামেরিকান মহাসড়ক। এই মহাসড়ক দক্ষিণ অ্যামেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে উত্তর অ্যামেরিকার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। দুই মহাদেশের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে

এই মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছিল। আর মাদক-কারবারিরা এখন একে ব্যবহার করছে মাদক পাচারের কাজে। মেক্সিকোর মাদক-কারবারিদের এতে বেশ সুবিধাই হয়ে যায়। তারা এই পথকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে এবং নিজেরাই মাদক উৎপাদন করতে থাকে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের এই ব্যবসার কারণে শুরু হয় এলাকা দখলের যুদ্ধ। বিজয়ীরা তাদের নতুন পাওয়া শক্তি এবং অর্থ ব্যবহার করে মেক্সিকোর পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঢুকে তাদেরকে দূর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলে। সেইসাথে কুক্ষিগত করে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতাদেরকেও।

আফগানিস্তানের হেরোইন ব্যবসার পরিস্থিতিও অনেকটা এমনই ছিল। আফগান পপিচাষীরা যখন দেখল ন্যাটো এসে তাদের এতকালের রুটিরুজির উপায় ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন তাদের সামনে বিকল্প হিসেবে দুইটি উপায় খোলা ছিল। এক অংশ অস্ত্র তুলে নিল, আরেক অংশ তালিবানদের পক্ষে চলে গেল। আফগান সরকার মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সহযোগিতা মেলেনি, সেখানে চলত মাদকসম্রাটদের রাজত্ব। মেক্সিকোতেও একই ঘটনা ঘটল।

সময়ের সাথে সাথে সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু পুরো দেশটিকে মেক্সিকো সিটি কখনোই সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বর্তমান পরিস্থিতি আরো জটিল। ড্রাগ কার্টেলগুলোর এখন নিজস্ব আধাসামরিক বাহিনী আছে। অস্ত্রশস্ত্রে তারা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সমকক্ষ। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর তুলনায় টাকা পয়সা বেশি পাওয়ায় তাদের উদ্যমও বেশি। এসব বাহিনী মেক্সিকোর বেশ কিছু অঞ্চলে কর্মসংস্থানের বড় একটা উৎসও বটে। মাদক ব্যবসা পরিচালনাকারী দলগুলোর আয় বিপুল। তাদের এই টাকা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। আর এই কালো টাকা সাদা করতে তারা লগ্নি করছে নানারকম বৈধ ব্যবসায়।

মেক্সিকো বর্তমানে গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। কার্টেলগুলো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বিভিন্ন এলাকা দখল করে রেখেছে। সরকার ভান ধরছে যেন সবকিছু তাদের শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে। আর দুই পক্ষের মাঝে পড়ে মারা যাচ্ছে শত শত সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতির সব থেকে ভয়ানক রূপ দেখা গেছে ২০১৪ সালে। সে বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কার্টেলের হাতে খুন হয়

মেক্সিকোর একটি স্কুলের ৪৩ জন ছাত্র-শিক্ষক। গোটা দেশ স্তম্ভিত হয়ে যায় এই ঘটনায়। সাধারণ মানুষের সমর্থন সরকারের পক্ষে চলে যায়। তবে এই ঘটনা দীর্ঘমেয়াদি এক যুদ্ধের ভয়ানক এক মাইলফলক মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পৌঁছানোর স্থলপথ বেশ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলা চলে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল মাদকের চাহিদা কমারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অ্যামেরিকা চায় মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেক্সিকো পূর্ণ সহযোগিতা করুক। মেক্সিকোতে যখন যে সরকারই এসেছে, তারাই যুক্তরাষ্ট্রের এই চাওয়া পূরণ করতে কাজ করে গেছে। কিন্তু এই কাজটা করতে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে নতুন এক জটিলতার। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিত্যব্যবহার্য পণ্য বিক্রি করাটাই মেক্সিকোর আয়ের মূল উৎস। এখন যুক্তরাষ্ট্র যদি মাদককেই নিত্যব্যবহার্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে মেক্সিকো তা সরবরাহ করবেই। মেক্সিকোতে কম খরচে মাদক উৎপাদন করে বৈধ পণ্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করা যায়। মাদক ব্যবসা না থাকলে মেক্সিকো আরো দরিদ্র হয়ে যাবে। কারণ, মাদকের বিনিময়ে যে বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা মেক্সিকোতে ঢোকে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার মাদক ব্যবসার কারণেই দেশটি হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড সহিংস। মেক্সিকোর দক্ষিণে অবস্থিত কিছু দেশের জন্যও এটা সত্য।

মধ্য অ্যামেরিকার আহামরি কিছু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু একটাই ব্যাপার আছে এখানে, এই অঞ্চল খুবই সংকীর্ণ। এখন পর্যন্ত শুধু একটি দেশই এই পরিস্থিতির সুবিধা নিতে পেরেছে। দেশটি হচ্ছে পানামা। পানামা দেশটি অতি সংকীর্ণ। পানামা খালের মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে প্রশান্ত মহাসাগরের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আর দেশটি নিজেদের উন্নয়নে এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে। তবে চীন এসে এই অঞ্চলে কাঁচা টাকা ঢালতে শুরু করার পর পানামা খাল কেন্দ্রিক এই পরিস্থিতি বদলেও যেতে পারে।

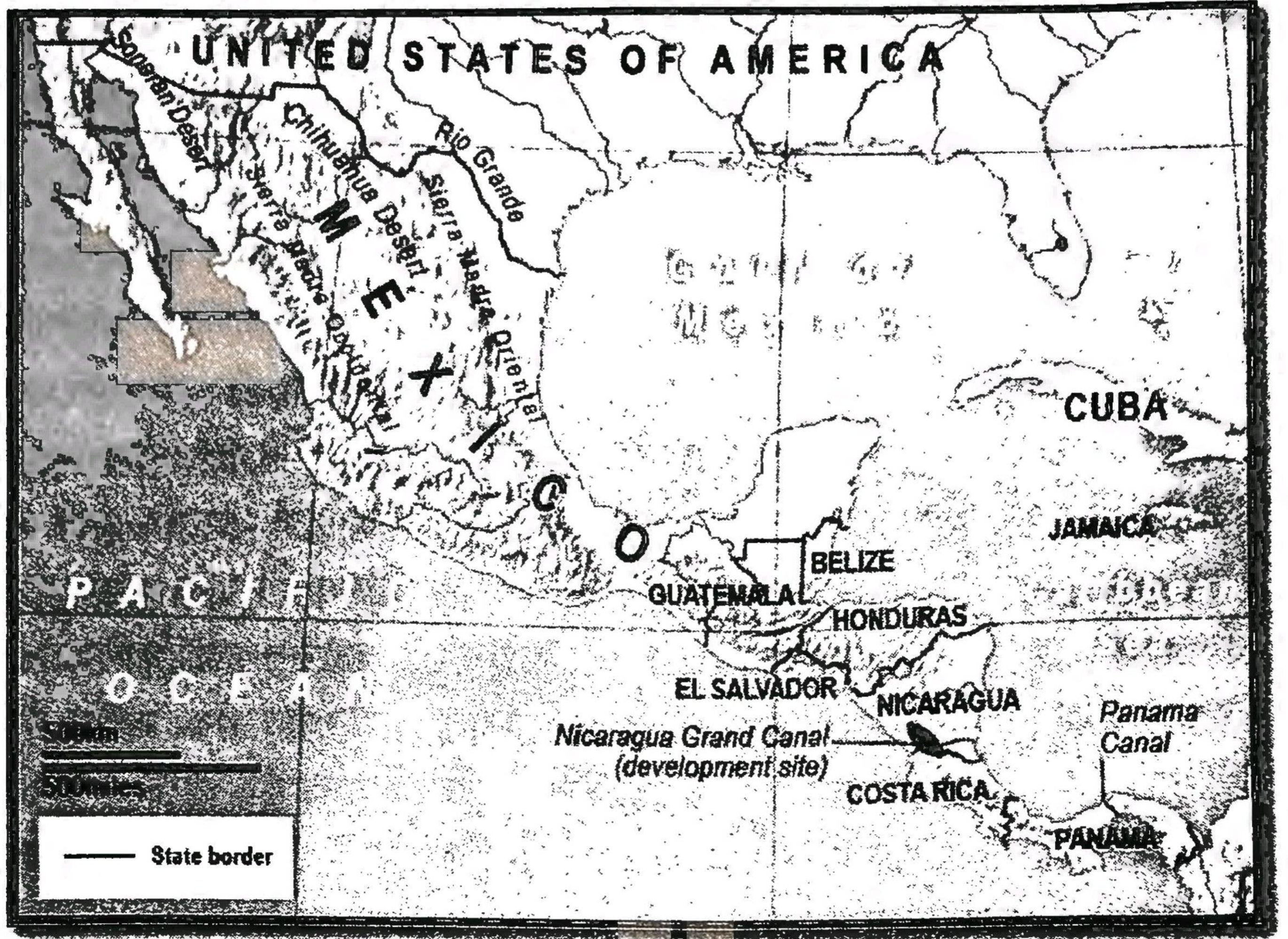
আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে চীন স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ ব্যবহার করে ম্যাপ এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারে। ফলে সংকীর্ণ এই অঞ্চলে নিজেদের সুবিধা খুঁজে বের করতে সক্ষম হচ্ছে তারা। তারা দেখতে পাচ্ছে, অবস্থানগত কারণে নিকারাগুয়া নামের ছোট্ট দেশটি তাদেরকে ব্যবসায়িক দিক

দিয়ে নানারকম সুবিধা দিতে পারবে। প্রস্তাবিত "নিকারাগুয়ার গ্র্যান্ড ক্যানাল" বাস্তবায়িত হলে মধ্য অ্যামেরিকার পুরো পরিস্থিতিই বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে এই খাল অতি উচ্চাভিলাষী একটি ভাবনা।

তবে, এর আগে ছোট্ট করে পানামা খালের ইতিবৃত্ত জানা যাক। ১৫১৩ সালে স্প্যানিশ অভিযাত্রী ভাসকো নুনেজ ডি বালবোয়া আটলান্টিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। তিনিই সর্বপ্রথম পানামা উপকূলে এসে নামেন। সেখান থেকে জংগল আর পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে পৌঁছে যান আরেক বিশাল মহাসাগরের তীরে। প্রশান্ত মহাসাগর নামে এখন আমরা চিনি তাকে। সে সময়েই বুঝা যায় যে, এই দুই মহাসাগরকে সংযুক্ত করতে পারলে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে পরবর্তী ৪০১ বছরেও ভৌগোলিক এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৯১৪ সালে ৫০ মাইল দীর্ঘ পানামা খাল উদ্বোধন করা হয়। এর নিয়ন্ত্রণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। পানামা খালের কারণে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার দূরত্ব অন্তত ৮০০০ মাইল কমে যায়। এর ফলে পানামায় অভাবনীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

১৯৯৯ সাল থেকে পানামা খালকে পানামার অধীনেই ধরা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এটা একটা আন্তর্জাতিক মুক্তাঞ্চল। অ্যামেরিকা আর পানামার নৌবাহিনী যৌথভাবে এই খালের নিরাপত্তা বিধান করছে। আর চীনের সমস্যাটা এখানেই।

পানামা আর যুক্তরাষ্ট্র হলো বন্ধুদেশ। তাদের বন্ধুত্ব এতটাই যে ২০১৪ সালে পানামাকে "যুক্তরাষ্ট্রের চামচা" হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভেনিজুয়েলা। ভেনিজুয়েলা বিগত কিছুদিন ধরে ক্রমাগতভাবে বিপ্লবী বলিভারিয়ান মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রই এতদিন ধরে তাদের সব থেকে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকৃত তেলের ১০ শতাংশই আসে ভেনিজুয়েলা থেকে। তবে জ্বালানিশক্তি নিয়ে তাদের এই বন্ধুত্ব এখন শেষ হওয়ার পথে। যুক্তরাষ্ট্র এখন শেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি উৎপাদন করছে। অপরদিকে, বেইজিং ভেনিজুয়েলা থেকে তেল নিতে আগ্রহী। পানামা খাল ব্যবহার না করেই কীভাবে এই কাজটি করা যায় তারা এখন সেই উপায় খুঁজছে।



চিত্র: মধ্য অ্যামেরিকা অঞ্চলে চীনের বিনিয়োগের ফলে নানারকম সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেছে। তারই একটি হলো নিকারাগুয়া গ্রান্ড ক্যানাল প্রকল্প।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি চীন বৈশ্বিক পরাশক্তি হতে চায়। আর এজন্য তাদের প্রয়োজন বাণিজ্য এবং নৌবাহিনীর জন্য সাগরপথের নিয়ন্ত্রণ। পানামা খাল বাহ্যিকভাবে একটি নিরপেক্ষ জলপথ হিসেবেই বিবেচিত হয়। কিন্তু এই জায়গাটা মূলত চলছে যুক্তরাষ্ট্রের ইশারায়। তাই চীনের এখন নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন নতুন একটা খাল দরকার। এই কাজটিই তারা করতে চাচ্ছে নিকারাগুয়ায়। আর এর জন্য তাদের খরচ হবে কম করে হলেও ৫০ বিলিয়ন ডলার। একটা বৈশ্বিক পরাশক্তির জন্য ৫০ বিলিয়ন ডলার আর এমন কী খরচ!

"নিকারাগুয়া গ্র্যান্ড ক্যানাল" নামক এই প্রকল্পটির অর্থায়ন করছেন ওয়াং জিং নামে হংকংয়ের একজন ব্যবসায়ী। টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যবসা করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তবে প্রকৌশল বিষয়ে তার ধারণা সামান্যই। অথচ, তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পের

মাস্টারমাইন্ড হয়ে বসে আছেন। তিনি আবার এও বলেছেন যে চীনের সরকার এই প্রকল্পের সাথে জড়িত নয়। চীনের ব্যবসায়িক নীতি, আর সেইসাথে সবকিছুতেই চীন সরকারের নাক গলানো স্বভাবের কথা বিবেচনা করলে এরকমটা হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। এই প্রকল্পটা ২০২০ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

৫০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগটা বিশাল, নিকারাগুয়ার সার্বিক অর্থনীতির চারগুণ। তবে, এই বিনিয়োগ লাতিন অ্যামেরিকায় চীনের সার্বিক বিনিয়োগের অংশবিশেষ মাত্র। যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের মূল ব্যবসায়িক অংশীদার। চীন ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করছে। জনাব ওয়াংকে আর্থিক সহায়তা কে দিচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। আর নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট দানিয়েল ওর্তেগাও এতকিছু ভাবেননি। তিনি এই খাল খনন প্রকল্পের প্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথেই রাজি হয়ে যান। এই প্রকল্পের কারণে যে অন্তত ১,২০,০০০ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাও আমলে নেননি তিনি।

ওর্তেগা এককালে আগুনখেকো স্যান্দিনিস্তা সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আর এখন তাঁকে পুঁজিবাদের খাতায় নাম লেখানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এই খাল খনন করা হলে দেশটি দুইভাগে বিভক্ত হবে। পারাপারের জন্য পুরো খালের ওপর থাকবে একটিমাত্র সেতু। ওর্তেগা জানতেন, তার এই সিদ্ধান্তের কারণে নানারকম বিতর্ক সৃষ্টি হবে। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তার যুক্তি ছিল- এই খালের কাজ শেষ হলে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। নতুন নতুন বিনিয়োগ আসার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন আশাবাদী। পশ্চিম গোলার্ধের দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশটির ভাগ্য এই খালটি বদলে দেবে বলে তার ধারণা ছিল। নিকারাগুয়া গ্র্যান্ড ক্যানাল পানামা ক্যানালের চেয়েও দীর্ঘ এবং গভীর হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে দিয়ে ট্যাংকার এবং কন্টেইনার জাহাজ পার হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে চীনের বিশাল বিশাল সামরিক জাহাজও এই খাল দিয়ে পার হওয়ার সুযোগ ছিল। এই খালের মধ্যবর্তী অংশে পড়ে নিকারাগুয়া হ্রদ। এই হ্রদে খননকাজ চালিয়ে একে বড় জাহাজ চলাচলের উপযোগী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরিবেশবাদীরা সতর্ক করে দেন, লাতিন অ্যামেরিকার সর্ববৃহৎ

মিঠা পানির হ্রদটি এতে দূষিত হবে। কিন্তু ওর্তেগা এসব কথায় কান দেননি। এই খাল খননের জন্য ২০১৩ সালে ওয়াং জিং-এর কোম্পানির সাথে ৫০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে নিকারাগুয়া সরকার। কিন্তু এরপরে আর কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের স্টক মার্কেটে ধ্বস নামায় নিজের সম্পদের ৮৫ শতাংশই হারাতে হয় জনাব ওয়াংকে। ফলে নিকারাগুয়া খালের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর এই পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হওয়ায় ২০২৪ সালে চুক্তি বাতিল করে দেয় নিকারাগুয়া সরকার।

এখানে আরো একটি ভাবনার বিষয় হচ্ছে, প্রস্তাবিত নিকারাগুয়ান গ্র্যান্ড ক্যানাল পানামা খাল থেকে মাত্র ১০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কাছাকাছি দুইটি জায়গার মধ্যে এরকম দুইটি খাল কি আদৌ দরকার আছে? চীন তাহলে কেন এই খালের জন্য এত উঠেপড়ে লেগেছে- এই প্রশ্ন তুলছেন সন্দেহবাদীরা। চীনের বড় বড় জাহাজগুলো যেন এখান দিয়ে যেতে পারে এজন্যই চীন এই খালটি খননে অর্থায়ন করতে চেয়েছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিকারাগুয়ায় এই ক্যানাল তৈরি হলেও এখান থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে চীনের কয়েক দশক লেগে যেত। আসলে, চীনের কাছে এই প্রকল্পটা যতটা না বাণিজ্যিক তার চেয়েও বেশি জড়িত জাতীয় নীতি আর অহমের সাথে। দুই সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাটা লাতিন অ্যামেরিকায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের ধ্বজা ধারণ করে থাকত। আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তারে অনেকদিন ধরেই কাজ করে যাচ্ছে চীন। এর পাশাপাশি গত বিশ বছর যাবৎ তাদের মনোযোগ পড়েছে রিও গ্রান্দের দক্ষিণ দিকে।

এই অঞ্চলের নানা নির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগের পাশাপাশি লাতিন অ্যামেরিকার বিভিন্ন সরকারকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে চীন। আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা এবং ইকুয়েডর হলো তাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঋণগ্রহীতা। এর বিনিময়ে, আঞ্চলিক দাবিগুলোর বিষয়ে জাতিসংঘে এই দেশগুলোর সমর্থন চায় চীন। বিশেষ করে তাইওয়ানের ব্যাপারে সমর্থন তাদের বেশি দরকার।

বেইজিং এই অঞ্চল থেকে আমদানিও করছে বর্তমানে। লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতি দ্বারাই প্রভাবিত ছিল এতদিন।

যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাথে বিভিন্ন রকম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করে এসেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নেও একই কাজ করেছে তারা। চীনও সেই পথেই পা বাড়াচ্ছে। চীনের কারণে লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলোর হাতে এখন বিকল্প ব্যবসায়িক অংশীদার আছে। ফলে পণ্যের বাজার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব কমে আসছে। এর মধ্যেই ব্রাজিলের মূল ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিস্থাপন করে ফেলেছে চীন। অন্যান্য লাতিন দেশগুলোর সাথেও তারা এই একই কাজ করবে।

লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলো কখনোই মার্কিনপন্থী ছিল না। তারা নিজ থেকে কখনো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক মূলত যুক্তরাষ্ট্রই নির্ধারণ করে এসেছে এতদিন। এর সূচনা হয় মনরো অধ্যাদেশের মাধ্যমে। ১৮২৩ সালের স্টেট অব দি ইউনিয়ন ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন- লাতিন অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উঠানের মতো। আর এই অঞ্চল তাদের প্রভাব-বলয়েই থাকবে। এরপর থেকে তারাই এই অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। আর এই নিয়ন্ত্রণ খুব একটা শুভ ফল বয়ে আনেনি বলেই মনে করে লাতিন অ্যামেরিকার অনেক মানুষ।

প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর ঐতিহাসিক মতবাদ প্রবর্তনের আট দশক পরে আরেকজন মনরোর উদয় হয়! তিনি হলেন থিওডর 'টেডি' রুজভেল্ট। ১৯০৪ সালের এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "মনরো মতবাদে যেমনটি বলা আছে সে অনুযায়ীই পশ্চিম গোলার্ধে তার ক্ষমতার ব্যবহার করবে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যায্য কিছু হতে দেখলে আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করব। আন্তর্জাতিক পুলিশ হিসেবেও এই অঞ্চলে আমরা ভূমিকা পালন করতে পারি।" সহজ কথায় এর সারমর্ম হলো, যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম গোলার্ধে যখন খুশি তখন সেনা মোতায়েন করবে। বিপ্লবের অর্থ যোগানো ছাড়াও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে এই কাজটি তারা নিষ্ঠার সাথেই করে এসেছে। ১৮৯০ সাল থেকে শুরু করে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লাতিন অ্যামেরিকায় অন্তত ৫০ বার শক্তি প্রয়োগ করেছে তারা।

এরপর থেকে অতিরিক্ত নাক গলানোর হার কমতে শুরু করে। ২০০১ সালে অর্গানাইজেশন অফ অ্যামেরিকান স্টেটস কর্তৃক প্রণীত চৌত্রিশ-জাতির আন্তঃঅ্যামেরিকান গণতান্ত্রিক সনদে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে ঘোষিত ছিল "দুই অ্যামেরিকা মহাদেশের জনগণেরই গণতন্ত্রের অধিকার রয়েছে এবং এই অঞ্চলের দেশগুলোর সরকারও গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রতিরক্ষায় দায়বদ্ধ।" তখন থেকে সরকার বদল বা বিপ্লবে অর্থায়নের বদলে লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলাকেই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এই লক্ষ্যে "নর্থ অ্যামেরিকান ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশন" বা "সেন্ট্রাল অ্যামেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট"-এর মত বাণিজ্য জোট তৈরি করেছে তারা।

উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার মধ্যে ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্কে সত্যিকারের কোনো উষ্ণতা ছিল না কখনোই। এই কারণেই চীন এসে দুয়ারে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তাদের জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বেইজিং বর্তমানে উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, চিলি, পেরু ও মেক্সিকোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে, দিচ্ছে নানারকম সামরিক সহযোগিতা। এসব দেশের সাথে সামরিক বিনিময় কর্মসূচিও চালাতে চাইছে। "মিলিটারি একচেঞ্জ" বা সামরিক বিনিময় বলতে সেনাবাহিনীর "অফিসার", "ট্রেইনিং" এবং "কার্যক্রম" এই তিন ধরনের বিনিময়কেই বুঝানো হয়। বর্তমানে তারা ভেনিজুয়েলার সাথেও সামরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চীন মনে করছে একবার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে এমনকি বলিভারিয়ান বিপ্লব শেষ হয়ে গেলেও এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে তারা লাতিন অ্যামেরিকায় যে পরিমাণে কূটনৈতিক বিনিয়োগ করছে তার তুলনায় অস্ত্র সরবরাহ একেবারেই তুচ্ছ। ২০১১ সালে চীন তাদের জাহাজ-হাসপাতাল "পিস আর্ক" ল্যাতিন অ্যামেরিকায় নিয়ে এসে সেবা কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। এই জাহাজ-হাসপাতালটি ছিল ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের ১০০০ শয্যার জাহাজ-হাসপাতালের তুলনায় যদিও এটা খুবই ছোট। তবে, চীনের মানবিক সাহায্য প্রদানের এই প্রচেষ্টা লাতিন অ্যামেরিকায় তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে চীন আরেকটা বার্তাও দিতে পারছে। সেটা হলো, তারা এখন নিজেদের প্রতি সমর্থন বাড়াচ্ছে।

তবে চীনের বাণিজ্যিক প্রভাব থাকুক বা না থাকুক লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলো তো আর ভৌগোলিক অবস্থান পাল্টাতে পারবে না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই এই অঞ্চলের বড় খেলোয়াড় হয়ে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা লাতিন অ্যামেরিকার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না।

ব্রাজিলকে দিয়ে এই ব্যাপারটা বুঝানো যায়। ব্রাজিল একটি বিশাল দেশ। দক্ষিণ অ্যামেরিকার মোট স্থলভাগের এক তৃতীয়াংশই ব্রাজিলের দখলে। দেশটি আয়তনে প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমান। ২৭ টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ব্রাজিলের আকার ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশের সম্মিলিত আকারের থেকেও বড়। কিন্তু একটি ধনী এবং প্রভাবশালী দেশ হওয়ার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অবকাঠামো দরকার, তা ব্রাজিলের নেই। ব্রাজিলের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে জঙ্গল। এই জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা একদিকে যেমন প্রচণ্ড ব্যয়বহুল, তেমনি এর কিছু এলাকার ধ্বংসসাধন করাও বেআইনি। আমাজন বনের ক্ষতি সাধনের ফলে ব্রাজিল হয়তো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু এর ফলে গোটা পৃথিবীর বাস্তুসংস্থানের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে। তবে আপাতত পরিবেশের চাইতে নিজেদের আবাসন আর কৃষি নিয়েই ব্রাজিল বেশি উদ্বিগ্ন। ফলে সরকারের অনুমোদনেই আমাজন বন কেটে এবং পুড়িয়ে কৃষিজমি বের করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু এসব করে খুব যে লাভ হচ্ছে, তা নয়। এই অঞ্চলের মাটি চাষের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। চাষ শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যেই এখানে আর ফসল উৎপাদন করা যায় না। ফলে কৃষকেরা নতুন নতুন জায়গায় রেইনফরেস্ট কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একবার এসব জঙ্গল কেটে ফেললে সেখানে আবার জঙ্গল ফিরে আসতে বহু সময় লেগে যায়। জলবায়ু আর মাটি দুইটিই প্রতিকূল হওয়ায় ব্রাজিল কৃষিখাতে উন্নতি করতে পারছে না।

আমাজন নদীর কিছু অংশ পরিবহনের জন্য উপযোগী বটে, কিন্তু তীরগুলো বেশিরভাগই কর্দমাক্ত। আশেপাশের ভূমিও নির্মাণকাজের উপযোগী নয়। ব্রাজিলে অর্থকরী ভূমি কম থাকার পেছনে এটাও অন্যতম কারণ। আমাজন অঞ্চলের দক্ষিণে আছে উচ্চভূমি। আর এই উচ্চভূমিতে রয়েছে ব্রাজিলিয়ান সাভানা। সাভানা মূলত তৃণভূমি হলেও এই ধরনের তৃণভূমিতে

কিছু দূর পরপর বড় গাছ থাকে। ব্রাজিলের সাভানা অঞ্চলে কৃষিখাতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। পঁচিশ বছর আগে এই অঞ্চলকে চাষাবাদের অযোগ্য বলা হয়েছিল। কিন্তু ব্রাজিল নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহার করেই এই অঞ্চলকে পৃথিবীর বৃহত্তম সয়াবিন উৎপাদক অঞ্চলে পরিণত করেছে। এছাড়া দেশটিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ফলে ব্রাজিল এখন অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

সাভানার দক্ষিণে আছে ব্রাজিলের প্রথাগত কৃষিজমি। এই অংশটা দক্ষিণ অ্যামেরিকারও দক্ষিণাঞ্চল। এখানে ব্রাজিলের সাথে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও চিলির সীমান্ত রয়েছে। পর্তুগিজ ঔপনিবেশিকরা ব্রাজিলের এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলটিতেই প্রথমে বসবাস শুরু করেছিল। এর প্রায় তিনশত বছর পরে দেশের এই প্রাণকেন্দ্রটি থেকে সরে অন্যান্য অংশে বসবাস শুরু করে তারা। তা সত্ত্বেও, এখনও ব্রাজিলের উপকূলবর্তী অঞ্চলেই বেশিরভাগ মানুষ বাস করে। এক নাটকীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে রিও ডি জেনেরিও থেকে কয়েকশ মাইল ভেতরে ব্রাসিলিয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ব্রাজিলের কেন্দ্রে উন্নয়ন ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে জনবসতির বিন্যাসে খুব একটা পরিবর্তন যে হয়েছে, তা বলা যায় না।

দক্ষিণের কৃষি অঞ্চল আকারে স্পেন, পর্তুগাল এবং ইতালির সম্মিলত আয়তনের সমান। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে সমতল। এই অঞ্চলের ভূমিতে পানির সরবরাহ ভালো। কিন্তু এই জমিগুলোর বেশিরভাগই ভেতরের দিকে হওয়ায় এসব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। অবশ্য ব্রাজিলের বেশিরভাগ অঞ্চলের অবস্থাই এমন। ব্রাজিলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষ এক ধরনের ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। হঠাৎ করেই সাগর থেকে বিশাল খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। এসব খাড়া পাহাড় রয়েছে শহরের দুই পাশে বা পেছনে। এগুলোকে বলা হয় গ্র্যান্ড এসকার্পমেন্ট। ব্রাজিলের উপকূলে এই ধরনের অঞ্চলই বেশি। ব্রাজিলিয়ান শিল্ড নামে পরিচিত মালভূমিটি প্রায় গোটা ব্রাজিল জুড়ে বিস্তৃত। সেই মালভূমির শেষ প্রান্তে এই গ্র্যান্ড এসকার্পমেন্ট অঞ্চল।

উপকূলে সমভূমি না থাকায় শহরগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরির জন্য এই খাড়া পাহাড়গুলোর ওপর দিয়েই পথ তৈরি করতে হয়েছে। এই জটিল ভূ-প্রকৃতির কারণে ব্রাজিলে রাস্তার পাশাপাশি রেলপথ তৈরি করাও কঠিন। এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিস্তারে তারা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবেও ব্রাজিল ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না।

এর চাইতেও বড় সমস্যা আছে ব্রাজিলের। রিও দি লা প্লাতা মোহনার নদীগুলোতে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ নেই তাদের। খোদ লা প্লাতা নদী আর্জেন্টিনা হয়ে আটলান্টিকে গিয়ে মিশেছে। ফলে শত শত বছর ধরে ব্রাজিলের ব্যবসায়ীদেরকে মালামাল নিয়ে বুয়েনোস আইরেসে আসতে হয়েছে। গ্র্যান্ড এসকার্পমেন্ট এলাকার পাহাড় বেয়ে ব্রাজিলের অনুন্নত বন্দরগুলোয় যাওয়ার চাইতে এটা বরাবরই ছিল ভালো বিকল্প। টেক্সাসভিত্তিক ভূরাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থা stratfor.com হিসেব করে দেখিয়েছে ব্রাজিলের সাতটি বড় বড় বন্দর একসাথে সারা বছরে যত পণ্য খালাস করে, অ্যামেরিকার নিউ অরলিন্স বন্দর একাই তার চেয়ে বেশি সক্ষমতা রাখে।

বন্দরগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারায়, চাইলেও ব্রাজিলের পক্ষে পর্যাপ্ত বাণিজ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। নদীপথ না থাকায় তাদের বেশিরভাগ পণ্য পরিবহন করতে হয় অপর্যাপ্ত সড়কপথের মাধ্যমে। ফলে খরচও পড়ে বেশি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে তারা। সমুদ্রের বুকে যে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তা বিক্রি করে অবকাঠামো ঠিকঠাক করার খরচ মেটানো হবে। তারা চাইছে ভেনিজুয়েলা আর বলিভিয়ার ওপর থেকে জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে। তবে নিজেদের ভৌগোলিক প্রতিকূলতা দূর করতে হলে ব্রাজিলকে রীতিমতো দানবীয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ব্রাজিলের জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশই থাকে কুখ্যাত ফাভেলা বস্তিতে। একটা দেশের প্রতি চারজন মানুষের একজনই যদি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, তাহলে সে দেশের পক্ষে ধনী হয়ে ওঠা মুশকিল। তার মানে এই নয় যে ব্রাজিল উন্নতি করছে না। বর্তমানে ব্রাজিলকে উদীয়মান শক্তি হিসেবেই আখ্যা দেওয়া হয়। তবে, তাদের এই উদয়টা সীমাবদ্ধই রয়ে যাবে।

সহজ উপায়ে সমৃদ্ধির জন্য কূটনৈতিক শক্তি অর্জন বেশ কার্যকরী। তাই ব্রাজিল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। MERCOSUR-এর মত নানারকম জোট গঠনেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। দক্ষিণ অ্যামেরিকার আঞ্চলিক এই জোটে আছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে এবং ভেনিজুয়েলা। তবে এই বন্ধনকে খুব শক্তিশালী বলা যায় না। এছাড়াও, ব্রাজিলের নেতৃত্বে দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলো মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুসরণে গঠন করেছে UNASUR। দক্ষিণ অ্যামেরিকার ১২টি দেশ এর সদস্য। এর সদর দপ্তর ইকুয়েডরে হলেও ব্রাজিলই এখানে সবচেয়ে সরব। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সামান্য মিল পাওয়া যায়। EU-এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামে হলেও নেতৃত্ব দিচ্ছে জার্মানি। তবে এই দুই আঞ্চলিক জোটের মধ্যে সামঞ্জস্য বলতে এতটুকুই। ইন্টারনেটে UNASUR খুবই সরব। তাদের চমৎকার একটি ওয়েবসাইট আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক জোট হিসেবে তাদের তেমন কোনো কার্যক্রম নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধিকাংশ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা একইরকম। তাদের মুদ্রাও অভিন্ন। দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন না। তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, মুদ্রা, শিক্ষাব্যবস্থা, শ্রম আইন- সবই আলাদা। দূরত্বগত বাধাও একটা সমস্যা। বিশাল বিশাল পর্বত আর ঘন জঙ্গল তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে।

তবে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ব্রাজিল। কূটনীতি এবং সমৃদ্ধ হতে থাকা অর্থনীতি ব্যবহার করে দক্ষিণ অ্যামেরিকার পরাশক্তি হয়ে উঠতে চায় তারা। ব্রাজিল সবসময়ই আগ্রাসী নীতি পরিহার করে এসেছে। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো তাদের পররাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী। প্রতিবেশী কোনো দেশের সাথে তাদের যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুবই ক্ষীণ। তাদের সাথে নয়টি দেশের সীমান্ত রয়েছে। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ অ্যামেরিকার এগারোটি দেশের সাথেই তাদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

সীমান্ত নিয়ে উরুগুয়ের সাথে তাদের কিছু বিরোধ আছে বটে, তবে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা একদমই কম। আর্জেন্টিনার সাথে তাদের দ্বন্দ্ব আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত ফুটবল নিয়েই। খেলার মাঠের বাইরে রাজনীতির মঞ্চে

তাদের খুব একটা বিরোধ দেখা যায় না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা আর্জেন্টিনার সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দেখাদেখি আর্জেন্টিনাও একই কাজ করেছে। কিছুদিন আগে আর্জেন্টাইন নৌবাহিনীর একটি জাহাজকে নিজেদের বন্দরে স্বাগত জানিয়েছে তারা। অথচ, কয়েক বছর আগে তারা ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ব্রাজিলের এমন আচরণে আর্জেন্টিনা বেশ খুশি। কারণ ব্রিটিশদের তারা শত্রু হিসেবেই গণ্য করে। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে আর্জেন্টিনা এবং ব্রিটেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে দশকের পর দশক ধরে।

উদীয়মান শক্তি হিসেবে পরিচিত দেশগুলোর জোট BRICS-এও যুক্ত হয়েছে ব্রাজিল। এই জোটের সদস্যভূক্ত দেশগুলো হলো ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। জোটভুক্ত এই দেশগুলোকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে উদীয়মান শক্তি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু এই জোটকে বাস্তবতার বিচারে একটা ক্লাবের বেশি কিছু ভাবার সুযোগ নেই। ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক, কোনো দিক দিয়েই এই দেশগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের মিল নেই। এই অক্ষরগুলো যুক্ত হয়ে একটি শব্দ তৈরি না হলে ব্রিকস তত্ত্ব বলতে প্রকৃতপক্ষে অসারতা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। ব্রিকস নিয়মিতভাবে বার্ষিক সম্মেলন করে থাকে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ব্রাজিল মাঝেমধ্যে একাত্মতা পোষণ করে। এদের কর্মকাণ্ডে শীতল যুদ্ধের আমলের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই তিনটি দেশকে কখনো চীন ও রাশিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে মার্কিন বিরোধিতা করতে দেখা যায় না।

উত্তর আর দক্ষিণ অ্যামেরিকার দুই দানব দেশের মধ্যে ২০১৩ সালে একটা বিষয় নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছিল। এটা আজো ব্রাজিলকে পীড়া দেয়। খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। এর ফলে তিনি ওয়াশিংটন সফর বাতিল করতে বাধ্য হন। ওবামা সরকার এই বিষয়ে কখনোই ক্ষমা চায়নি। যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে দিয়ে চীন ব্রাজিলের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়েছিল ওয়াশিংটন। আর এর প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তারা এমন

আচরণ করেছে। এর জবাব হিসেবেই ব্রাজিল তার বিমান বাহিনীর জন্য বোয়িং এর বদলে সুইডেন থেকে ফাইটার জেট কেনে বলে ধারণা করা হয়। যাই হোক, রাষ্ট্রপতি পর্যায়ের সম্পর্ক সেইভাবে পুনর্গঠিত না হলেও দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের আমলের ভেনিজুয়েলার মতো করে রুখে দাঁড়ানো ব্রাজিলের ধাঁচ নয়। ব্রাজিলিয়ানরা জানে যে বিশ্বের চোখে তারা একটি শক্তি হিসেবেই উদিত হচ্ছে। তবে, তারা এও জানে যে তারা কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হতে পারবে না।

আর্জেন্টিনার পক্ষেও তা সম্ভব হবে না। যদিও প্রথম বিশ্বের দেশ হয়ে ওঠার সুযোগ ব্রাজিলের তুলনায় তাদেরই বেশি। তবে তাদের যে আয়তন ও জনসংখ্যা, তাতে লাতিন অ্যামেরিকার প্রধান শক্তি হয়ে ওঠাই তাদের পক্ষে কঠিন। এই শিরোপা শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের কাছেই যাবে। তবে আর্জেন্টিনার সুবিধা হলো তাদের ভূমি উন্নতমানের। আর এই সুবিধাটা ব্যবহার করে তারা দেশের মানুষকে ইউরোপীয় মানের জীবন দিতে চায়। তবে চাইলেই যে সকল সম্ভাবনা কার্যকরী হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আর্জেন্টিনা যদি নিজেদের অর্থনীতিকে ঠিকঠাক চালাতে পারে, তাহলে ভৌগোলিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে অনাস্বাদিত ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এই সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে। তখন তারা ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে, আর এর ফলে "রিও দে লা প্লাতা" অববাহিকার কৃষিভূমি চলে আসে তাদের অধিকারে। সেইসাথে তারা পায় পরিবহন সুবিধাযুক্ত নাব্য নদীপথ। আর এই নদী ধরে গোটা অঞ্চলের বাণিজ্য চলে এসেছে বুয়েনস এইরেস শহর ও সংশ্লিষ্ট বন্দরে। এই অঞ্চলটি পুরো মহাদেশের সবচেয়ে মূলবান ভূসম্পত্তিগুলোর একটি। সে-সময় থেকে আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত দিক থেকে ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং উরুগুয়ের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে আসছে আর্জেন্টিনা।

তবে এতসব সুবিধা পেয়েও তা সবসময় পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। একশ বছর আগে তারা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর একটি। ফ্রান্স এবং ইতালির চেয়েও এগিয়ে ছিল তারা। কিন্তু

অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য রক্ষা করতে না পারা, অনেকগুলো স্তরবিশিষ্ট বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যদশা, ঘনঘন সামরিক অভ্যুত্থান এবং প্রবল রাজনৈতিক মতবিরোধ তাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে দেয়নি। বিশেষ করে বিগত ত্রিশ বছরের গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে পরস্পরবিরোধী নানারকম অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ফলে তাদের দ্রুত অবনতি ঘটছে।

ব্রাজিলিয়ানরা তাদের নাক উঁচু প্রতিবেশী আর্জেন্টিনাকে নিয়ে কৌতুক করে বলে- "এরকম ধোপদুরস্থ মানুষদের পক্ষেই সম্ভব এই পরিমাণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।" আর্জেন্টিনার প্রয়োজন এই পরিস্থিতিতে বদল আনা। আর একটা "মরা গরু" তাদেরকে এই বিষয়ে সহায়তা করতে পারে। এই মরা গরু বা স্প্যানিশ ভাষায় "ভাকা মুয়েরতা" হচ্ছে আর্জেন্টিনার একটি শেল (shale) বা পাললিক শিলা অঞ্চল। এটিসহ আর্জেন্টিনার অন্যান্য শেল এলাকা থেকে যে পরিমাণ জ্বালানি তেল ও গ্যাস উৎপাদিত হবে তা দিয়ে আর্জেন্টিনার আগামী ১৫০ বছরের চাহিদা মিটবে। শুধু তাই নয়, বাড়তি কিছু রপ্তানিও করা যাবে। ভাকা মুয়েরতার অবস্থান আর্জেন্টিনার পাতাগোনিয়া অঞ্চলে, চিলি সীমান্তের গা ঘেঁষে। এই শিলা অঞ্চল আয়তনে বেলজিয়ামের সমান। দেশের আকৃতির হিসেবে ছোট মনে হলেও শেল অঞ্চলের হিসেবে এটা বিশাল। শেল থেকে উৎপন্ন শক্তির বিরোধী অবস্থানে না থাকলে এসব নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা না কারো। সমস্যা অন্য জায়গায়। শেল থেকে শক্তি উৎপাদন করতে চাইলে প্রয়োজন প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ। আর আর্জেন্টিনাকে বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব দেশ হিসেবে ধরা হয় না।

আর্জেন্টিনার একদম দক্ষিণ অঞ্চলে আরো তেল ও গ্যাস আছে। তবে সেটা এতটাই দক্ষিণে যে তা আসলে সাগরের মধ্যে। আর এই দ্বীপ এলাকাগুলো ১৮৩৩ সাল থেকে ব্রিটিশরা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আর এখানেই আছে একটা বড় সমস্যা, যে সমস্যা নিয়মিত খবরের শিরোনাম হয়ে থাকে।

ব্রিটিশরা একে বলে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আর আর্জেন্টাইনরা বলে লাস মালভিনাস। আর্জেন্টাইনরা ফকল্যান্ড শব্দটা উচ্চারণ পর্যন্ত করে না, অবমাননাকর বলে মনে করে। আর্জেন্টিনায় প্রকাশিত কোনো ম্যাপে ঐ অঞ্চলটিকে "আইলাস মালভিনাস" ছাড়া অন্য কিছু লেখা যায় না। রীতিমতো

আইন করে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারে। প্রতিটি স্কুলে বাচ্চাদের একদম ছোটবেলা থেকে এই দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব আর পশ্চিমের মূল দ্বীপ দুইটির ম্যাপ আঁকতে শেখানো হয়। "হারিয়ে যাওয়া ছোট বোন"দেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আর্জেন্টাইনরা। আর এই একটি ক্ষেত্রে তারা প্রতিটা লাতিন দেশের সমর্থন পাচ্ছে।

১৯৮২ সালের এপ্রিলে ব্রিটিশরা নজরদারিতে একটু ঢিলা দেয়। আর এই সুযোগে সামরিক একনায়ক জেনারেল গালতিয়েরির নির্দেশে আর্জেন্টিনার সেনারা দ্বীপটি দখল করে নেয়। সে-সময় এটা আর্জেন্টিনার জন্য বিশাল এক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আট সপ্তাহ পর ব্রিটিশ টাস্ক ফোর্স এসে হাজির হয় এবং আর্জেন্টাইন বাহিনীকে হটিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনাই আর্জেন্টাইন স্বৈরশাসকের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই আক্রমণ যদি বর্তমান সময়ে ঘটত (এই বই লেখার সময়কাল ২০১৫ ধরে) তাহলে ব্রিটিশদের পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় দখল করা এত সহজ হতো না। কারণ, বর্তমানে ব্রিটেনের কোনো কর্মক্ষম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নেই। তবে ২০২০ সালের মধ্যে ব্রিটিশরা এই দুর্বলতা কাটিয়ে ফেলবে। আর্জেন্টিনার সুযোগও তখন শেষ হয়ে যাবে। তবে, তেল এবং গ্যাসের প্রলোভন থাকার পরেও বর্তমান সময়ে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে আর্জেন্টাইন আক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম। এর কারণ মূলত দুইটি। প্রথমত, বর্তমানে আর্জেন্টিনা একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং তারা এও জানে যে ফকল্যান্ডের অধিকাংশ মানুষ ব্রিটিশদের অধীনে থাকতেই আগ্রহী। দ্বিতীয়ত, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশরা এখন আরো সতর্ক। দক্ষিণ আটলান্টিক ধরে ৮০০০ মাইল দূরে যাওয়ার মতো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আপাতত তাদের নেই বটে, কিন্তু সেখানে তাদের কয়েকশত যোদ্ধা মোতায়েন করা আছে। আরো আছে অত্যাধুনিক রাডার সিস্টেম, গ্রাউন্ড টু এয়ার মিসাইল এবং চারটি ইউরোফাইটার জেট। এমন কী একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনও এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে বেশিরভাগ সময়। ব্রিটিশরা চায়, দ্বীপপুঞ্জ দখল

তো দূরে থাক আর্জেন্টাইনরা যেন কোনো দ্বীপের সৈকতে নামার কথা পর্যন্ত ভুলেও না ভাবে।

আর্জেন্টিনার বিমানবাহিনীতে যেসব বিমান আছে, তার সামর্থ্য ইউরোফাইটারের ধারেকাছেও নেই। এক্ষেত্রে তারা কয়েক দশক পিছিয়ে আছে বলা যায়। আর্জেন্টিনা স্পেনের কাছ থেকে উন্নতমানের যুদ্ধ বিমান কিনতে চাইলেও ব্রিটিশ কূটনৈতিক কার্যক্রমের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। ব্রিটিশদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্কের কারণে তাদের কাছ থেকেও কেনা সম্ভব না। এইসব কারণে ২০২০ সালের মধ্যে ফকল্যান্ডে আর্জেন্টিনার আক্রমণ করার সম্ভাবনা একদমই কম।

তবে সামরিক যুদ্ধ না হলেও, কূটনৈতিক যুদ্ধ লেগেই আছে দুই দেশের মধ্যে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনা ক্রমাগতভাবে অস্ত্র শান দিয়ে যাচ্ছে। বুয়েনস এইরেস ইতোমধ্যেই সাবধানবাণী দিয়েছে, কোনো কোম্পানি যদি ফকল্যান্ড থেকে তেল উত্তোলন করে, তাহলে তাদেরকে পাতাগোনিয়ার ভাকা মুয়েরতায় শৈলপাথর থেকে তেল এবং গ্যাস উত্তোলনের লাইসেন্স দেওয়া হবে না। তাদের অনুমতি ছাড়া ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে ঘোরাফেরা করলে জরিমানা এবং হাজতবাসের বিধানও করেছে তারা। বড় বড় তেল কোম্পানি এসব কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে। শুধু ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোই আর্জেন্টিনাকে পাত্তা দিচ্ছে না। তবে দক্ষিণ আটলান্টিকের নিচে লুকিয়ে থাকা এই সম্পদ উত্তোলন করা অতি কঠিন কাজ। এই অঞ্চল প্রচণ্ড শীতল, সেই সাথে থাকে প্রবল হাওয়া। এই অঞ্চলের সাগরও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ।

দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম পৃথিবীর দক্ষিণে। এর পরে আছে বরফাচ্ছাদিত দুর্গম মহাদেশ এন্টার্কটিকা। এন্টার্কটিকায় আধিপত্য বিস্তার করতে অনেক দেশই আগ্রহী। কিন্তু নানা কারণেই এই অঞ্চল অধিগ্রহণ করা দুঃসাধ্য। একে তো চরম বৈরী আবহাওয়া, তার ওপর এন্টার্কটিক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে এন্টার্কটিকায় যে কোনো ধরনের সামরিক উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এখানে এমন কিছু আহরণযোগ্য সম্পদও নেই যার কারণে দেশগুলো উঠেপড়ে লাগবে। সব মিলে এই অঞ্চল নিয়ে অন্তত এই মুহূর্তে তেমন প্রতিযোগিতা নেই। কিন্তু এন্টার্কটিকার ঠিক বিপরীত দিকের

অঞ্চল নিয়ে এমন কথা বলা যাবে না। এন্টার্কটিকা থেকে ক্রমাগত উত্তর দিকে যেতে থাকলে, এক সময় গিয়ে পড়তে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের স্থানটিতে। আর এই এলাকাটিই একবিংশ শতকে হয়ে উঠবে সব থেকে বড় কূটনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র। কৌশলগত সুবিধা আর সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে এই এলাকায় জায়গা দখল করতে উঠে পড়ে লেগেছে ছোট বড় বহু দেশ। এলাকাটির নাম, আর্কটিক।

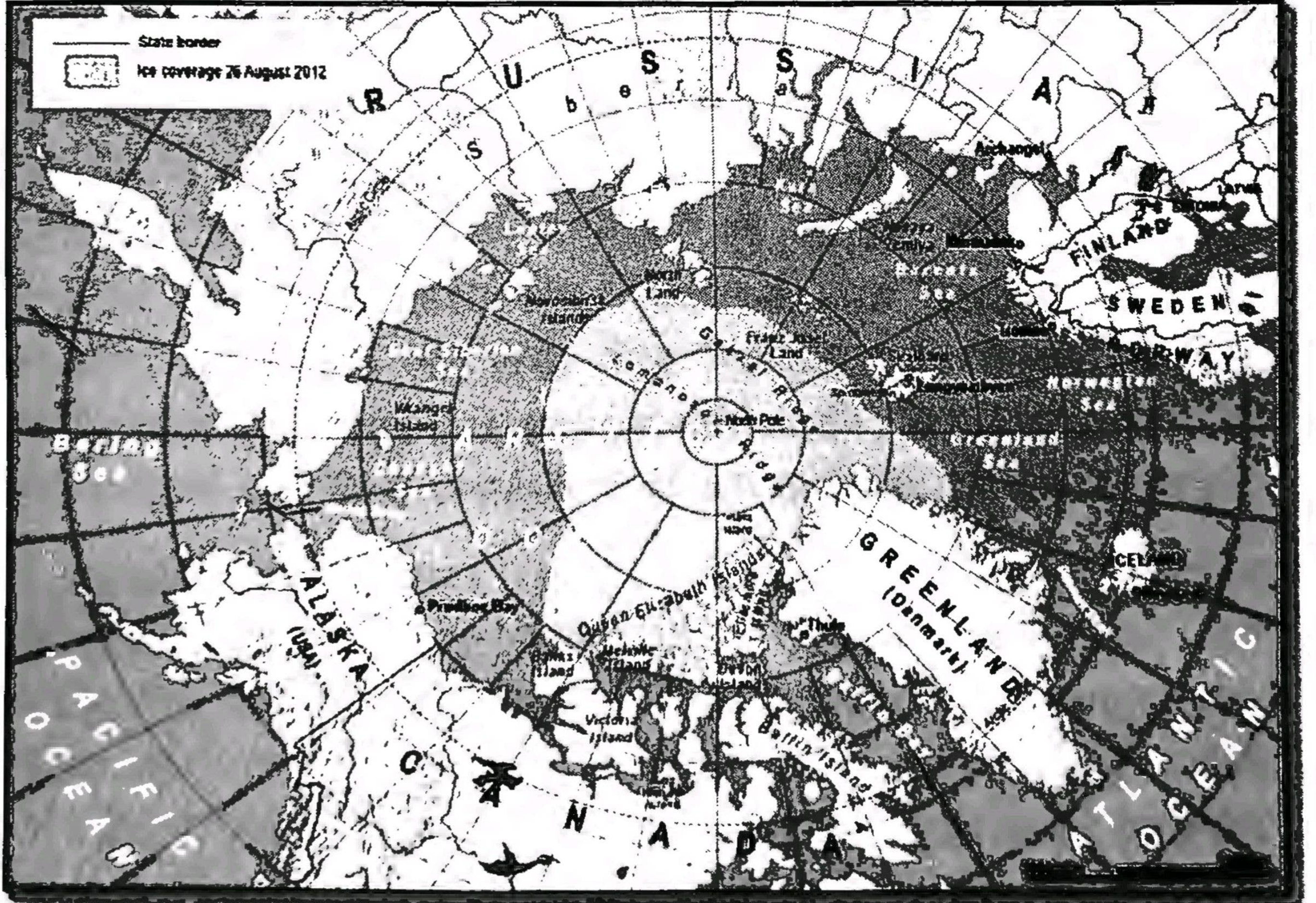
অধ্যায় দশ



আ র্ক টি ক

"আর্কটিক অঞ্চলের সমস্যার প্রকৃতি দুইরকম, বাস্তব আর কাল্পনিক সমস্যা। এর মধ্যে কাল্পনিকগুলোই সব থেকে বেশি বাস্তব।"

-ভালোহিয়ালমার স্টেফানসন, দ্যা আর্কটিক ইন ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফ্যাবল





আর্কটিক

বরফমানবরা যখন আসবে, তখন পূর্ণ শক্তি নিয়েই আসবে। কিন্তু কাদের আছে এই শক্তি? তারা হলো রাশিয়ান। আর্কটিক অঞ্চলে তাদের মত ব্যাপক উপস্থিতি আর কারও নেই। আর এই এলাকার চরম ও বৈরী আবহাওয়ায় টিকে থাকার প্রস্তুতিও তাদেরই সব থেকে বেশি। অন্য দেশগুলো এক্ষেত্রে তাদের চাইতে অনেক পিছিয়ে। আর যুক্তরাষ্ট্রকে তেমন চেষ্টা করতেই দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রকে আর্কটিক অঞ্চলের দেশ বলা হয়, কিন্তু এই অঞ্চল নিয়ে তাদের তেমন কোনো কৌশল বা নীতি নেই এখন পর্যন্ত।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব আগের চাইতেও প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে আর্কটিক অঞ্চলে। আর্কটিকের বরফ গলে যাচ্ছে। ফলে এই অঞ্চলের ঢোকা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে এসেছে। পৃথিবীর বৈরীতম এই অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া গেছে জ্বালানির বিপুল ভাণ্ডার এবং এই অঞ্চল থেকে জ্বালানি উত্তোলনের প্রযুক্তিরও উন্নয়ন ঘটেছে। এই কারণে, আর্কটিক অঞ্চলের দেশগুলো সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব কষা শুরু করে দিয়েছে। আর্কটিকের দেশগুলো এখন এমন সব বিষয় নিয়ে নিজেদের দাবি তুলেছে, যা নিয়ে এতদিন তারা মাথা ঘামানোরই প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দাবি জানানো এবং তর্কে জড়ানোর মতো অনেক কিছুই এই অঞ্চলে আছে।

আর্কটিক শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ আর্টিকোস থেকে। এর অর্থ "ভালুকের কাছাকাছি"। ভালুক হলো উরসা মেজর নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতীক, এই নক্ষত্রমণ্ডলীর আরেক নামই হলো "দ্যা গ্রেট বিয়ার"। এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সর্বশেষ তারা দুইটিকে যোগ করে যদি একটি লাইন কল্পনা করা হয়, তাহলে সেই লাইনটি গিয়ে মিশবে নর্থ স্টার বা ধ্রুবতারায় গিয়ে। অর্থাৎ, আর্কটিক শব্দের মাধ্যমে আসলে উরসা মেজর নক্ষত্রমণ্ডলী বা বলতে গেলে উত্তর দিককে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর্কটিক মহাসাগরের আয়তন ৫.৪ মিলিয়ন বর্গমাইল।

প্রকৃতপক্ষে এটা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাসাগর। তবে তারপরেও আয়তনে এটা রাশিয়ার প্রায় সমান, আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দেড়গুণ। এই মহাসাগরের বিশাল অংশ জুড়ে আছে মহীসোপান। মহীসোপানের অংশ আর কোনো মহাসাগরেই এত বেশি নয়। তাই এই অঞ্চলের কোন জায়গায় কার সার্বভৌমত্বের দাবি আছে, তা ঠিক করাটা কষ্টকর।

আর্কটিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আছে কানাডা, ফিনল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, রাশিয়া, সুইডেন এবং যুক্তরাষ্ট্র (আলাস্কা অঞ্চল)। এই অঞ্চলের প্রকৃতি চরমভাবাপন্ন। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল থাকে খুব অল্প সময়। তখন কোথাও কোথাও তাপমাত্র ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে। তবে বছরের বেশিরভাগ সময় জুড়েই এখানে শীতকাল বিরাজ করে। তাপমাত্রা তখন -৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। ভীষণ প্রতিকূল এই অঞ্চল জুড়ে আছে পাথুরে ভূমি। তীব্র শীতল বাতাস বইতে থাকে সারাবছর। এছাড়া আছে দর্শনীয় কিছু খাড়ি ও তুষারাচ্ছন্ন মেরু অঞ্চলীয় মরুভূমি। এমনকি কিছু নদীও আছে। অতিমাত্রায় বৈরী প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও আর্কটিকের অনুপম সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সালে প্রথমবারের মতো এই অঞ্চলে কোনো মানুষের পা পড়ে। তিনি ছিলেন একজন গ্রিক নাবিক। নাম তার পাইথিয়াস অফ ম্যাসিলিয়া। তিনি ‘থুলে (Thule)’ নামক এক অদ্ভুত জায়গার সন্ধান পান। দেশে ফিরে বরফে আচ্ছাদিত এই রূপকথাময় দেশ আর বিশাল সাদা ভালুকসহ অন্যান্য প্রাণী দেখার কথা বলার পরে খুব কম মানুষই তাকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু পরের কয়েক শতাব্দীতে পাইথিয়াসের মতো অনেক অভিযাত্রীই আর্কটিকের অপরূপ সৌন্দর্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বিমোহিত হয়ে আবেগে ডুবে গেছেন তাদের সকলেই।

তবে এই এলাকায় এসে প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। তাদের অধিকাংশই চেনা পৃথিবী ছেড়ে নতুন জায়গা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অভিযান চালাতে এসেছিলেন। আর্কটিক মহাসাগর জুড়ে তারা খুঁজে বেড়িয়েছেন পৌরাণিক রূপকথার 'নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ'। এই নৌপথ আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে। এসব

অভিযাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন হেনরি হাডসন। তার নামে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উপসাগরের নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু যাত্রা যে এত কঠিন হবে তা আগে জানলে হয়তো ১৬০৭ সালে তিনি অভিযানে বের হওয়ার বদলে দীর্ঘ আর শান্তিময় একটা জীবনই বেছে নিতেন। আবিষ্কারের নেশায় নাবিকদের নিয়ে অবিশ্রান্ত ভ্রমণের ফল তার জন্য শুভ হয়নি। ক্লান্ত আর বিরক্ত নাবিকদের বিদ্রোহ তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তারা বিদ্রোহ করে জাহাজ থেকে ছোট একটা নৌকায় নামিয়ে দেয় হাডসনকে।

উত্তর মেরুতে পা রাখা প্রথম অভিযাত্রী কে ছিলেন? এই ব্যাপারটার মীমাংসা করা বেশ জটিল। এই অঞ্চলের বরফ সবসময়ই চলমান। এই বরফের টুকরোগুলো নিয়মিত জায়গা পরিবর্তন করে চলেছে। আধুনিক জিপিএস প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ছাড়া কে কখন ঠিক কোন জায়গায় আছে, তা বলা কঠিন। ১৮২৭ সালে স্যার এডওয়ার্ড পেরি এই চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে গতিতে উত্তরে এগোচ্ছিলেন, তার চেয়েও বেশি গতিতে বরফ প্রবাহিত হচ্ছিলো দক্ষিণের দিকে। ফলে উত্তর দিকে এগিয়ে যাওয়ার বদলে তিনি পেছাতে থাকেন। তাই এই অঞ্চলে রাস্তা খুঁজে সঠিক জায়গায় যাওয়া খুবই কঠিন। তবে, তিনি অন্তত বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন।

ক্যাপ্টেন স্যার জন ফ্রাংকলিনের অবশ্য সেই সৌভাগ্য হয়নি। ১৮৪৫ সালে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজের অনাবিষ্কৃত একটি এলাকা অতিক্রম করার চেষ্টা করেন তিনি। তার জাহাজ দুইটি কানাডিয়ান দ্বীপমালার অন্তর্গত কিং উইলিয়াম দ্বীপের কাছে বরফে আটকে যায়। তার সাথে থাকা ১২৯ সদস্যের প্রায় সবাই মারা যায়। কেউ কেউ জাহাজের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাকিরা মারা যায় জাহাজ থেকে নেমে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করার পরে। এই অভিযাত্রীদের খোঁজে বেশ কয়েকটি অভিযান চালানো হয়েছিল, কিন্তু কাউকেই জীবিত পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে শুধু কিছু কঙ্কাল। এই অঞ্চলে বসবাসকারী ইনুইট শিকারীদের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে জানা গেছে। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকা কিছু শ্বেতাঙ্গ মানুষের মারা যাওয়ার গল্প বলেছিল তারা। জাহাজগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু ২০১৪ সালে কানাডার একটি অনুসন্ধানী দল প্রযুক্তির সহায়তায় একটি জাহাজকে খুঁজে পেয়েছে। সোনার

(Sonar) প্রযুক্তি ব্যবহার করে এইচএমএস এরেবাস নামক এই জাহাজটিকে তারা খুঁজে পায় নর্থওয়েস্ট প্যাসেজের সাগরতলে। তারা জাহাজটির ঘণ্টা তুলে নিয়ে আসে।

স্যার ফ্রাংকলিনের এমন পরিণতি সত্ত্বেও অভিযাত্রীরা ক্ষান্ত হননি। কানাডিয়ান দ্বীপমালার মধ্যে দিয়ে অভিযান চালিয়েই গেছেন তারা। তবে, নরওয়েজিয়ান অভিযাত্রী রোয়াল্ড আমুন্ডসেনের আগে কেউ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১৯০৫ সালে ছোট্ট একটা জাহাজ আর অল্প কিছু নাবিক নিয়ে তিনি এই অঞ্চল অতিক্রম করেন। কিং উইলিয়াম দ্বীপ পার হয়ে, বেরিং প্রণালি অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছে যান তিনি। স্যানফ্রান্সিসকো থেকে আসা একটি তিমি শিকারি জাহাজকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন! তার ডায়েরিতে আবেগাক্রান্ত ভাষায় এর বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি এটাও বলে গেছেন যে- এই আবেগটাই তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। তিনি লিখেছিলেন- "নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ পার হয়ে এসেছি। অবশেষে আমার ছোটবেলার স্বপ্ন পূরণ হলো। সেই মুহূর্তটায় আমার গলার ভেতর দলা পাকিয়ে উঠছিল। আমি ভীষণ ক্লান্ত আর দুর্বল বোধ করছিলাম। আমার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল"।

বিশ বছর পর তিনি তার নতুন অভিযানের ঘোষণা দেন। ঠিক করেন, উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া প্রথম মানুষ হবেন তিনি। পায়ে হেঁটে পার হওয়ার চেয়ে সেটা সহজ হলেও সময়কালের হিসেবে একেবারেই হেলাফেলার কাজ নয়। ইতালিয়ান পাইলট উমবের্তো নোবেলি এবং চৌদ্দজন ক্রুসহ একটা এয়ারশিপে করে শুরু হয় এই যাত্রা। বরফের ৩০০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে তারা ছুড়ে ফেলেন নরওয়ে, ইতালি আর যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। এই কাজটি নিঃসন্দেহে বীরোচিত। তবে, শুধু পতাকা গেঁথে দেওয়ার কারণে এই অঞ্চলের আধিপত্য বিস্তারজনিত কোনো বাড়তি সুবিধা এই তিনটি দেশ পায়নি।

জাপানের অভিযাত্রী শিনজি কাজামার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ১৯৮৭ সালে তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে মোটরবাইকে করে উত্তর মেরুতে আসেন। ইতিহাসে নিজের নাম লেখানোর জন্য তুষার ঝড় অতিক্রম করতেও

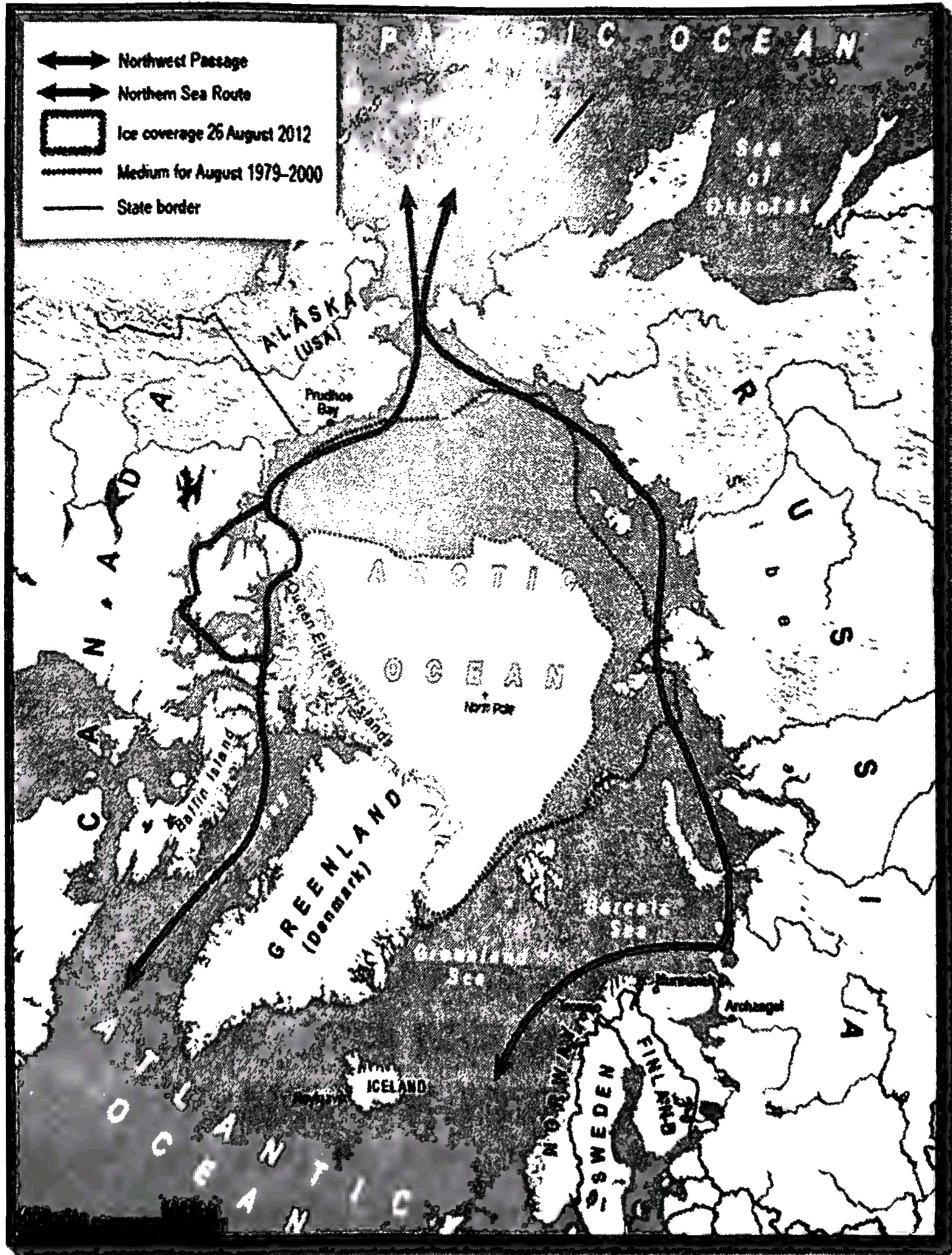
পিছপা না হওয়া মানুষ তিনি। তবে এটাও ঠিক যে, আগের অভিযাত্রীদের তুলনায় অনেক কম বরফ অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে। মেরু অঞ্চলের জমাট বরফ আগের চেয়ে কমে যাচ্ছে কি না, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কারণ, স্যাটেলাইট ইমেজিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে বরফের কমে যাওয়া। বিতর্ক আছে শুধু এর কারণ নিয়ে। এটাকে অনেকেই প্রাকৃতিক চক্র হিসেবে দেখতে চান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, এর জন্য মূলত মানুষই দায়ী। আর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের ওপরে যে শোষণ চলবে, তাতে বরফ গলে যাওয়ার হার আরো দ্রুততর হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতোমধ্যেই বেরিং সাগর ও চুকচি সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের গ্রামগুলোকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের উপকূলরেখা ক্ষয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে গেছে শিকারের এলাকাগুলোও। জীববৈচিত্র্যেও চলছে পালাবদল। মেরুভালুক আর আর্কটিক শেয়ালরা সরে যাচ্ছে। সিন্ধুঘোটকেরা জায়গা হারাচ্ছে। মাছেরা তো আর সীমানার কথা জানে না। তারা চলে যাচ্ছে আরো উত্তরে। এর ফলে কিছু দেশ হারাচ্ছে জলজ সম্পদের মজুদ, আবার অন্যরা এতে লাভবান হচ্ছে। আর্কটিক অঞ্চলের ট্রলারগুলোর জালে এখন ধরা পড়ছে ম্যাকারেল আর আটলান্টিক কড।

আর্কটিকের বরফ গলার প্রভাব যে শুধু এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে, ব্যাপারটা এমন না। এর প্রভাব পড়বে অনেক দূরের দেশেও, যেমন- মালদ্বীপ, বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডে। এসব দেশের সমুদ্রসীমার উচ্চতা বাড়ার পাশাপাশি বন্যার হারও বেড়ে যাবে। এসব কারণেই আর্কটিক অঞ্চল এখন পুরো বিশ্বের আলোচনায় চলে এসেছে।

বরফ গলে যাওয়ার সাথে সাথে আর্কটিকের তুন্দ্রা অঞ্চল উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। আর এর ফলে সম্ভাব্য দুইটি বিষয় ঘটতে চলেছে। আর এই কারণে আইস ক্যাপের বরফ আরো দ্রুত গলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথমত, এই অঞ্চলে এখন যেসব ভারী শিল্পের কার্যক্রম চলবে, তা থেকে বর্জ্য নিষ্কাশিত হয়ে বরফের ওপরেই রয়ে যাবে। এর ফলে তাপ প্রতিফলন করার মত এলাকা কমে আসবে এবং বরফ গলার হার বাড়বে। বরফ গলে গেলে নিচ থেকে গাঢ় রঙের জমি বেরিয়ে আসবে। বরফ আর তুষার যতটুকু তাপ শোষণ করত,

তার তুলনায় অনেক বেশি শোষণ করবে এই গাঢ় রঙের জমি আর উন্মুক্ত জল। ফলে গলতে থাকবে বরফ, বাড়তে থাকবে এই গাঢ় রঙের অঞ্চলের পরিমাণ। একে বলা হয় 'আলবেদো ইফেক্ট'। তবে এতসব নেতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি কিছু ইতিবাচক দিকও আছে। উষ্ণ হতে থাকা তুন্দ্রা অঞ্চলে বেশি বেশি গাছ জন্মাবে। এই অঞ্চল কৃষির উপযোগী হয়ে উঠবে। এখানে বসবাসরত মানুষদের জন্য খাদ্যের নতুন যোগান সৃষ্টি হবে।



চিত্র- স্যাটেলাইট চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে আর্কটিক অঞ্চলে বরফ কমছে। এর ফলে সাগর থেকে এখানে প্রবেশ করা সহজতর হচ্ছে।

বহু বছর ধরে অধরা থেকে যাওয়া এই অঞ্চল যে আর ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে না, এই ব্যাপারটা এখন নিশ্চিত। জলবায়ু বিষয়ক কিছু ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জানা যায় যে একবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে গ্রীষ্মকালে আর্কটিক অঞ্চলে আর বরফ থাকবে না। কেউ কেউ বলছেন এই ঘটনা আরো অনেক দ্রুতও ঘটতে পারে। তবে যখনই ঘটুক, ঘটার প্রক্রিয়া যে শুরু হয়েছে এবং নাটকীয় দ্রুততায় ঘটে চলেছে তা নিশ্চিতভাবেই বলে দেওয়া যায়। বরফ ছাড়া আর্কটিক অঞ্চল, ভাবা যায়!

এই বরফ গলার প্রভাব হিসেবে এই অঞ্চলে মালাবাহী জাহাজের আনাগোনা বেড়ে গেছে। কানাডিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ হয়ে প্রতি গ্রীষ্মেই কয়েক সপ্তাহ ধরে জাহাজ যাতায়াত করতে পারছে। ফলে ইউরোপ থেকে চীনে যেতে এখন অন্তত এক সপ্তাহ কম সময় লাগছে। ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো কোনো কার্গো জাহাজ আইসব্রেকার জাহাজের সহায়তা ছাড়াই এই অঞ্চল অতিক্রম করার সুযোগ পায়। ২৩,০০০ টন নিকেল নিয়ে নুনাভিক নামের এই জাহাজটি কানাডা থেকে চীনে গিয়ে পৌঁছায়। এই পথ দিয়ে গেলে এতদিন পানামা খাল হয়ে যে পথে জাহাজ যেত তার থেকে ৪০ শতাংশ পথ কমে যায়। পানামা খালের তুলনায় গভীরতাও বেশি পাওয়া যায়, আর গভীরতা বেশি হলে জাহাজটিতে অনেক বেশি মাল বহন করা সম্ভব হয়। আর এর ফলে তেলের খরচও বাঁচে অনেক। হিসেব করে পাওয়া যায় যে- এই পরিমাণে তেল কম পোড়ায় প্রায় ১৩০০ টন কার্বন কম নিঃসরিত হয়েছে। ২০৪০ সাল নাগাদ এই পথটি বছরে দুই মাসের জন্য খোলা থাকবে বলে আশা করা যায়। এর প্রভাবে উত্তর অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য বেড়ে চলবে। অন্যদিকে সুয়েজ খাল এবং পানামা খালের ওপর নির্ভর করা দেশগুলো, যেমন মিশর ও পানামার আয় কমে যাবে। আটলান্টিক থেকে ব্যারেন্টস সাগর হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আসার পথটিকে রাশিয়ানরা বলে উত্তরের সাগরপথ। সাইবেরিয়ার উপকূল ঘেঁষে যাওয়া এই পথটি বর্তমানে বছরে কয়েক মাসের জন্য খোলা থাকছে। সমুদ্রের মহাসড়ক হিসেবে এই পথটির জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

জলপথে বাণিজ্যের পাশাপাশি আর্কটিকের এই গলতে থাকা বরফ নিয়ে আসছে নতুন অনেক সম্ভাবনা। ধারণা করা হয় আর্কটিকের কিছু অঞ্চলে সঞ্চিত আছে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস। বরফ গলে যাওয়ায় সেসব অঞ্চলে যাওয়া এখন সহজ হয়ে গেছে। ২০০৮ সালের একটি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা অনুযায়ী, আর্কটিক অঞ্চলে সঞ্চিত আছে ১৬৭০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট প্রাকৃতিক গ্যাস, ৪৪ বিলিয়ন ব্যারেল প্রাকৃতিক গ্যাসীয় তরল এবং ৯০ বিলিয়ন ব্যারেল তেল। আর এর অধিকাংশই আছে সাগরের বুকে। যত বেশি এলাকা যাতায়াত যোগ্য হচ্ছে, বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনাও ততই বাড়ছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় সোনা, জিংক, নিকেল ও লোহা পাওয়া গেছে। এসব মূল্যবান ধাতুর আরো বড় বড় মজুদ আবিষ্কারের সম্ভাবনাও আছে।

বিশাল কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে এসব এলাকায় অনুসন্ধানী খননকাজ চালানোর জন্য লাইসেন্সের আবেদন করেছে। এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে আছে এক্সনমবিল, শেল এবং রোজনেফট। তবে আর্কটিকের এই বিশাল সম্পদ চাইলেই যে পাওয়া যাবে, এমন নয়। এর জন্য অনেক ঝক্কি পোহাতে হবে বিভিন্ন দেশ এবং কোম্পানিগুলোকে। এখানে বছরের একটা বড় সময় ধরে সূর্যের দেখা পাওয়া যাবে না। সমুদ্রের জল ছয় ফিট নিচ পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে থাকে বছরের বেশিরভাগ সময়। আর উন্মুক্ত সাগরে সৃষ্টি হতে পারে ৪০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতার ঢেউ।

এখানে কাজ করাটা শুধু কঠিনই না, বিপজ্জনকও বটে। বিশেষ করে কারো যদি সারাবছর ধরে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই! এসব কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগও প্রয়োজন হবে। অনেক জায়গাতেই গ্যাসের পাইপলাইন বসানো সম্ভব হবে না। তরলীকরণের জন্য সাগরের বুকে বসাতে হবে ভীষণ জটিল সব যন্ত্রপাতি। এই প্রক্রিয়াটা যেমন জটিল, তেমনই ব্যয়বহুল। তবে এসবের বিনিময়ে যে কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে তা অমূল্য। তাই এই জায়গায় দখল কায়েম করে খনন শুরু করা থেকে বড় দেশগুলোকে বিরত রাখা অসম্ভব। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে এবং নতুন নতুন অঞ্চলকে নিজেদের অংশ হিসেবে

দাবি করতে এগিয়ে যাবে তারা। পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাবে না।

কবে কোন অভিযাত্রী এসে আর্কটিকে পতাকা পুঁতে রেখে গিয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করে সার্বভৌমত্বের দাবি তোলা সম্ভব নয়। এর জন্য আছে United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)। এই আইন অনুযায়ী, একটি দেশ তার উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত (যদি অন্য দেশের সাথে সীমানা মিলে না যায়) এলাকার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার পাবে। নিজেদের আওতার এই এলাকাকে বলা হয় একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল বা Exclusive Economic Zone (EEZ)। EEZ অঞ্চলে থাকা তেল এবং গ্যাস ওই দেশটির সম্পত্তি বলেই গণ্য হবে। কিছু কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে, বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে যদি কোনো দেশসংলগ্ন মহীসোপানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে তারা এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমা উপকূল থেকে ৩৫০ নটিকাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবে।

আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলার সাথে সাথে আর্কটিক কাউন্সিলের আটটি দেশের কার্যধারাও বদলে গেছে। এই ফোরামে এসে ভূ-রাজনীতি বদলে গিয়ে ভূ-মেরুনীতিতে পরিণত হয়েছে। আর্কটিক কাউন্সিলের মূল সদস্য পাঁচটি দেশ। কানাডা, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক (ডেনমার্ক আছে গ্রিনল্যান্ডের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার কারণে)। এই পাঁচটি দেশ আর্কটিক সাগরকে ছুঁয়ে থাকায় তাদেরকে একত্রে 'আর্কটিক ফাইভ' বলা হয়ে থাকে। এই পাঁচটি দেশের পাশাপাশি আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনও পূর্ণ সদস্য হিসেবে আছে। আর্কটিক অঞ্চলের ওপর আর্কটিক দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌম অধিকার এবং এখতিয়ার স্বীকার সাপেক্ষে এই অঞ্চলে নানা কর্মকাণ্ড চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে আরো ১২টি দেশকে স্থায়ী পর্যবেক্ষকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আর্কটিক অঞ্চলে চালানো বৈজ্ঞানিক অভিযানে পৃষ্ঠপোষকতা করায় ২০১৩ সালে ভারত ও জাপানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নরওয়ের একটি দ্বীপে চীনের একটি বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র মেরু অঞ্চলের বরফ

ভেঙে চলাচলের জন্য একটি আধুনিক আইসব্রেকার জাহাজ থাকায় চীনকেও পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয় একই বছর।

তবে কিছু দেশ আছে, যারা এই কাউন্সিলের সাথে সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই এই অঞ্চল নিয়ে অধিকার দাবি করে। আরো কিছু দেশ মানবজাতির সাধারণ উত্তরাধিকারের যুক্তি দেখিয়ে আর্কটিক অঞ্চলকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবি জানায়।

আর্কটিক মহাসাগরের সার্বভৌম অধিকার নিয়ে বর্তমানে অন্তত নয়টি আইনি লড়াই এবং দাবিদাওয়া আছে। প্রতিটিই আইনগতভাবে খুবই জটিল। কিছু দ্বন্দ্ব আছে যা থেকে বিবাদমান দেশগুলোর মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এসব বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে উদ্ভট দাবির মূলে আছে রাশিয়া। এই অঞ্চলে তারা তাদের চিহ্ন ঢুকিয়ে দিয়েছে গভীরে, আক্ষরিক অর্থেই অনেক গভীরে। ২০০৭ সালে তারা উত্তর মেরু অঞ্চলে সাগরের ১৩,০৯০ ফিট গভীরে মনুষ্যবাহী দুইটি সাবমারসিবল পাঠায়। সেখানে তারা টাইটেনিয়ামের তৈরি মরিচারোধী রাশিয়ান পতাকা স্থাপন করে। এই ধরনের কার্যক্রম থেকে এই অঞ্চলকে নিয়ে তাদের উচ্চাশা বুঝা যায়। যতদূর জানা যায়, পতাকাটা এখনো সেখানেই রয়ে গেছে। রাশিয়ার উচ্চপদস্থরা এখন নতুন একটা প্রস্তাব উত্থাপন করছেন। তারা বলছেন যে আর্কটিক মহাসাগরকে এখন নতুনভাবে নামকরণ করা উচিত। খুব বেশি চিন্তা না করেই তারা একটা নাম ঠিক করে ফেলেন। নামটা হলো- "রাশিয়ান মহাসাগর"। সাইবেরিয়ান উপকূলের নিকটবর্তী লোমোনোসভ শৈলশিরাকে তারা সাইবেরিয়া মহীসোপানেরই সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে এই শৈলশিরার প্রতি তাদের পূর্ণ অধিকার আছে বলে দাবি করছেন তারা। বিষয়টা অন্য দেশগুলোর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ এই শৈলশিরাটি চলে গেছে একদম উত্তর মেরু পর্যন্ত।

ব্যারেন্টস সাগর অঞ্চলে মালিকানা বিষয়ক ঝামেলা চলছে রাশিয়া আর নরওয়ের মধ্যে। নরওয়ের দাবি হলো, ব্যারেন্টস সাগরে অবস্থিত গ্যাকেল শৈলশিরা তাদের EEZ-এর সম্প্রসারিত অংশ। কিন্তু রাশিয়ানরা তা মানতে রাজি না। বিশেষ করে সভালবার্দ দ্বীপপুঞ্জের দাবি ছাড়তে নারাজ উভয়পক্ষই। সভালবার্দ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত মানববসতি। এই

দ্বীপপুঞ্জে নরওয়ের আংশিক সার্বভৌমত্ব আছে বলে স্বীকৃতি দেয় বেশিরভাগ দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা। তবে সমস্যা হলো, এখানকার সবচেয়ে বড় দ্বীপ স্পিতসবার্গেনে রাশিয়ান অভিবাসীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তারা এখানে এসেছে মূলত কয়লা উত্তোলনের কাজে। এই কয়লাখনি থেকে যে রাশিয়া খুব বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করছে, এমনটা নয়। কিন্তু এখানে রাশিয়ানদের পাঠানোর সুবিধা হলো, এর মাধ্যমে তারা এই অঞ্চল নিয়ে তাদের দাবি জোরদার করতে পারবে। সুবিধামতো সময়ে এই অঞ্চলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করে "রাশিয়ান জনগনের মঙ্গলের স্বার্থে" এই দ্বীপপুঞ্জে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে তারা।

রাশিয়ার এই পরিকল্পনা নরওয়ে বেশ ভালোভাবেই আঁচ করতে পারছে। তাই তারা সর্বউত্তরের এই অঞ্চলটিকে পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছে। এই দ্বীপপূঞ্জ এলাকায় রাশিয়ান ফাইটার জেট আসতে দেখলে তারাও ফাইটার জেট পাঠাচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে যে, নরওয়ে তাদের গোটা সামরিক কার্যক্রমকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে নিয়ে এসেছে। আর্কটিক অঞ্চলের জন্য তারা বিশেষ বাহিনীও তৈরি করছে। কানাডা তাদের শীতল অঞ্চলের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। রাশিয়ার এই ক্রমাগত পেশিশক্তি প্রদর্শন দেখে ডেনমার্কও বিশেষ আর্কটিক বাহিনী তৈরির কাজ শুরু করেছে।

রাশিয়াও চুপ করে বসে নেই। আর্কটিক অঞ্চলের জন্য বিশেষায়িত সামরিক বাহিনী তৈরি করছে তারা। এই অঞ্চলে নতুন ছয়টি সেনাঘাঁটি স্থাপন করেছে। সেই সাথে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকা কোল্ড ওয়ার আমলের কয়েকটি ঘাঁটিকে আবারও প্রস্তুত করছে সামরিক কার্যক্রমের জন্য। নোভোসিবির্স্ক দ্বীপপুঞ্জে এরকম বেশ কিছু ঘাঁটিকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে তারা, বিমান অবতরণের জন্য তৈরি করছে নতুন এলাকা। মুরমানস্ক এলাকার জন্য অন্তত ৬০০০ প্রশিক্ষিত যোদ্ধা প্রস্তুত আছে। হোভারক্রাফট এবং স্নোমবিল দ্বারা সজ্জিত দুইটি অত্যাধুনিক পদাতিক বাহিনীও তৈরি বিশেষ সময়ের জন্য।

মুরমানস্ককে বর্তমানে বলা হচ্ছে 'Russia's Northern Energy Gateway'। তাই এই এলাকাকে ঘিরে রাশিয়ার এত পরিকল্পনার কারণ বুঝাই

যায়। প্রেসিডেন্ট পুতিন তো সরাসরিই বলে দিয়েছেন, "সাগরের মধ্যকার তেলকূপ বিশেষ করে আর্কটিক অঞ্চলেরগুলো নিঃসন্দেহে একুশ শতকে আমাদের জ্বালানির কৌশলগত মজুদ হয়ে উঠতে চলেছে"। মুরমানস্ক-এর ৬০০০ সৈন্য তো সামান্যই! আর্কটিকের ঠাণ্ডা অঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য রাশিয়ার আয়োজনের ব্যাপকতা দেখা গেছে ২০১৪ সালে। সে বছর তাদের এক সামরিক মহড়ায় যুক্ত ছিল ১,৫৫,০০০ সদস্যের বিশাল এক বাহিনী, হাজার হাজার ট্যাংক, জেট বিমান ও যুদ্ধজাহাজ। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে, কোল্ড ওয়ারের সময়েও তারা এত বড় মহড়া করেনি।

এই মহড়ার সময় 'মিসৌরি' নামক এক কল্পিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করে রাশিয়ানরা। মিসৌরি বলতে স্পষ্টত যুক্তরাষ্ট্রকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দৃশ্যপট ছিল এরকম- মিসৌরি নামক শত্রুদেশের সৈন্যরা বেনামি এক এশীয় দেশকে সাহায্য করার জন্য চুকৎকা, কামচাৎকা, কুরিল দ্বীপপুঞ্জ এবং সাখালিনে অবতরণ করে। নাম উল্লেখ না করা এই এশীয় দেশটি ছিল জাপান। এই মহড়ায় যে দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা দক্ষিণ কুরিল দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে রাশিয়ার সাথে জাপানের বিরোধেরই চিত্রায়ন। অন্তত বিশেষজ্ঞরা এমনটাই বলেছেন। এই সামরিক মহড়ার সময় তাদের পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক মতবাদের মধ্যে আর্কটিক অঞ্চলকে ঘিরে তাদের পরিকল্পনাকে প্রথমবারের মতো যুক্ত করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই মহড়া থেকে বুঝা যায় যে এখানে প্রভাব বিস্তারে তারা আগ্রাসী নীতিই অবলম্বন করবে।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষমতা নানাদিক দিয়েই হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন খাতে তাদের বরাদ্দ কমাতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বাড়িয়েছে তারা। আর্কটিক অঞ্চলের জন্য যে বাড়তি সমরসজ্জা চলছে তার ব্যয় নির্বাহ করতেই বাজেট বাড়ানো হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ২০২০-এর দশকের মধ্যেই তারা আর্কটিক ফোর্সকে সুসজ্জিত করে ফেলতে চায়। মস্কোর হাতে আছে ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা, পুরনো দিনের অবকাঠামো এবং অবস্থানগত সুবিধা। ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এ দেওয়া এক বক্তৃতায় মার্কিন কোস্ট গার্ডের ক্যাপ্টেন মেলিসা বার্ট

বলেছিলেন- "আর্কটিকে রাশিয়ানরা শহর গড়ে তুলেছে, আর আমাদের আছে কিছু গ্রাম!”

শীতল যুদ্ধের সময় আর্কটিক নিয়ে যে সোভিয়েত পরিকল্পনা ছিল তা মেনেই এসব হচ্ছে। রাশিয়ানরা জানে যে ন্যাটো চাইলেই স্ক্যাগেরাক প্রণালি অবরুদ্ধ করে তাদের বাল্টিক নৌবহরকে আটকে দিতে পারে। এখানেই জটিলতা শেষ হয়নি। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় নৌবহর আর্কটিক ধরে এগিয়ে গেলে কোলা উপকূল আর উত্তরের বরফের মাঝখানে মাত্র ১৮০ মাইল উন্মুক্ত জলরাশি পাবে। এই সংকীর্ণ পথ ধরে তারা এসে পড়বে নরওয়েজিয়ান সাগরে। নরওয়েজিয়ান সাগর থেকে আটলান্টিকে যেতে হলে তাদের পেরুতে হবে GIUK (গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য) এলাকা। শীতল যুদ্ধের সময় ন্যাটো এই এলাকাটিকে “কিল জোন” বলে সাব্যস্ত করেছিল। এখানে এলে সোভিয়েত বহরকে পড়তে হতো ন্যাটোর বিমান, জাহাজ এবং সাবমেরিনের খপ্পরে।

নতুন যুগের শীতল যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফেরা যাক এবার। মার্কিনিরা আইসল্যান্ড থেকে তাদের বাহিনী সরিয়ে নিলেও সেই আগের কৌশলই ব্যবহার করা হবে। আইসল্যান্ডের নিজস্ব কোনো সামরিক বাহিনী নেই। তাদের সরকার মার্কিন সেনা প্রত্যাহারকে “দূরদৃষ্টির অভাব” বলে অভিহিত করেছে। সুইডিশ আটলান্টিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে আইসল্যান্ডের আইনমন্ত্রী বিয়োর্ন বিয়ার্নসন বলছেন, “এই এলাকায় কিছু পরিমাণ সামরিক উপস্থিতি অবশ্যই থাকা উচিত। এতে এলাকাটি নিয়ে একটি দেশের আগ্রহ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রকাশ পাবে। কোনো সামরিক শক্তি না থাকা মানে এটা বুঝানো যে এই অঞ্চল নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ বা পরিকল্পনা নেই”।

যাই হোক, গত এক দশক ধরে এটা নিশ্চিতভাবেই প্রতীয়মান যে আর্কটিক অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার যতটা আগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্রের তেমনটা নেই। সোভিয়েত বিভক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ আর্কটিক অঞ্চল থেকে যতটাই সরে গেছে, রাশিয়ার ততটাই বেড়েছে। আর্কটিক অঞ্চলে অভিযান চালাতে গেলে বরফ ভাঙার বিশেষ জাহাজ বা আইসব্রেকার লাগবেই। এই বিশেষ জাহাজ তৈরি করতে প্রয়োজন হয় ন্যূনতম এক বিলিয়ন ডলার আর দশ বছর

সময়। রাশিয়ার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আইসব্রেকার আছে। আর এই কারণে আর্কটিক অঞ্চলে শক্তি প্রদর্শনে অন্য সবার চেয়ে পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে আছে তারা। ২০১৩ সালের মার্কিন কোস্টগার্ড রিভিউ অনুযায়ী রাশিয়ার হাতে আছে ৩২টি আইসব্রেকার। এর মধ্যে ৬টি পারমাণবিক শক্তিচালিত, যা রাশিয়া ছাড়া আর কারো হাতেই নেই। ২০১৮ সালের মধ্যে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী আইসব্রেকার বানিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করছে। সেই আইসব্রেকারটি দিয়ে ১০ ফিটের চাইতেও বেশি গভীরতার বরফ ভাঙা সম্ভব হবে। এটি ৭০,০০০ টনের তেলবাহী ট্যাংকারকে বরফের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কর্মক্ষম ভারি আইসব্রেকার আছে মাত্র একটা। এটার নাম ইউএসএস পোলার স্টার। ১৯৬০ সালেও তাদের আটটি আইসব্রেকার ছিল। ভবিষ্যতে আর একটিও বানানোর পরিকল্পনা তাদের নেই। অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণাকেন্দ্রে রসদ পৌঁছে দিতে ২০১২ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায় এক্ষেত্রে তারা রাশিয়ার থেকে কতটা পিছিয়ে আছে। অন্য কোনো দেশও তেমন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেনি। কানাডার আছে ছয়টি আইসব্রেকার। তারা আরেকটি নতুন আইসব্রেকার বানাচ্ছে। ফিনল্যান্ডের আছে আটটি। সুইডেনের সাতটি আর ডেনমার্কের চারটি। চীন, জার্মানি এবং নরওয়ের আছে একটি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের আরো একটি ঝামেলা আছে। UNCLOS চুক্তিতে তারা স্বাক্ষর করেনি। ফলে, আর্কটিকের সাগরতলের ২০০,০০০ বর্গমাইল এলাকায় অর্থনৈতিক দাবি জানানোর এখতিয়ার তাদের নেই। আবার সাগরের বুকে থাকা তেলের মালিকানা এবং কানাডিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় চলাচলের অধিকার নিয়ে কানাডার সাথে বিরোধ আছে তাদের। কানাডা দাবি করে, এই দ্বীপপুঞ্জ তাদের অভ্যন্তরীণ জলসীমার মধ্যে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তা মানতে রাজি নয়। তারা বলছে এই অঞ্চলটি একটি উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক প্রণালি যার ওপর কানাডিয়ান আইন খাটে না। ১৯৮৫ সালে কানাডাকে না জানিয়েই যুক্তরাষ্ট্র এখানে একটি আইসব্রেকার পাঠায়। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে প্রবল

উত্তেজনা শুরু হয়। অবশ্য এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্ক বরাবরই অম্ল-মধুর।

বেরিং সাগর, আর্কটিক সাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অংশ নিয়ে রাশিয়ার সাথে বিরোধ আছে যুক্তরাষ্ট্রের। সমুদ্রসীমা নিয়ে ১৯৯০ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি হয়েছিল। মাছ ধরার কিছু এলাকা মস্কো তাদেরকে হস্তান্তরও করেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়ার সংসদ এই চুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। দুই দেশই এই এলাকায় মার্কিন সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। কিন্তু রাশিয়া এই প্রসঙ্গে অভিযোগ তোলার অধিকার রাখে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিরোধ রয়েছে কানাডা আর ডেনমার্কের মধ্যে। এই বিরোধটি নারেস প্রণালির অন্তর্গত হ্যান্স দ্বীপকে নিয়ে। এই প্রণালিটি কানাডার এলিসমেয়ার দ্বীপ আর গ্রিনল্যান্ডকে আলাদা করেছে। হ্যান্স দ্বীপের জনসংখ্যা ৫৬০০০। স্বশাসিত হলেও দ্বীপটি ড্যানিশ সার্বভৌমত্বের অংশ। ১৯৫৩ সালে ডেনমার্ক এবং কানাডার মধ্যে একটি চুক্তি হওয়ার পরেও দ্বীপটি নিয়ে বিরোধ মেটেনি এখনো। ফলে দুই দেশই যখন তখন জাহাজ নিয়ে গিয়ে নিজেদের পতাকা পুঁতে রেখে আসছে।

সার্বভৌমত্ব নিয়ে এই বিরোধগুলো হয়ে থাকে মূলত আকাঙ্ক্ষা এবং ভীতিকে কেন্দ্র করে। একদিকে থাকে সামরিক এবং বাণিজ্যিক জাহাজ চালাচলের জন্য নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা, নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করার আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে থাকে ভয়, নিজেরা দখল না করলে অন্য কেউ দখল করে ফেলার ভয়। আর্কটিক অঞ্চলে সম্পদের সম্ভাবনা একসময় ছিল শুধুই তাত্ত্বিক কচকচানি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বরফ গলতে শুরু করার সাথে সাথে এই সম্ভাবনাগুলো বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। তাই এই অঞ্চল নিয়ে বিরোধও বাড়ছে।

বরফ গলে যাওয়ার ফলে ভূগোল যেমন বদলে যাচ্ছে, তেমনি বদলে যাচ্ছে ভাবনার প্রসঙ্গও। এসব পরিবর্তনের মোকাবেলা কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে আর্কটিক অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ এবং বড় বড় জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে। জ্বালানি আহরণ করতে গিয়ে পরিবেশ আর মানুষের জন্য

কতটুকু ছাড় দেবে তাও ভাবতে হচ্ছে। জ্বালানির প্রতি দেশগুলোর যে প্রবল তৃষ্ণা, তাতে এই অঞ্চল নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। আর্কটিক বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন "দ্যা নিউ গ্রেট গেম"। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তর এই প্রান্তে তেল আর গ্যাসের খোঁজে প্রচুর জাহাজ আসবে ভবিষ্যতে। রাশিয়ানরা পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন আইসব্রেকার তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা একটা ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানাবারও পরিকল্পনা করছে। এই পাওয়ার প্ল্যান্টটি দশ ফিট বরফের চাপও সহ্য করতে সক্ষম হবে।

ঊনবিংশ শতকে আফ্রিকা নিয়ে যে তুমুল প্রতিযোগিতা ছিল, এই পরিস্থিতি তার থেকে একেবারেই আলাদা। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত আর আফগানিস্তানকে নিয়ে পরাশক্তিগুলো যেভাবে কলাকৌশল চালিয়ে যেত, তাও এর সাথে তুলনায় আসে না। এই লড়াই আগের মতো লাগামছাড়া হবে না। এই লড়াইয়ে নিয়ম-কানুন আছে, সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা আছে, এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটা ফোরামও আছে। আর্কটিক কাউন্সিলের দেশগুলো সকলেই দীর্ঘকাল ধরে পোড়খাওয়া। অধিকাংশই কমবেশি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অঞ্চল নিয়ে বিবাদ, পরিবেশ দূষণ, সমুদ্র আইন এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতাও আছে বর্তমানে। যেসব এলাকা নিয়ে বিবাদ আছে, উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী আমলে বা পরবর্তী সময়ের জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধেও সেসব দখল করা যায়নি।

আর্কটিকের দেশগুলো জানে যে তাদের অঞ্চলটি ভীষণ প্রতিকূল। নিজেদের মধ্যে বিবাদ তো আছেই, তার থেকেও বড় প্রতিকূলতা হচ্ছে ভৌগোলিক পরিস্থিতি। আর্কটিক মহাসাগর সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই সাগর অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিপজ্জনক এবং এতে আছে মৃত্যুঝুঁকি। বন্ধু ছাড়া একা এখানে টিকে থাকা মুশকিল। তারা জানে, এখানে সাফল্যের গুড় একা খাওয়া যাবে না। কিছু করতে চাইলে সবাই মিলেই জোট বাঁধতে হবে। জলজ প্রাণী শিকার এবং সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ, চোরাচালান, উদ্ধার অভিযান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সবাইকে এক হতে হবে।

মাছ ধরার নিয়ন্ত্রণ কার কাছে থাকবে এই নিয়ে অবশ্য বিরোধ চরমে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতল যুদ্ধ চলাকালে ১৯৫০ এবং ১৯৭০-এর দশকে যুক্তরাজ্য এবং আইসল্যান্ডের মধ্যে মারামারি বাধার দশা হয়েছিল। চলাচল করা যায়, এমন সব জায়গাতেই চোরাচালান হয়। আর্কটিক এর থেকে ব্যতিক্রম হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই অঞ্চলের চরম প্রতিকূল পরিবেশের কারণে এই বিষয়গুলো তদারকি করা বেশ কঠিন হবে। বাণিজ্যিক জাহাজ আর প্রমোদতরীর চলাচল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে এই অঞ্চলে। তখন উদ্ধার অভিযান চালানো এবং সন্ত্রাস দমনের সক্ষমতাও বাড়িয়ে তুলতে হবে আর্কটিক অঞ্চলের দেশগুলোকে। এই অঞ্চলে ভিড় বাড়ার সাথে সাথে পরিবেশগত বিপর্যয় নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে। ১৯৬৫ সালে রাশিয়ান আইসব্রেকার লেনিনের পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তীরে ফিরে আসার পর এর রিঅ্যাক্টরের কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ফুয়েল সেলসহ রিঅ্যাক্টরের এই অংশটি স্টিলের পাতে মোড়ানো একটি কংক্রিট কন্টেইনারে ভরে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়। আর্কটিক অঞ্চল ব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে এরকম ঘটনা সামনে আরো বেশি করে ঘটবে। যত বেশি ঘটতে থাকবে, সামাল দেওয়াও তত কঠিন হবে।

শেষ পর্যন্ত সম্ভবত শক্তিশালী দেশগুলোর আরো একটি যুদ্ধক্ষেত্রেই পরিণত হবে আর্কটিক অঞ্চল। ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখেছি কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছাড়াই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে। তবে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের এই যুগে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ডিঙিয়ে যেতেও আমরা দেখেছি। যেমন, আমরা আজকাল এমন গতিতে মরুভূমি বা সাগর পাড়ি দিতে পারি, যা আমাদের পুর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও ভাবেনি। আমরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকেও নস্যাৎ করতে পেরেছি। বর্তমানের বিশ্বায়নের যুগে আমরা হয়তো প্রযুক্তি ব্যবহার করেই আর্কটিক অঞ্চলে সবার জন্য সুযোগ তৈরি করে দিতে পারব। আমরা হয়তো আমাদের হিংস্র প্রবৃত্তিকে পাশ কাটিয়ে নতুন গ্রেট গেম এমনভাবে খেলব, যাতে সকলেরই উপকার হয়।



উপসংহার

আমরা মানব জাতির অর্জনের একদম চূড়ায় চলে এসেছি। ওপরে যাওয়া ছাড়া এখন আর অন্য কোনো পথ নেই। শেষ যুদ্ধটা কী নিয়ে হবে তা নিয়ে আমরা সবসময় জল্পনা-কল্পনা করে এসেছি। বর্তমান সময়ে এসে, সকল বাধা ডিঙিয়ে মানুষ চলে গেছে মহাশূন্যে। অসীমের পথে সামান্য একটু হলেও এগিয়ে গেছি আমরা। কার্ল সাগান যাকে "Pale Blue Dot" বলেছেন, সেই ধুসর ছোট্ট এক বিন্দুর মত পৃথিবীর সীমানার মধ্যে এখন আর বন্দি হয়ে নেই আমরা। আমাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমরা অকল্পনীয় রকম সামনে এগিয়েছি।

কিন্তু আবারো আমাদের পৃথিবীতেই ফিরে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের পৃথিবীর ভৌগোলিক সব প্রতিকূলতাকে এখনো জয় করতে পারিনি আমরা। অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে। অথচ এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েই চলেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান সবসময়ই বন্দিশালার মতো। একটা দেশ কেমন হবে, অথবা সেই দেশের জন্য কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা নিরূপণে ভূগোলের ভূমিকাই থাকে সব থেকে বেশি। আর বিশ্বনেতারা সব সময়ই চেষ্টা করেন এই বন্দিশালা ভেঙে বের হতে।

এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো রাশিয়া। ছোট্ট একটা সমভূমি থেকে বিস্তার শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেশটি বিস্তৃত হয়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে। তাদের প্রাণকেন্দ্রের প্রায় সবদিকই পর্বত আর সাগর দিয়ে ঘেরা। দুর্বলতা বলতে শুধু একটা জায়গা, উত্তর ইউরোপের সমভূমি। এই দুর্বল জায়গা নিয়ে তারা যা করেছে, শক্তিশালী দেশ হয়ে ওঠার পথে (যেটা তারা হয়েও গেছে) তার কোনো বিকল্প ছিল না। ইউরোপ যে ব্যবসা-বাণিজ্যের এত বড় কেন্দ্রে

পরিণত হয়েছে, তা কারো সিদ্ধান্তের কারণে হয়নি। পরস্পর সংযুক্ত নদীগুলোর কারণে আপনা থেকেই এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। হাজার বছরের পরিক্রমায় এমনটা ছিল অবশ্যম্ভাবী।

এত বছর ধরে যেসব ভৌগোলিক কারণে ইতিহাসের বাঁকবদল ঘটেছে, একবিংশ শতাব্দীতেও এসব ভৌগোলিক কারণ বজায় থাকবে। এক শতাব্দী পরেও রাশিয়া উদ্বিগ্ন চোখে সমতল অঞ্চলের পশ্চিমে তাকিয়ে থাকবে। ভারত আর চীনের মধ্যে হিমালয় রয়েই যাবে। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেও পারে, কিন্তু সেই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিও ভূগোল দ্বারাই নির্ধারিত হবে। এই সুবিশাল ভৌগোলিক বাধা পেরোনোর জন্য তাদেরকে নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে হবে। আর তা যদি না করতে পারে এবং কোনো পক্ষই যদি পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারস্থ না হতে চায়, শেষ পর্যন্ত হয়তো তারা মুখোমুখি হবে সাগরে এসে।

মেক্সিকো উপসাগরে আসা-যাওয়ার পথ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব ফ্লোরিডার ওপরেই থাকবে। এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক বদলাতে পারে, কিন্তু সাগরের অবস্থান তো আর বদলাবে না! একটা অবাস্তব কল্পনা করা যাক। ধরা যাক হিস্পানিকরা একসময় ফ্লোরিডায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল এবং ফ্লোরিডা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে কিউবা আর মেক্সিকোর সাথে জোট বাঁধলো। এর ফলে হয়তো উপসাগরের ওপর নিয়ন্ত্রকের হাত বদল হবে, কিন্তু ফ্লোরিডার অবস্থানগত গুরুত্ব তো আর বদলে যাবে না!

অবশ্য এটাও ঠিক যে ভৌগোলিক অবস্থানই ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়। মহান নেতা আর অসাধারণ সব চিন্তাভাবনাও ইতিহাস বদলে দিতে পারে। কিন্তু তারা তো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশের নেতারা বঙ্গোপসাগর থেকে জল ওপরে আসা বন্ধ করে দেশকে রক্ষার স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু তারা জানেন যে দেশের ৮০ শতাংশ অঞ্চলের অবস্থানই প্লাবনভূমিতে। এই অবস্থান তো আর বদল করা সম্ভব না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান-ইংলিশ নেতা কিং কানুট একাদশ শতাব্দীতে তার চাটুকারদেরকে একথাই বলেছিলেন। ঢেউকে দূরে সরে যেতে আদেশ দিয়ে, তা না হওয়ার পরে বলেছিলেন: প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্তাকে টপকে যাবার ক্ষমতা

কোনো মানুষেরই নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বন্যার এই বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে বন্যার সঠিক পূর্বাভাস পাওয়ার পদ্ধতি বের করতে উদ্যোগী হতে হবে তাদের। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই যুগে এটা না করে উপায় নেই।

নতুন দিনে এখন এসেছে নতুন ভৌগোলিক বাস্তবতা, নতুন পরিস্থিতি। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে প্রচুর মানুষ দেশান্তরী হতে বাধ্য হবে। মালদ্বীপসহ অনেক দ্বীপ আক্ষরিক অর্থেই পানিতে তলিয়ে যাবে। এসব দ্বীপ থেকে যারা পালাবে তাদের ভাগ্য যেমন পরিবর্তিত হবে, তেমনি তারা যেসব দেশে যাবে সেসব দেশেও এর প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি যদি খারাপ হতে থাকে, এই অঞ্চলের ১৬ কোটি মানুষের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে যাবে। সমুদ্রসীমার উচ্চতা যদি বাড়তেই থাকে, তাহলে এই দরিদ্র দেশটি পুরোপুরি পানির নিচে চলে যাবে। সাহেল অঞ্চলের দক্ষিণে যদি খরা অব্যাহত থাকে, তাহলে ভয়াবহ যুদ্ধ অপেক্ষা করছে সামনে। সুদানের দারফুর অঞ্চলের মতোই হবে সেই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি। সুদানের গৃহযুদ্ধও অনেকটা একই কারণে ঘটেছে। সেখানকার মরুভূমি উত্তরের যাযাবরদের অঞ্চলে এগিয়ে আসছিল। ফলে যাযাবররা বাধ্য হয় দক্ষিণে ফার জনগোষ্ঠীর এলাকায় সরে যেতে। ফলাফল যুদ্ধ।

পানির কারণে সামনে নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ হবে। মধ্যপ্রাচ্যে যদি স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ও, এই যুদ্ধ ঠেকানো যাবে না। মুরাত নদী তুরস্ক থেকে নেমে এসে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীর প্রবাহ যদি কমে যায়, তাহলে সংকট আসন্ন। তুরস্ক তখন নিজেদের এলাকায় পানি ধরে রাখার জন্য বাঁধ তৈরি করবে। তখন হয়তো ভাটি অঞ্চলের দেশ সিরিয়া আর ইরাকের সাথে এই নদীর অধিকার নিয়ে তাদের যুদ্ধ বেধে যাবে।

আরো দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকানো যায়। ধরে নিলাম আমরা তখন আমাদের পৃথিবীর ভৌগোলিক বন্দিদশা ভেঙে মহাবিশ্বের দিকে হাত বাড়িয়েছি। অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশ নিয়েও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। ১৯৬১ সালে ২৭ বছর বয়সী রাশিয়ান নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন প্রথমবারের

মতো স্ট্রাটোস্ফিয়ার অতিক্রম করেন। অথচ আজ তার নামের চেয়েও বেশি পরিচিতি পেয়ে গেছেন আরেক রাশিয়ান, কালাশনিকভ । মানবতার জন্য এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার।

ইউরি গ্যাগারিন, বাজ অলড্রিনসহ নতুন যুগের মহাকাশ অভিযাত্রীরা মার্কো পোলো এবং ক্রিস্টোফার কলম্বাসের উত্তরসূরি। এই মানুষগুলো তাদের সাহস আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে যুগে যুগে আমাদের জন্য সভ্যতার নতুন নতুন দিক উন্মোচন করে এসেছেন। আমরা যা অর্জন করার কথা ভাবিইনি কখনো, তারা সেসবই করে দেখিয়েছেন। এসবকিছু মানবজাতির জন্য প্রকৃতপক্ষেভালো নাকি খারাপ ফল বয়ে এনেছে, সে তর্ক পরে। তাদের কল্যাণে নতুন সুযোগ, নতুন নতুন জায়গার খোঁজ পাওয়া গেছে। আর সেসব জায়গায় প্রকৃতি যে সম্পদ দিয়ে ভরে রেখেছে, তা করায়ত্ব করার জন্য মানুষ লিপ্ত হয়েছে প্রতিযোগিতায়। মহাশূন্যে ভবিষ্যতে কী হবে সেটা এখন অনুমান করা যায়। আমরা একসময় মহাশূন্যে আমাদের পতাকা গেঁথে দেব, দখল করব বিভিন্ন অঞ্চল, ডিঙিয়ে যাব মহাবিশ্বের বেধে দেওয়া সীমানা।

এই মুহূর্তে ১১০০টি কর্মক্ষম স্যাটেলাইট মহাশূন্যে প্রদক্ষিণ করছে। আরো অন্তত ২০০০টি স্যাটেলাইট আছে, যেগুলো এখন আর কোনো কাজ করতে সক্ষম না। রাশিয়া আর অ্যামেরিকা মিলে মোট ২৪০০টি স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে মহাশূন্যে। চীন আর জাপান পাঠিয়েছে ১০০টি করে। আরো কিছু দেশও আছে এই কার্যক্রমে, তবে তাদের পাঠানো স্যাটেলাইটের সংখ্যা অনেক কম। স্যাটেলাইটের ঠিক নিচে আছে স্পেস স্টেশন। এই স্পেস স্টেশনে এখন মানুষ প্রায় স্থায়ীভাবে বাস করছে, কাজ করছে। প্রথমবারের মত পৃথিবীর অভিকর্ষ বলয় থেকে মুক্ত হয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে মানুষ। আরো ওপরে চাঁদের মাটিতে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত পাঁচটি পতাকা দাঁড়িয়ে আছে। শুধু চাঁদেই না, আমাদের যন্ত্রগুলো এখন মঙ্গল বা বৃহস্পতির সীমানা ছাড়িয়ে আরো দূরে চলে গেছে। অনেকগুলো তো এত দূরে চলে গেছে যে তারা আর আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই নেই। এত দূরে চলে গেছে, যা একজন সাধারণ মানুষের ভাবনারও বাইরে।

এই মহাশূন্য অভিযানগুলো সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই পরিচালিত হচ্ছে, এরকমটা ভাবতে পারলে ভালোই লাগত। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্নরকম। মহাশূন্যেও আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলছে। এই যে এত এত টাকা খরচ করে স্যাটেলাইটগুলো পাঠানো হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য শুধু টিভিতে ঝকঝকে ছবি দেখা বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা নয়। এর মাধ্যমে অন্য দেশগুলোর ওপর গুপ্তচরবৃত্তিও করা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে কে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে। অ্যামেরিকা আর চীন লেজার প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছে। উভয় দেশই চেষ্টা করছে মহাশূন্য থেকে মিসাইল ছোঁড়ার উপায় বার করতে। চেষ্টা করছে নিজের প্রযুক্তি দিয়ে অন্যের প্রযুক্তিকে টেক্কা দিয়ে যেতে। চেষ্টা করছে মহাশূন্যে একে অপরের মিসাইল ব্যবস্থাপনাকে বাতিল করার উপায় বার করতে। প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত অনেক দেশই এখন মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমরা এখন পৌঁছে গেছি নক্ষত্রের কাছে। তারাদের মুখোমুখি হতে গেলে আমাদের হয়তো বিভেদ ভুলে একসাথেই কাজ করতে হবে। রাশিয়ান, মার্কিন বা চাইনিজ পরিচয়ের বদলে মানবজাতির প্রতিনিধি পরিচয়েই হয়তো মহাবিশ্ব ভ্রমণ করতে হবে। কিন্তু মহাশূন্যে যাওয়ার মাধ্যমে মধ্যাকর্ষণ শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলেও, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস আর সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতার অন্তহীন চক্র থেকে মুক্ত হতে পারিনি আমরা। এটাও একধরনের বন্দিত্ব। আর এই বন্দিদশা সৃষ্টি করেছে আমাদের মন। অন্যের প্রতি সন্দেহ, আর সম্পদের প্রতি আমাদের সহজাত লোভ আমাদের বন্দি করে রেখেছে। এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে এখনো আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে মানবজাতিকে।



হাসান মাহবুব

অনুবাদক পরিচিতি

বাবার চাকুরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে শৈশবের বেশিরভাগ সময় কেটেছে। ক্লাস নাইনে ওঠার পর ঢাকায় চাচার বাসায় চলে আসেন লেখাপড়ার জন্য। সেখান থেকেই এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর নিয়তির এক খেয়ালি সিদ্ধান্তে খুলনা প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পান। প্রকৌশলী হওয়ার মোহ ভঙ্গ হতে খুব বেশি সময় লাগেনি । মাস ছয়েকের মাথায় তিনি আবিষ্কার করেন, এই জায়গায় তিনি মানানসই নন। কৈশোর থেকে পুষে রাখা সৃজনীচর্চা; গান, গল্প, লিরিক আর সুরের ভুবন থেকে কাঠখোট্টা সমীকরণ এবং সূত্রের জগতে নিজেকে অপাঙক্তেয় মনে করে দীর্ঘ হতাশায় নিমজ্জিত হন। পড়ালেখা শেষ করে ঢাকায় আসার পর কিছু সময় ব্যয় করেছেন পত্র পত্রিকায় ফ্রিল্যান্স কাজ করে। কিন্তু ঠিক যেন নিজেকে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। অবশেষে সামহোয়্যার ইন ব্লগে পেয়ে যান মহা আরাধ্য সেই প্লাটফর্ম। ২০০৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সেখানেই ব্লগিং করে চলেছেন। মূলত ছোটগল্প নিয়েই কাজ করেছেন প্রথমদিকে। এখন উপন্যাসও লিখছেন। প্রকাশিত বই- প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত, বেড়ালতমা, এপিটাফ বৃক্ষের গান, মন্মথের মেলানকোলিয়া, নরকের রাজপুত্র, জবাইঘর, মায়াফুলের বন, মেলোডি তোমার নাম, ছহি রকেট সায়েন্স শিক্ষা, আনন্দভ্রম এবং বাংলাদেশী ড্রিম (যন্ত্রস্থ)। প্রিজনার্স অব জিওগ্রাফি তার অনূদিত প্রথম গ্রন্থ।